রানার চলেছে, রানার

প্রথম খণ্ড :

বীরেন্দ্র দত্ত

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম খণ্ড :

১৫ এপ্রিল, ১৯৫৭

প্রকাশক

শ্রীশঙ্খনীল দাস

এস-পি পাবলিশিং

ঋষি বঙ্কিমনগর বারুইপুর

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ

দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স

৩২ বিডন রো কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

লেখকের স্কেচ ও অলংকরণ

শ্রীনিতাই ঘোষ

শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

উপনদী শাখানদী, শীতের বেলা, বিষণ্ণ পরবাস,
নির্জন দর্পণ, সমুদ্রের শব্দ, সামনে যুদ্ধ

ছোটগল্প

অমিল পয়ার, পুরনো পট ধূসর ছায়া, জলবিন্দু, বনান্তরে,
খেলার ছলে, হিসেব নিকেশ, পাহাড়ে সমুদ্রে, সহজ
কঠিন, মধ্যদুপুর, যীশুর পুতুল, শান্তিপর্ব, আমি ও সে,
মায়াবী মঞ্চ, শ্রেষ্ঠগল্প

প্রবন্ধ

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র, ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, সাহিত্যে
অস্তিবাদী চিন্তা-ভাবনা, বাংলা ছন্দের সেকাল একাল

কাব্যগ্রন্থ

জন্ম জন্মদিন

সূচীপত্র

কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

'রানার চলেছে, রানার' কবি সুকান্ত সম্পর্কে আদৌ কোন গবেষণামূলক আলোচনা নয়। আবার পরিকল্পিত তিনটি খণ্ড কবি সুকান্তর গতানুগতিক জীবনীও যেমন নয়, তেমনি নয় তার কাব্যের ও গদ্যের পণ্ডিতী বিশ্লেষণ। কবির কোন্ কোন্ বিশেষ মানসিকতায়, প্রতিক্রিয়ায় ও পরিবেশে, বা ঘটনা-ক্রিয়ায় এক-একটি বিশেষ কবিতার জন্ম, তারই সুকান্ত-জীবন-মিশ্রিত পরিচয় আছে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে, 'জীবন-মন' অংশে। উনিশ শ' সাতাত্তর সালে প্রথম যে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়, তাকেই প্রচুর ঘষা-মাজা করে, অনেক নতুন অংশ সংযোজিত করে বর্ধিত আকারে একেবারে নবরূপে প্রথম খণ্ডে রাখা হয়েছে।

প্রথম খণ্ডের এভাবে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটি বাতিল করা হল। দ্বিতীয় খণ্ড 'যৌবন স্বপ্ন' এবং তৃতীয় খণ্ড 'হৃদয় সংবাদ' একেবারেই নতুন লেখা, ইতিপূর্বে কোনভাবেই প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয় খণ্ডের লক্ষ্য সুকান্তর কবিতা-গুলির এক আবেগ-নির্ভর অভিনব গদ্যে সমালোচনা নয়, আলোচনা। নিরন্তর চলমান কবিমানসের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখাই এর মৌল উদ্দেশ্য। তৃতীয় খণ্ডে আছে সুকান্তর সমস্ত গদ্য রচনা ও চিঠিপত্রের রচনাকাল ধরে কবির সুগভীর অন্তর্লোকের উন্মোচন।

বর্তমান তিনটি খণ্ড রচনা করতে বসে আমি প্রধানত সুকান্তর দুই ভাই শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের যথাক্রমে 'কবি সুকান্ত' এবং 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত' নামের গ্রন্থ দু'টি থেকে যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সুকান্তর ব্যক্তি জীবন ও কবিতা রচনা সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থ দু'টিই একমাত্র প্রামাণ্য। সুকান্তর জীবনীর চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগে তথাকথিত সুকান্ত-প্রীতির নামে কেউ কেউ মিথ্যাচারে, অসত্য ভাষণে ও স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেগুলি ভুল, অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। সেগুলি সম্পর্কে সুকান্ত-অনুজদের বিস্তৃত বিবৃতি না থাকলে যে কোন গবেষকই বিভ্রান্ত হবেন।

আমার বর্তমান তিনটি খণ্ড রচনায় বিশেষভাবে যাঁদের স্মৃতিচারণ তথ্য ও সত্য প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশী কাজে লেগেছে, তাঁরা হলেন—দুই কবিভ্রাতা মনোজ ভট্টাচার্য ও রাখাল ভট্টাচার্য, সরলা বসু, অরুণাচল বসু, ১৯৯১ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-ধন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, অবন্তী সান্যাল, মোহিত আইচ্, বুদ্ধদেব বসু, পারুল বসু, কে. জি. বসু প্রমুখ। এ ছাড়া পুরনো 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত খবরের অংশ-বিশেষ আমার কাজে লেগেছে।

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু মৃত্যুদিন

তখনো বুঝি ভোরের শেষ রেশটুকু মানবজীবনের জীবন-মৃত্যুর মধ্যের রেখাটির মত গভীরতম, দুর্জ্ঞেয় কোন রহস্যময়তায় লেগে আছে চারপাশে !

বারোই-মে, উনিশ শ সাতচল্লিশ। কিছু সময় পরের উষা-উপান্তের গায়ে লেগে-থাকা এক উজ্জ্বল উষ্ণ সকাল।

কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্যে, সেই উষ্ণতায় বুঝি কোন প্রাণ নেই! নেই কোন প্রতিশ্রুতি !

কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলের টি. বি. হাসপাতাল। এল. এম. এইচ. ব্লক, বেড নম্বর এক। একুশ বছর বয়সের এক কিশোর শয়িত।

এমন শয়ন বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে বৈপরীত্যে ম্লান! এক অলৌকিক শূন্যের ছায়ায় ঢাকা নিবিড় নিঃসাড়ে কেন যেন আকর্ষণ করে !

কারণ কিশোরটির নিদ্রিত চোখের সামনে এই মুহূর্তে অনন্ত অন্ধকার পাথরের মত অনড়। রোগীর শয্যার বাইরে, জানালার প্রান্ত থেকে বিশাল আলোকিত মাঠের সবুজেও বুঝিবা সেই আলকাতরার মত ঘন কঠিন অন্ধকার মাখানো।

একমাত্র এই কিশোরের চোখেই। শুধু চোখ নয়, সর্বাঙ্গীণ চেতনায়, অস্তিত্বে। দুঃসহ রোগে জীর্ণ দীর্ঘদিনের শীর্ণকায় এই কিশোরের এমন নিয়তি-নির্দিষ্ট নিশ্চুপ অস্তিত্বের সংবাদ বহির্জগতে কেন, সারা হাসপাতালেরও কেউ বুঝতে পারেনি এখনো।

সকলের অলক্ষ্যে, নিঃসাড়ে কিশোর তার নতুন ভ্রমণ শুরু করেছে এমন প্রভাতেই, এক অলক্ষিত, সুদূর, অসীম অনন্তের আহ্বানে।

এক পৃথিবী থেকে আর এক পৃথিবী, এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহ, গ্রহান্তরে রানারের মত চিঠি বিলি করাই বুঝি তার কাজ। মর্ত্যের সীমায় তার এমন নিস্তব্ধতা উপেক্ষার মতই। কিশোরের পক্ষে বিশ্বকবির সেই বিশ্ববাণীও বুঝি প্রতিতুলনায় তা-ই—'প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ / রুধিল না সমুদ্র পর্বত।'

'রানার চলেছে রানার! / রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।' এই কিশোর কারোর নিষেধ কোনদিন মানেনি। এতকাল নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ রেখে জনতার মধ্যে, জনতার উল্লাসে দুর্বার স্রোতের মত এগিয়ে চলেছিল। না, নিষেধ কারো মানেনি। তাকে মানাবার মত ক্ষমতাও কারোর ছিল না। যেন জন্ম-মুহূর্ত থেকেই অদৃশ্য নিয়তির সঙ্গে এক স্থায়ী মিত্রতার বন্ধনসূত্র রচনা করে সে বাঁচার অর্থ খুঁজে বেড়াত। যুগে যুগে কালে কালে নতুন খবর জানিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও ছিল তার।

নব মানবতার বাণীবাহক এই কিশোর আবার নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। রাত্রির পথে পথে অকারণ অবারণ চলা কখন যে শুরু করেছে, কেউ জানে না।

এ রানার অনন্ত আত্মার প্রতিচ্ছবি এঁকে রেখে গেছে এ জন্মে, সর্বকালের প্রজন্মে, আঁকতে চলেছে উত্তরকালের সংখ্যাহীন পরজন্ম-গুলিতেও বুঝিবা। কঠিন তার মুখ, অনমনীয় তার শপথ, অনন্য-সাধারণ তার পথ-পরিক্রমা। অনন্তের আহ্বানে এই কিশোর-রানারের যে অগ্রগমন, তা তার আত্মার অগ্রগমন।

এমন সকালে, কেউ জানে না, এক কিশোর, সমস্তরকম প্রতিবাদী অস্তিত্বে পবিত্রতম 'চিরকিশোর' থেকেই উর্ধ্বের অজস্র নক্ষত্রের ওপর পা ফেলে ফেলে দৌড় দেবার জন্যে নিশ্চুপ হয়ে গেছে বিছানায়। নিঃসঙ্গ, নিঝুম সেই পরিবেশে বুঝিবা আর্তকণ্ঠে কাল, নাকি মহাকাল, সময়ের সীমাকে মেনেও অসীম বারবার প্রশ্ন রাখে, 'রানার! রানার! ভোর তো হয়েছে—আকাশ হয়েছে লাল/আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল?'

এই দুঃখের কালটি কি ?

দুঃখের কাল বিশেষ সময়। মানুষের হিসেবে অনেকরকম হতে পারে।

উনিশ শ সাতচল্লিশের বারোই মে সকালের ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, তথা কলকাতার সেই ভয়াবহ পরিবেশের চিত্রই বুঝি তার দুঃখের কালের যথাযথ প্রতিবিম্বন।

বৈশাখের তাপদগ্ধ কলকাতা। এ তো তার বাইরের রূপ। তার অন্তরের রূপ ভয়ংকর বীভৎস, শকুনি-গৃধিনীদের চরম মিলনক্ষণের উল্লাসে বিকট। সমস্তরকম মানবতাকে ধ্বংস করে চলেছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ভয়াল নৃত্য। চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার একটানা কারফিউ-এর মধ্যে থেকে এ শহর এখন অভ্যস্ত। যেনবা নিত্যনৈমিত্তিক সহনশীলতারই সাধারণ নিয়ম। সমস্ত মানুষ রুদ্ধশ্বাস। আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে শ্বাসরুদ্ধ, ক্লান্ত, বিরক্ত মানুষ বিনিদ্র রজনীর রক্তচক্ষু নিয়ে মুক্তির, শান্তির শ্বাসটুকু গ্রহণ করার জন্যে জলে নিমজ্জিত মুমূর্ষু মানুষের মত অস্থির, চঞ্চল, সামান্যতম শ্বাসার্ত!

হাসপাতাল আর বাইরের মানুষের কাছে একসময়ে আবিষ্কৃত হল সেই একুশ বছরের কিশোরের চিরশয়নের রূপ। অত্যন্ত আকস্মিক, শরতের মেঘে বজ্রপাতের মত সে আবিষ্কার! কিন্তু তারপর? এ এক হতচকিত বেদনাদায়ক আবিষ্কার!

অগণন মানুষের, বুদ্ধিজীবীর, কর্মী-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের সমবেত, সর্বজনীন, স্বতঃস্ফূর্ত শোক জানাবার সুযোগ নেই। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় লজ্জিত-অপমানিত মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র কূপের জলের মত স্থির, অনড়, গম্ভীর হয়ে গেল। শেষ যাত্রার মুহূর্তেও সেই মৃত কিশোরটি হাজার হাজার ব্যাকুল-হৃদয় মানুষের কাতর মানবিক সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থেকে গেল।

কলকাতার গঙ্গার তীরে কাশী মিত্র ঘাট। কোন শোভাযাত্রার আন্তরিক উত্তাপ দিয়ে নয়, শুধু একটি যন্ত্রচালিত যানে সেই মৃত

কিশোরটিকে নিয়ে আসা হল সেখানে। ধূসর সন্ধ্যায় অন্তর্জলী শেষ। কিন্তু শুরু হল শোকার্ত মানুষের তার প্রতি গভীরতম ভালবাসা, অপরিসীম শ্রদ্ধার অনাবিল প্রকাশ। সে শ্রদ্ধাকে 'কাল' বা 'সময়' তার হাতে হাতে ক্রমশ বিশাল সবুজ মাঠের মত প্রসারিত করে করে বিশ্বপ্রসারী চেতনায় মেলে ধরেছে অতীতে, আজও এবং ধরবে ভবিষ্যতেও। নির্মম কালের হাতে এমনই প্রতিশ্রুতি!

উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের বারোই মে সকাল থেকে সন্ধ্যা। একটানা এই রুদ্ধশ্বাস বারো ঘণ্টায় সেই কিশোরের এমন শেষতম নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব ও যাবতীয় জাগতিক অস্তিত্বহীনতার করুণ ছবি আজও জীবিত তার বন্ধুজন, সারাদেশের গুণীজন, শ্রদ্ধাভাজনরা সাশ্রুনয়নে স্মরণ করবেন।

সেই শ্বাসরোধকারী অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার মধ্যবর্তী দীর্ঘ বারো ঘণ্টার কালসীমায় এক দীর্ঘস্থায়ী অনুভূত ভূকম্পনের মত অগ্রগামী দিনের কবিদলের প্রাণপ্রতিম কিশোরের মহাজীবনের কাছে রোমান্টিক বিদ্রোহী আত্মার প্রতিবাদ—

'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—'

স্মরণ করবেন, সেদিনের সেই প্রত্যক্ষ দাঙ্গার বলি নয়, সেই দীর্ঘলালিত সভ্যতার মানবতার বলি হওয়ার প্রেক্ষিতে এক পৌরুষ-দৃপ্ত কিশোরের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-প্রতিবাদের ধ্বনি জানিয়ে ব্যক্তি-প্রাণ ও জীবনটুকু নিঃশেষে দান করে দেওয়ার নামান্তর ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু কে এই কিশোর? সমস্ত সপ্রাণ মানুষের কাছে কি তার হৃদয়ের রক্ত-মাখা দলিল?

একুশটি বসন্তের সমস্ত রক্তিম গোলাপের নির্যাসটুকু নিয়েও কেন সে উপেক্ষা করতে পারলো না মৃত্যুর এমন অভিশাপকে?

এই কিশোরের কোন্ অভিমান ছিল—যাতে সচেতন জীবনের শুরু থেকে জনগণের মধ্যে, তার অবিরল কোলাহল বুকে নিয়েও, ফুসফুসে তাদের সমস্তরকম শ্বাসগ্রহণ করেও এমন নিঃসঙ্গ এক ভোরে সবার অলক্ষ্যে আত্মগোপন করলো ?

এই কিশোর। 'রানার ! রানার !'

এই কিশোর। জনমানসের কবি, নিরলস কর্মী, নিষ্ঠুর সাম্যবাদী !

এই কিশোর। কুশলী সংগঠক, আজন্ম মানবপ্রেমিক, চিরকালীন মানবপ্রেমের ঘোষক, বাণীবাহক।

এই কিশোরের তেজী ঘোষণা, 'মনে হয় আমিই লেনিন।'

এই কিশোর। সর্বকালের সর্বদেশের বজ্রমুষ্ঠি, উর্ধ্বমুখ, মুমুক্ষু সর্বহারাদের দৃপ্ত-প্রাণের প্রতীক—সুকান্ত ভট্টাচার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম জন্মদিন

দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট অঞ্চল। বিয়াল্লিশ নম্বর, মহিম হালদার স্ট্রীট। দোতলার একটি ছোট ঘর।

আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে উনিশ-শ ছাব্বিশ সালের পনেরোই আগস্ট, বাংলা তেরশ তেত্রিশ সালের তিরিশে শ্রাবণ কবি সুকান্তের জন্ম হয় ওই মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়িতে, দ্বিতলের ওই নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে।

কিন্তু এ শুধু জন্ম নয়, আবির্ভাব।

এক আগামী দিনের কবি-আত্মার পুনর্জন্ম!

পুনর্জন্ম? হ্যাঁ, ত্রিকালদর্শী কবিরা তো সেই স্রষ্টা যাঁরা যুগে যুগে কালে কালে নূতন হয়ে আবির্ভূত হন।

'বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায়'।

প্রজন্মের এক কবি-আত্মার নূতন জন্মে নূতন বাস-গ্রহণ।

এ এক অভিনব কবি-'রানার' যে নতুন চিঠি নিয়ে এসেছে মানুষের জন্যে। অগ্রগামীকালের কবিদের কথা ভেবে নতুন বার্তা।

রাত্রির নিমন্ত্রণে অজস্র নক্ষত্রের আলোয় আলোয় পা রেখে পথ-পরিক্রমা করতে করতে আবার নতুন প্রভাতে পূর্ণরূপ গ্রহণ।

আত্মার পুনর্জাগরণ। এমন রানার।

> 'দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
> কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।'

নতুন সদ্যজাত শিশু। নতুন আত্মা। নতুন রানার।

নব মানবতাবাদের খবর তার হাতের চিঠির বোঝার মধ্যে। অনন্ত-কাল ব্যাপ্ত অক্লান্ত পরিক্রমার ফাঁকে ফাঁকে এইসব কবিই তো পৃথিবীর বুকে বার্তা নিক্ষেপ করে আবার কোন রক্তিম দিগন্তে অন্তরালবর্তী হয়ে মানুষকে আপনত্বের আত্মীয়তায় ব্যথিত মথিত করে দিয়ে যায়।

এর জন্যেই বুঝ-অবুঝ সমস্ত মানুষের রক্তিম হৃদয়ের প্রতীক্ষা।

'এ কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।'

আমাদের সকলের ছিল 'চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা'। প্রথম যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীর মানুষ আমরা। ভীত সন্ত্রস্ত, মানব্য-বিরোধী অস্তিত্বের কালো ছায়া যখন ধীরে ধীরে আরো ঘন বীভৎস দৈত্যাকার রূপ নিয়ে আমাদের আবৃত করতে চলেছে, তখনি সবাকার অলক্ষ্যে কোন প্রত্যক্ষ, আশু প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই এমন এক শিশুর জন্ম হল।

এক শিশু-রানার! কবি-রানার! পৃথিবীর মানুষের চেতনার ও চিন্তার অলক্ষ্যে তার জন্ম। তার জন্ম-মুহূর্তের কান্নায় কিন্তু যেনবা প্রতিবাদী ঘোষণা যা সর্বকালের মানুষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। কোটি কোটি বছর, কোটি কোটি জীবন শেষে নতুন শপথের চিঠিটি নিয়ে পুনরাবির্ভাব।

এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে মেলে।

সুকান্তর জন্মক্ষণে বুঝি ছিল এমনি এক বিরাট তাৎপর্য। না হলে আগামী রক্তাক্ত দিনগুলিতে কর্মী, সংগঠক, মানবদরদী, সাম্যবাদী, সরল, নিষ্পাপ এক কিশোর কি করে মহাকালের শুভ্র দেয়ালের লিখনে কবি বলে চিহ্নিত হয়ে গেল?

এই সুকান্তের জন্ম শহরের বুকে, এক চার দেয়ালে ঘেরা প্রকোষ্ঠে।

না, নিজেদের বাড়িতে নয়, বাড়িটি সুকান্তর মাতুলালয়!

পনেরোই আগস্ট!

এই তারিখটি ভারতের জাতীয় জীবনে রোমাঞ্চকর শিহরণ জাগায়। যে কোন দেশপ্রেমিকের হৃদয়কে যেনবা প্রতিনিয়ত নতুন করে শপথের জন্যে আহ্বান করে। এই পনেরোই আগস্ট! মহর্ষি শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-তারিখ। সুকান্তর জন্মের আগে তা ঘটে। সুকান্তর জন্মের পরে স্বাধীনতা দিবস এমন তারিখের মালাটিকে যেন নতুন একটি ফুলে চিহ্নিত করে।

সুকান্তর জন্ম তারিখ এমনি এক মালায় গাঁথা—যার সঙ্গে জাতীয়

জীবনের সূক্ষ্ম সূত্র থেকে যায়। ভারতের স্বাধীনতা দিবস, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ-ভাবনার সঙ্গে সুকান্তর সাম্যবাদী দুনিয়ার স্বপ্ন-বিজড়িত দেশপ্রেম যেনবা এমন একটি তারিখের অন্তঃশীল নির্দেশেই সংঘটিত হয়ে গেছে!

সেই রোমান্টিক মুক্তি-আন্দোলন—শ্রীঅরবিন্দ এনেছেন রাজনীতি থেকে ধর্মে, আধ্যাত্মিকতায়। দীর্ণ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতা দিবস এনেছে প্রজাতন্ত্রের বলিষ্ঠ প্রতীতিতে। সুকান্ত এনেছে সাম্যবাদী শপথ ও মানবতা-শোধিত বাস্তব কবিতার মেলবন্ধনে!

সবই অলিখিত, সবই অলৌকিক যোগাযোগ। ভারতের ভাগ্যাকাশে দুর্জ্ঞেয় আলো জ্বলে ওঠার মত।

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে সুকান্তর জন্মক্ষণ ও মৃত্যুক্ষণের ভাবনায়! অগ্রজ কোবিদ-কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু শ্রাবণে, অনুজ 'রানার'-কবি সুকান্তর জন্ম শ্রাবণে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম বৈশাখে, সুকান্তর মৃত্যু বৈশাখে। এমন গণনায় যেনবা অলৌকিক কিছু ভর করে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কবির এমন কালের রচিত রাশিচক্র আমাদের মত মানুষকে বিস্মিত করে বৈকি!

উনিশ শ' চৌদ্দ সালের তেসরা আগস্ট জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়াম আক্রমণের মধ্য দিয়ে যার ভয়াবহ সূত্রপাত, সুকান্তের জন্মের প্রায় আট বছর আগে অবসান হয়েছে সেই প্রথম মহাযুদ্ধের। উনিশ শ' আঠারো সালের এগারোই নভেম্বর জার্মানীর শোচনীয় পরাজয় এবং সর্বজনকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধবিরতির স্বাক্ষর দিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আনুষ্ঠানিকভাবে অবসান ঘোষিত হয়। তার আগে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে প্রায় দু'কোটি মানুষের মৃত্যুকে মেনে নিয়ে পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ, যুদ্ধবাজ জাতি 'Peace is one and indivisible'—অর্থাৎ 'এক ও অবিভাজ্য শান্তি'-কে মেনে নেওয়ার কথা কেউই ভাবেনি গভীরভাবে।

এই যুদ্ধের পরবর্তী কাল অপ্রত্যক্ষভাবে ভারত তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে ধীরে

ধীরে প্রভাবিত করতে থাকে। কারণ ভারত তখন ইংরেজ শাসিত, পরাধীন একটি বিষাদ-মলিন উপনিবেশ মাত্র। ইংরেজরাও সে যুদ্ধে ভয়ংকরভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন তখন নানা স্রোতে উচ্চকিত, তোলপাড়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনের পাশাপাশি জন্ম নিতে শুরু করেছে সাম্যবাদী আন্দোলন। অনুশীলন সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি গঠন সুকান্তর জন্মের সময় ভারত তথা বাংলাদেশের পরিবেশগত উজ্জ্বল ঘটনা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তখন কলকাতায় নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত। কিন্তু সুকান্তর যে পরিবেশে জন্ম, বিকাশ, বৃদ্ধি—সে পরিবেশে ছিল 'অনাবিল আনন্দের মেলা' বা 'সব পেয়েছির আসর।' সুকান্ত ছিল বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের একজন।

সুকান্তর দাদামশায় ছিলেন সেকালের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-বংশের সন্তান। শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে, আপাত-গম্ভীর স্বভাবে, সুগঠিত দেহ ও উজ্জ্বল চোখে ঋষি-দর্শন পুরুষ। বাইরে পূর্ণপুকুরের মত গম্ভীর, ভিতরে অনাবিল রসের স্রোত। বাচনভঙ্গি মনোরম, কৌতুকপ্রদ। তাঁর শিক্ষা ছিল সর্বপ্রকার গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে উপেক্ষা ও ত্যাগ করার। কিন্তু আদৌ নাস্তিক নন।

দিদিমা ছিলেন বিপুল স্নেহের ভাণ্ডার, দরাজ হৃদয়। মহাভারতে কুবেরের মতই তার যেন পরিমাণ! এমন মাধুর্যময়ী রমণীর সঙ্গ লাভ সুকান্তর মাতুলালয়ে ঘটেছে বলেই সুকান্তর শৈশব ও বাল্যকাল এক অন্য জীবনীশক্তি সঞ্চয় করেছে অলক্ষ্যে। মাটির গভীর অন্ধকার থেকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে গাছের মূলের অপার প্রাণশক্তি আহরণ করার মত। কিশোরকালে সুকান্ত-চরিত্রে চমৎকার মাধুর্যের প্রকাশ ছিল। ছিল সংস্কার-মুক্ত মনের অনাবিল আকাশ, আরও ছিল নির্বিচারে সমস্ত মানুষের প্রতি, বোধ হয় বিপুল নিরাকার মানব জাতির প্রতি সশ্রদ্ধ নিবিড় ভালবাসার আকর্ষণ, নম্র নিবিড় নৈকট্যে আসার তীব্র আর্তি।

এসবই সে পেয়েছে তার দাদামশাই-দিদিমার আদর্শ-দাম্পত্যের বিশুদ্ধ পরিবেশে।

সুকান্তর ব্যক্তিস্বভাবের অন্তঃস্বভাব রচিত হয়েছে মাতুলালয়ের মানুষগুলির সঙ্গসুখ থেকে। দিদিমার স্বভাব ছিল কোমল, আত্মমুখ, মুখচোরা জাতীয়। বালক, কৌতূহলী সুকান্ত ব্যক্তিক জীবনে কখন অজ্ঞাতে সেই স্বভাবটি নিজের করে নিয়েছে।

আর কবি সুকান্তর ?

তারও রসদ এসেছে এই মাতুলালয় থেকেই। 'অনাবিল আনন্দের মেলা' যে একান্নবর্তী পরিবারে, সেখানে সুকান্তর মনটি সংস্কৃতি-রসপুষ্ট হবারও সুযোগ পায়। দলবেঁধে এমন পরিবারের ছোটরা বাড়িতেই করত নাটক অভিনয়। বালক সুকান্তর কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠত এমন পরিবেশে। শিশুর চোখে যা ছিল বাক্‌শক্তিহীন শুধুই বিস্ময়, শুধুই খেলা, শুধুই ভারহীন-দায়িত্বহীন উন্মুক্ত অবোধ জীবনযাপন, বালকের চোখে ও মনে তা হয়ে ওঠে অসীম কৌতূহল, অনন্ত জিজ্ঞাসা, অপার বিস্ময়বোধ।

বালক আর কিশোর সুকান্ত—এর ক্রান্তিরেখায় দাঁড়িয়ে সুকান্ত মামার বাড়িতে সুযোগ পেয়ে যায় নাটক লেখার ও পরিচালনা করার। শুধুই খেলার ছল। কিন্তু তবু এসবের মধ্যে কোথা থেকে যেন আগামী দিনের কবি সুকান্তর রক্ত-মাংস-মজ্জার অন্তর্নিহিত আত্মার ভ্রূণটি রচিত হয়ে যায়।

সুকান্তর বয়স তখন দশ কি এগারো। লিখে ফেলে 'বিজয়সিংহের লঙ্কা বিজয়' নামে একটা নাটক। আর একটি নাটকও লেখে— 'লঙ্কাকাণ্ড'। নাট্যকার, পরিচালক, স্বয়ং-অভিনেতাও কোন কোন বা একই নাটকের একাধিক চরিত্রে।

স্রষ্টার সৃষ্টিতে নামমাত্র প্রয়াস সীমিত। কিন্তু স্রষ্টার মনে আগামীদিনের সহ-জ ললাটলিখন বুঝি শুরু হয়ে যায়।

উনিশ শ' ছাব্বিশ থেকে উনিশ শ' চল্লিশ সাল।

সুকান্তর এই পনেরো বছরের বয়স-পরিধিতে অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙা-গড়া, অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, আবার বিস্মরণও, অনেক দুর্ভোগ, হতাশা-বেদনার রক্তলিখনও আছে।

কিন্তু কবি সুকান্ত আলাদা জাতের, আলাদা স্বভাবের মানুষ।

স্রষ্টা যে সে তো নির্জন, নিঃসঙ্গ থাকে মনে, কিন্তু বাইরে তার নিজেরই চারপাশে সশরীর উপস্থিতি কামনা করে জনমানসের, জনগণের।

তাই সুকান্তর বাল্যকালে এবং কৈশোরে যে অজস্র ছোট-বড় ঢেউয়ের ওঠা-নামা, তা তাকে সংসারী হতে দেয়নি, দিয়েছে বাইরের দিকে ঠেলে।

সুকান্ত অল্প বয়স থেকেই বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। বাইরে আছে অজস্র মানুষের হাতছানি, আর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আছে ধ্যানস্তব্ধ কবি-আত্মার মানব-মঙ্গল-প্রদীপ নিয়ে বস্তুভিত্তিক জীবন-বরণের জন্য বোধনের প্রতীক্ষা।

যে কবি জনগণের, যার গায়ে জনগণের নামাবলী জড়ানো, সে কবি জনগণের দলিল রচনার স্বপ্ন দেখে ক্রমশ।

কবি সুকান্তর স্বপ্ন তার কঠোর, প্রত্যক্ষ, বিক্ষত বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতাকে জড়িয়েই।

তৃতীয় অধ্যায়

মন পরিবার পরিবেশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যদিও প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের বুকে সেই যুদ্ধ আদৌ এসে ধাক্কা দেয়নি, তবু দেশের গৃহী মানুষ থেকে গৃহহীন, ভবঘুরে সমস্ত রকম মানুষের গোপন শিক্ষার মধ্যে এসেছিল উৎকেন্দ্রিক ভাব, উৎকেন্দ্রিক জীবনচেতনা।

বালক বয়স থেকেই সুকান্তর পরিবেশ সুকান্তকে উৎকেন্দ্রিকতার শিক্ষা দিতে শুরু করেছিল।

সবই তার ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত। যে কোন বালক বাবা-মার ওপরেই নির্ভর থেকে বড় হতে চায়। তার শিক্ষা, রুচি বিশেষ পারিবারিক পরিবেশেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে উত্তরকালে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের অতীত নিজস্ব ব্যক্তিত্বে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাইরের সমস্ত ঘটনা তখন প্রত্যক্ষসূত্রে গৌণ, কিন্তু পরোক্ষভাবে পরিবেশের সমাজনির্ভরতা ও সমাজসম্পর্ক-সূত্রে বালকের বোধকে আন্দোলিত করতে পারে।

কবি সুকান্তর মানসগঠন সেইভাবেই হয়েছিল।

শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি।

বাস্তব জীবন-ছবি, পরিবেশের প্রভাব, আত্মমগ্ন থেকে নিজ-আত্মার অমোঘ নির্দেশ।

এই সবই ছিল সুকান্তর প্রথম পনেরো বছরের মানস গঠনের প্রোজ্জ্বল সর্ত।

একের পর এক ঘটনা তাড়িত করে সুকান্তর বালকজীবন ও সদ্য-কৈশোরের অনুভূতিগুলিকে।

সুকান্তর মা সুনীতিদেবী ছিলেন দেবীর মত সুন্দরী। দেবীর মত তাঁর স্বভাব। কেবল কোমল-স্বভাবা নন, দৃঢ়চিত্ততা তাঁর বুঝিবা কটি-ভূষণ। অত্যন্ত আত্মাভিমানী তেজী সুরুচিসম্পন্না। মুখে সদা-মধুর

হাসি। কঠিন নিয়মের প্রতি যেমন তাঁর ছিল অকপট আনুগত্য, তেমনি ছিল অনাবিল হৃদয়াবেগ, উদার নিঃসীম আকাশের মত স্বচ্ছ ন্যায়বিচারবোধ।

এই সমস্ত গুণই ছিল সুকান্তর চরিত্রে। তার ব্যক্তিক আচার-আচরণ সেই সঙ্গে কবি-আত্মার স্ফুরণ—সর্বত্র এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বিশুদ্ধ রক্তের মতো থেকে গেছে।

সুকান্তর বাবা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন ঘোরতম ঈশ্বর বিশ্বাসী, সৎ, পরিশ্রমী, একটু আত্মকেন্দ্রিক, স্বল্পভাষী মানুষ। কিন্তু এসবের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিদগ্ধ এই মানুষটির ছিল অন্তঃস্রোতের মত প্রবলতম শিল্পপ্রীতি! যৌবনের সেই সৌখীন পুরুষটি যজমানীবৃত্তি ছাড়াও নানাসূত্রে পাঁচালী-পাঠে ও শিল্পচর্চায় শিল্পী-সত্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এমন পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান সুকান্ত। দু'য়ের মিলিত স্বভাবে সুকান্ত আর এক উজ্জ্বল অস্তিত্ব।

এসব ছাড়াও ছিলেন সুকান্তর জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ দূর-সম্পর্কের কাকা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র সরোজ ভট্টাচার্য ও জ্যাঠতুত দাদা রাখাল ভট্টাচার্যের সাহিত্য-আলোচনা-সঙ্গ, ছিল সে সময়ের 'কল্লোল'-কল্লোলিত আধুনিক সাহিত্য-আড্ডার পরিবেশ। শিশু বালক কিশোর সুকান্ত এমন ঝকঝকে রক্তিম পরিবেশে অতি ধীরে নিজের মনটিকে গড়ে তুলছিল নিজেরই অজ্ঞাতে।

উনিশ শ' ছাব্বিশ থেকে উনিশ শ' চল্লিশ সাল।

মামার বাড়ির জীবন, বাগবাজারে নিবেদিতা লেনের জীবন, বেলেঘাটায় নিজেদের বাড়ির পরিবেশ, কলেজ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়ি ইত্যাদি মিলিয়ে সুকান্তর পনেরো বছরের মানস-পথ-পরিক্রমা অভিনব ও জটিল হয়ে ওঠে।

কবি সুকান্তর বয়স অল্প, তাই লঘুরসের ও ছন্দের কবিতাই বালক ও সদ্য-কিশোর সুকান্তর কানে ধ্বনি তুলতো সহজেই।

কিন্তু ছন্দের কান ?

সুকান্তর ছিল অসামান্য। একেবারে বাকদেবীর অযাচিত আশীর্বাদের মত! একেবারে শিশুকাল থেকে এই চমৎকার কানটি সুকান্তর তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সকলের তো এমন কান হয় না। সকলেই তো তার শিশুকালটিতে স্পষ্ট পা রেখে হেঁটে, আছাড় খেয়ে পরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়! সুকান্তর কি করে এমন সুন্দর একটি ছন্দের কান তৈরী হল ?

বিস্মিত হন আজকের কবি-সুকান্তর অনুরাগীরা, তাঁর কবি-অগ্রজগণও।

এসবেরও ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস অলিখিত, কিন্তু অবধারিত। সে ইতিহাস কৌতূহলে উচ্চকিত, কিন্তু অমোঘ। সে ইতিহাস জন্ম-রোমান্টিকদের একান্ত বাঞ্ছিত, কিন্তু অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির মত অলৌকিক হয়েও শিশুদের মনের মধ্যে রাখে আলোকময় নক্ষত্র।

সুকান্তর এমনি ছিল পরিবেশ। কেন যেন রবীন্দ্রনাথের বালককাল মনে পড়ে যায়।

বোধ হয় সব প্রতিভাবান কবিরই কবিপ্রাণের দস্তুরি এই!

সুকান্তর জ্যাঠতুতো বোন রাণীদি। তখন ওরা বেলেঘাটায় নয়, একান্নবর্তী পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবেই নিবেদিতা লেনের বাসিন্দা। বুদ্ধিমতী রাণীদি ছিল অন্যান্য ছোটদের মত সুকান্তরও আকর্ষণীয় আপনজন। রাণীদির বৈশিষ্ট্য;—তার উচ্ছল কল কল গল্পে, সুমধুর কণ্ঠের বাচনে, তার অবারিত-দ্বার গগন-ললাট-সদৃশ উদাত্ত কবিতা-আবৃত্তিতে। স্নেহ ছিল বাধাহীন, আর তা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে সুকান্তে এসে। শিশু সুকান্ত রাণীদির কাছে যেন দ্রোণশিষ্য একলব্যের মত!

শিশু সুকান্ত রাণীদির কোলে, কলকণ্ঠের কাকলিতে, কলরবপূর্ণ কথায় বড় হতে হতে প্রেরণার লাল ফুলটির জন্ম নিয়েছিল বুঝিবা

'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রতিভা প্রজ্ঞা'—এমন অলৌকিক ঈশ্বরের কাছ থেকেই।

প্রথম কবিতার স্বাদ, অনুপ্রেরণা বালক সুকান্তর পক্ষে জুটেছিল এই জ্যাঠতুতো বোন রাণীদির রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র আবৃত্তি-নিঃসৃত স্বর ও ছন্দের দমক থেকেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মা সুনীতি দেবীর কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের ধ্বনিমাধুর্য। স্বর ও সুরঝংকার, স্বরের টান, অন্তমিলের মোহ ও মহত্ব।

সুকান্তর জ্যাঠামশাইয়ের সাহিত্যানুরাগ, বাবার শিল্পপ্রীতি, কাকা সরোজ ভট্টাচার্য ও জ্যাঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্যের সাহিত্য-আসর, বৈমাত্রের ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্যের স্বভাবজাত শিশুসাহিত্য-প্রীতির সূত্রে শিশুসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ ঘরে নিয়ে আসা—এমন সব সংবাদ ও ঘটনাই সুকান্তর কবি-স্বভাবের অন্তর-দর্পণটি স্বচ্ছ, নির্মল করে তোলে।

বাবার ছিল পাঁচালী পাঠ, জ্যাঠামশাইয়ের উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক ও স্তোত্রপাঠ—যা ছিল পরিবারের মধ্যে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা—এসবের মধ্যে কবি সুকান্তর ছন্দের কান তৈরী হতে থাকে!

ভাবপ্রবণ বালক কিশোর সুকান্তর এমন ঘনিষ্ঠ আপনজন-স্বভাবের গোপন আত্মীকরণ তাকে শিশুসুলভ ছড়া রচনায় প্রবৃত্ত করে।

উনিশ শ' একত্রিশ কি বত্রিশ সালের ঘটনা।

মাত্র পাঁচ-ছ বছরের সুকান্ত তখন। শিশুর বিস্ময়টুকুই তার তখন একমাত্র সম্বল। শুধু নির্বোধ, সরল, পবিত্র তোতা পাখীর মত তার কথা, চিন্তা! এই সুকান্তই লিখল তার প্রথম ছড়া। সে ছড়া প্রাচীন কবিয়ালদের মত ছিল মৌখিক, লিখিত নয়। ছড়াটি পরিবারের আত্মীয়জনদের মুখে মুখে অবাক খুশীর-স্নেহে লালিত হতে হতে একদিন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়।

কিন্তু বিষয়টা ছিল শিশুচিত্তের কৌতূহল ও বিস্ময়ের যথাযথ পরিচায়ক।

সুকান্তর বেলেঘাটার বাড়িতে বাবার ব্যবস্থাপনায় একদিনের একটি ভোজন উৎসব। অবশ্যই এই ভট্টাচার্য বাড়িটির এ ছিল নিত্যকার ব্যাপার। পিতার গম্ভীর স্বভাবের মধ্যে এমন আনন্দের নিত্য আয়োজন ছিল তার স্বভাবের আয়নায় ভিতরের প্রতিবিম্ব। এমনি এক উৎসবে ভারী চেহারার এক ব্যক্তি বসেছেন খেতে। চেহারায় মোটা, খাওয়ার ভঙ্গিও তাঁর মোটা। সেই 'মোটামুটি' ভোজনের দৃশ্যটি শিশু সুকান্ত লক্ষ্য করে। পাঁচ-ছ বছরের শিশু। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়কে নিয়ে নিজের মত ধ্বনি, যতি, ছেদ ও 'রিদ্‌ম্' দিয়ে আধ-আধ স্বরে, সুরে, কথায় ছড়া বেঁধে ফেলে। নিতান্তই শিশুর ছড়া। এইটিই তার প্রথম কাব্য রচনা।

নিছক মৌখিক ছড়া দিয়ে তার শুরু। হয়ত এমন ছড়া রচনার ঘটনা অবহেলা বা উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু তা যে উপেক্ষার ছিল না তার প্রমাণ সেই বিশেষ ছড়াটি সুকান্তর জ্যাঠতুতো দাদা গোপাল ভট্টাচার্য, ও রাখাল ভট্টাচার্যের মুখে মুখে বহুদিন ঘোরে।

কি এমন ছিল এই ছড়ায় যার জন্যে কবি সুকান্তর জীবন মন কথায়: এমন ঘটনার স্মরণ করতেই হয়? সুকান্তর পিতাও সেই ছড়া শুনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের অস্বাভাবিক ক্ষমতায় বিস্মিত না হয়ে পারেন নি সেদিন!

তা হল সুকান্তর ছন্দের কান, সেই সঙ্গে রোমান্টিক কল্পনায় বিষয়কে কাব্যের চরণে, অন্তমিলে, ছন্দের 'রিদ্‌মে' ধরে বলার ক্ষমতা।

তখন সবে মাত্র সুকান্তর অক্ষর-পরিচয় শুরু। তারই মুখে এমন ছড়া গেঁথে বেরিয়ে আসার মধ্যে কবির মন তৈরীহয়ে ওঠার ব্যাপারটাও থেকে যায়।

সুকান্ত কবি, সুকান্ত ছান্দসিক, সুকান্ত রোমান্টিক।

এমন সব অভিধা পাওয়ার আগের প্রেক্ষিতে আছেন তার রাণীদি, তার মা, জ্যাঠামশাই, তার নিজের, বৈমাত্রেয় ও জ্যাঠতুতো দাদারা।

এককথায় সমগ্র পরিবারের পরিবেশ তাকে প্রাণিত করেছিল কবি হয়ে ওঠায়। তার আত্মাকে দীপিত করতে সহায়ক হয়েছিল।

সুকান্তর শিশুসুলভ দেয়াললিপি—'কালীরতন চাঁদবদন'। নিজেদের দোকানের কর্মচারীকে মনে রেখে এমন একটি পংক্তির মধ্যে এক বালকের দুষ্টুমির পরিচয় থাকতে পারে, সেই সঙ্গে আছে সেই কান—যা 'রতন' 'বদন' ধ্বনি-সাম্যে এসে সুকান্তর ভাবীকালের কবিমানসের অনুগামী ছন্দ-সুষমার পরিচয় স্পষ্ট করে।

একদিকে রাণীদির আবৃত্তি, মায়ের প্রাচীন বাংলা মহাকাব্য পাঠ, জ্যাঠামশাইয়ের সংস্কৃত শ্লোক-আবৃত্তি, আর একদিকে বৈমাত্রেয় দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্যের অলক্ষিত সহযোগিতা, সে সহযোগিতা দোকান থেকে যোগীন সরকার, সুনির্মল বসু প্রমুখের ছড়ার বই ঘরে আনার সূত্র—এই দুয়ের সমাপতনে সুকান্তর আগামী দিনের কবি হওয়ার একটি গভীর গোপন প্রতিশ্রুতি রচিত হয়ে যায় ওর স্বভাবে।

ন'দশ বছরের বালক সুকান্ত, তখন বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনের বাসিন্দা। তার আগে কলেজ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়ির পাঠ শেষ। এই বেলেঘাটার বাড়িতে থাকতেই প্রায়শ ছড়া লেখে সুকান্ত।

রমা রাণী দুই বোন পরীর মতন
সবে বলে মেয়ে দু'ই লক্ষ্মী কেমন
দুই বোন রমা রাণী
সবে করে কানাকানি
দুই জনে হবে ভালো
করিবে সে ঘর আলো সীতার মতন।

এই ছড়া লেখার প্রেক্ষিত সুকান্তর সে সময়ের পরিবার। বালক মন, একান্নবর্তী পরিবারে জ্যাঠতুতো ছোট ছোট বোনেদের সঙ্গ। নিষ্পাপ শিশু, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বালক সুকান্তর মনের গভীরে কবিমনটি দানা বাঁধে এইভাবে—পারিবারিক সম্পর্কে, সূক্ষ্ম কোমল অবোধ ভাবনার মধ্য দিয়ে। বিষয়ে তাই দুই বোন, কিন্তু ছন্দে, ধ্বনিতে, অন্তমিলের বিচিত্র ফুলের মালার মত সৌন্দর্যে, যতির নিটোল অনাবিল আরামে ও অলস প্রবহমানতায় কবি সুকান্ত পরিবারের আপন হয় বটে, আগামী দিনের আর এক কবির

জন্যে উন্মুক্ত, সবুজ, রক্তাক্ত মাঠের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিটুকুও আভাসিত করে দেয় সমস্ত পাঠকের কাছে।

ন'দশ বছরের বালক সুকান্তর বয়স একেবারেই কাঁচা, মন কাঁচা, অভিজ্ঞতাও পরিবারের পরিবেশে কাঁচা।

কিন্তু সে সময়ের ছড়ায়, ছোট-খাটো কবিতায় সেই কাঁচা ব্যাপারটা থাকে নি।

সুকান্তর কবি-মনের মূল ভিত্তিটি খুব শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল পরিবারের পরিবেশেই। সেই ছন্দের হাত।

ও পাড়ার শ্যাম রায়
কাছে পেলে কামড়ায়
এমনি সে পালোয়ান,
একদিন দুপুরে
ডেকে বলে গুপুরে
'এক্ষুনি আলো আন।'

লক্ষ্য করার বিষয়, এমন নিখুঁত ছন্দে চরণ রচনার মধ্যে থেকে গেছে একটি কাহিনী বলার, চরিত্র আঁকার সুনিপুণ স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতা। পরবর্তী নয়টি চরণে আছে ছোটগল্পের চমক, শেষ তিন চরণে গল্পের মতই পরিণামী সিদ্ধান্ত। মাত্র ন'-দশ বছর বয়সের সুকান্তর ছন্দের 'কান'-এর মধ্যে তৈরী হয়ে আছে গল্প বানাবার মন। এমন 'কান' আর 'মন'-এর জন্য রসদ যুগিয়েছে সুকান্তর বাল্য জীবনই।

কী বিপদ তা হ'লে
আলো তার না হলে
মার খাব আমরা?
দিলে পরে উত্তর
রেগে বলে, 'ধুত্তোর
যত সব দামড়া।'
কেঁদে বলি শ্রীপদে
বাঁচাও এ বিপদে—
অক্ষম আমাদের

হেসে বলে শ্যামদা
'নিয়ে আয় রামদা
ধুবড়ির রামাদের।'

এক বালক-বয়সী কবির এমন শব্দ-সচেতনাও বিস্ময়কর। 'ত্বপুরে'-র সঙ্গে 'গুপুরে', 'উত্তর'-এর সঙ্গে 'ধুত্তোর', 'শ্রীপদে'-র নীচে 'বিপদে', 'শ্যামদা' বলেই 'রামদা' বলায় শব্দ-চেতনা ও ধ্বনিজ্ঞানের নিখুঁত উপলব্ধি নিশ্চয়ই অবাক করে। ছন্দের মোলায়েম কানটি কবি সুকান্তকে এই বয়সেই উৎসাহী পাঠকের বুকের গভীরে বসিয়ে দেয়।

শিশু, বালক, সদ্য-কৈশোর সুকান্তর শুরু ছড়া দিয়ে। তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু কবির জীবন ছিল আকস্মিক আবির্ভূত উল্কার মত। তাই সময় নিয়ে তার এগিয়ে যাওয়া নয়, হঠাৎ হঠাৎ ধাক্কায় তার চলা ছিল অবধারিত। একটি কৈশোরেই তরুণ, কৈশোরেই যুবক, কৈশোরেই প্রৌঢ়, আবার সীমিত জীবন-মাপে পরিণতিও। তাই তার যাত্রাপথ ছিল দ্রুততায়, কিন্তু অমোঘ, অনন্যমনস্ক।

শিশুকাল থেকে সদ্য-কৈশোরে পা-দেওয়া পর্যন্ত সময়-পরিধিতে সুকান্ত নিয়ম মেনে চলেনি। নিয়মমাফিকে তার তো ছড়া লেখার শিক্ষা নয়। ভিতরে ছিল প্রতিভার দীপ্তি, জ্যোতি, বাহির তাকে দিয়েছে সহায়তা, আশ্রয়।

সুকান্তর ছিল না বাঁধা-ধরা স্কুলের রুটিনের প্রতি বিনীত সুবোধ, সরল আনুগত্য। সাংসারিক প্রয়োজনের কথা ভেবে তাকে তার মধ্যে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল অক্লান্ত, কিন্তু সে প্রয়াস নিষ্ফল। বাড়ির মানুষকে সে বাসনাও পরিত্যাগ করতে হয় পরিশেষে।

আর কবি স্বয়ং?

কবি সুকান্ত শিশুকাল থেকেই। তাই বালক বয়সে, কৈশোরের ক্রান্তিরেখায়, কৈশোরের মধ্যগগনে এসে সুকান্ত নিজেই সমস্ত কিছু পণ্ডশ্রম ভেবে স্কুলের সফলতার সীমারেখার দিকে পিছন করে দাঁড়ায়, কারণ তার তখন বাইরের ডাক আসার সময় এসে গেছে।

সুকান্ত-অনুজ অশোক ভট্টাচার্যের কথায়,—'আশপাশের জীবনকে

ছাড়িয়ে, এড়িয়ে বাঁধাধরা স্কুলের রুটিন, শুধু দু-চোখ মেলে দুনিয়াকে চেনা, জানা আর খাতার পাতা ভরে লিখে-চলা ছন্দোবদ্ধ কবিতা—এই ছিল তখন তাঁর প্রতিদিনের কাজের তালিকা।

'অজানা কিছুর পিছনে ছুটে যাওয়া, অচেনা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করা অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা প্রকৃতি ও তার বুকে লালিত মানুষের ব্যাপক জীবনকে জানার যে বাসনা তা সুকান্তর মনে ছিল আশৈশব। শেষ পর্যন্ত একদিন বন্ধু রবীনকে নিয়ে বেরিয়েও পড়েছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়; হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে দু-পাশের বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, শহর স্টেশন ছাড়িয়ে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সুদূরপ্রসারী ধানক্ষেতের ওপারে, যেখানে আকাশ স্পর্শ করেছে দিগন্তকে, কিংবা যেখানে মাথা উঁচু করা কালো পাহাড় ছুঁয়েছে শাদা মেঘের বুক।

'আশা ছিল এ যাত্রা দীর্ঘ হবে। কিন্তু পকেটের অপ্রাচুর্য আর সঙ্গীর ভঙ্গুর মনোবল সে আশার মুখে কালি মাখালো। তিনদিন পরে ফিরে আসতে হল কলকাতায়।'

কলকাতা! কবি-সুকান্তর অকৃত্রিম ভালবাসারই এক নগরী কলকাতা! অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা চিঠিতে একটি আন্তরিক উক্তি, নাকি এক নগর-প্রাণ কবির আত্মিক স্বগতোক্তি!—

'বাস্তবিক ভাবতে অবাক লাগে, আমার আজন্ম পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর অরুণ?

'কলকাতাকে আমি ভালবেসেছিলাম এক রহস্যময়ী নারীর মতো, ভালবেসেছিলাম প্রিয়ার মতো, মায়ের মতো। তার গর্ভে জন্মানোর পর আমার এতগুলি বছর কেটে গেছে তারই উষ্ণ নিবিড় বুকের সান্নিধ্যে, তার স্পর্শে আমি জেগেছি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না, চিনি না—আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ। একদিন হয়তো এই পৃথিবীতে থাকবো না, কিন্তু এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে আমি কলকাতায় বসে কলকাতাকে উপভোগ করছি।'

সুকান্তর নিজেরই রক্তের কণিকা ও ঘ্রাণ জড়ানো এই কলকাতায় ফিরে আসতেই হল। এও যেন কবির অন্তরতম হৃদয়-প্রদেশের উষ্ণ নির্দেশের এক নিয়তি-নির্দিষ্ট লিখন!

কিশোর খেয়ালী সুকান্ত কলকাতায় ফিরে এল।

কিন্তু কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে খবর পায় সুকান্ত বেলেঘাটার বাড়িতে সুকান্তর অগ্রজ সুশীলের আকস্মিকভাবে সেপ্‌টিক-জনিত নিদারুণ অসুস্থতার!

এইরকম সব অসুস্থতা ও আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনা—যা' ছিল সংখ্যাধিক এবং নির্মম নিয়তির যতি-নির্দিষ্ট পদক্ষেপের মত, সেগুলিই কিশোর সুকান্তর জীবন ও মনকে ভয়ংকরভাবে প্রভাবিত করে, আচ্ছন্ন করে, আড়ষ্ট করে, একসময়ে বিষণ্ণ করে।

এক কিশোর অবোধ কবির ও কবিমনের আর এক গোপন শিক্ষা শুরু হয় সেই সব ঘটনার প্রেক্ষিতেই।

একাধিক মৃত্যুর পরিবেশে মৃত্যুর পরোক্ষ শিক্ষা নিয়েই কিশোর কবির জীবন-মনের নতুন অধ্যায় শুরু।

চোখের জলের সঙ্গে করুণ বিষণ্ণতার, নিঃসঙ্গতার, নির্জনে নিমজ্জিত এক মুখবিম্বের অধ্যায়। শামুকের অস্তিত্বের মত সমস্ত কিছু থেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মমগ্ন এক কবির নিঃসঙ্গ আত্মার অপূর্ব লালন, ভরণ-পোষণের কালো অধ্যায়। ঠিক মৃত্যু দিয়ে নয়, মৃত্যুর মত কঠিন, নির্মম নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতায় বালক বয়স থেকেই বিষাদের সেরকম অধ্যায় কি ফরাসী কবি বোদলেয়ারের ছিল, ছিল দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের? কবিরা, যাঁরা ভাবুক, দরদী, তাঁদের মন বড় 'সেন্‌জিটিভ'। হয়ত সুকান্ত এমন একাধিক মৃত্যুভাবনার সূত্রেই সগোত্র হয়ে যায় মৃত্যু-উপমার অনুরূপ সম্পর্ক-বিচ্ছিন্নতার, বিষাদের বলি বোদলেয়ারের, শোপেনহাওয়ারের।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর মিছিল নিঃসঙ্গ মন আত্মার মুক্তি

কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চল, সেই বাসগৃহ।

চৌত্রিশ নম্বর হরমোহন ঘোষ লেনে ৺কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-তীর্থ মহাশয় ও সুকান্তর বাবা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের যৌথ প্রয়াসে সেই বাসগৃহ নির্মাণ।

কলকাতায় সুকান্তদের জন্য নির্দিষ্ট স্থায়ী আস্তানা।

সেই কলকাতা! সভ্যতার দেয়ালের লিখনে ক্রমশ কল্লোলিনী হয়ে-ওঠা সেই কলকাতা—কবি সুকান্তর 'এক রহস্যময়ী নারীর মতো', 'প্রিয়ার মতো', 'মায়ের মতো' কলকাতা!

কিন্তু কলকাতার এই বাড়ির মধ্যেই সুকান্তর নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটে। চোয়াল শক্ত-হয়ে-ওঠা, কঠিন নির্মম সত্যের জীবন হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় সম্ভব হয় মৃত্যুর দর্পণে। এবং এই কলকাতার পরিবেশেই তা সম্ভব হয়েছে কবি-কিশোরের জীবনে।

মৃত্যু! মানুষের অবধারিত নিয়তি! এর থেকে সত্য আর কিছু নেই! মৃত্যুর চোখে জল! সে তো পৌরাণিক গল্প! কিন্তু তা-ও কত সত্য!

এমন মৃত্যুর অভিঘাতের স্পষ্ট সব ছবি ব্যক্তি সুকান্ত ও কবি সুকান্তকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে। যেনবা সুকান্তই তার হাতে কোন অন্যায় করার জন্য বন্দী!'

বিখ্যাত জার্মান চলচ্চিত্রকার বার্গম্যানের সেই নায়ক আর মৃত্যুর দাবার নিঃশব্দ খেলার ছবি বুঝিবা এক কিশোর দেখেছে তার বেলেঘাটার বাড়িতে, এই কলকাতায়—নরম উষ্ণ রোমান্টিক কিশোর-কালে, মনে, অধি-আত্মার মুকুরে!

কবি-সুকান্তর অন্তরের অলঙ্কারক রস রচিত হয়েছে, জমা হয়েছে ধীরে, অতি ধীরে এই মৃত্যুর একাধিক ঘটনার আকস্মিকতার মাধ্যমে। এমন সব মৃত্যুর ভিড় কখনো আকস্মিক বজ্রপাতের মত, কখনো বা কঠিন মৃত্যু-বিরোধী সংগ্রামে রত থেকেও অসহায় আত্মসমর্পণের মত, কখনো আবার নিয়তিই একমাত্র সত্য—এই বিশ্বাসের বশবর্তী থেকে মৃত্যুকে স্বাভাবিক আলিঙ্গন করার মত। এ সমস্তই কবির চোখে, কবির সামনে ঘটে গেছে।

বেলেঘাটার বাড়ি কি এক অভিশপ্ত বাড়ি?

এ প্রশ্ন সুকান্তর পরিবারের বর্ষীয়ান মানুষদের মনে নিশ্চয়ই জেগেছিল। না হলে কবি সুকান্তর মাসতুতো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এমনভাবে লিখলেন কেন—'কিন্তু কি আশ্চর্য, এই বাড়িতে আসার পর থেকে প্রায় প্রতি বছর মৃত্যু এসে একজনের পরে একজনকে গ্রাস করতে লাগল।'

সুকান্তর অতিপ্রিয় কলকাতা যেন বালক থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার কালে শুধু-মৃত্যুর শিক্ষাই দিয়েছে। কিশোরের রোমান্টিক মন, সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রাণ কবিমন, অত্যন্ত আশাবাদী বিস্ময়-ব্যাকুল, অসীম জিজ্ঞাসা, অনন্ত কৌতূহল ও অভীপ্সায় তাজা, সজীব, নবপত্রে শোভিত বৃক্ষের মত সবুজ মন।

ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর অন্তরঙ্গ স্মৃতি-চারণে লিখেছেন, 'সুকান্তর রাণীদি থেকে শুরু করে একে একে তার পিতামহী, বড়দা গোপালচন্দ্র এবং সেজদার শিশুকন্যাদ্বয় শ্রী ও মঞ্জু, তারপরে সুকান্তর জ্যাঠামশাই, যিনি এই পরিবারকে সুদূর পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রাম থেকে শহরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই পরিবারে এনে দিয়েছিলেন সচ্ছল অবস্থা —সেই পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মৃত্যুর শিকার হলেন। এমনি করে একে একে অনেককেই বিদায় নিতে হল পৃথিবী থেকে মাত্র অল্প-কয়েকদিনের ব্যবধানে। এ যেন এক মৃত্যুর মিছিল।'

মৃত্যুর মিছিল! এর বিপরীতে জীবনের মিছিল!

সুকান্ত যখন উৎকেন্দ্রিক জীবনের ঘূর্ণিস্রোতে পড়েছে তখন তো সে জীবনের মিছিলকে দেখার জন্যেই উৎসুক হয়ে ওঠে। সে কি এমন মৃত্যুর মিছিলকে উপেক্ষা, অস্বীকার করার জন্যেই জীবন দিয়ে মানুষের মিছিলকে বরণ করার অভীপ্সা ?

মৃত্যুর পাশে জীবন, বুঝিবা পরস্পর পরস্পরের অনুগামী ! দুঃখের পাশে শান্তি, কালোর পাশে সাদা, সত্যের সঙ্গে ভুল ও মিথ্যা !

বিষম বৈপরীত্যে গভীর চমক, তীব্র গতিও, কিন্তু অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে সমস্ত বৈষম্যের, বৈপরীত্যের অবসান। জীবন আর মরণ— একটি আর একটির সম্পূরক ? মহাজীবন আর মহামরণে স্বাভাবিক উত্তরণে সহায়ক !

সুকান্ত জীবনকে চেয়েছিল কঠিন দুঃসহ শীতের দিনে জ্বলন্ত চুল্লীর মত। তাই মৃত্যুর এক একটি ঘটনা তাকে যেমন প্রতিবারেই শূন্য কূপের দিকে ঠেলে দিত, তেমনি বাড়াত জীবনাকাঙ্ক্ষা, জীবনতৃষ্ণা। এই জীবনতৃষ্ণাই রূপ নিয়েছিল সর্বকালিক মানবতৃষ্ণায়—মানব্যে।

দুঃখের দহন জ্বালায় সুকান্তর কিশোর মনে যে হতাশা, শূন্যতা, যে কঠিন নৈঃশব্দ্যের নিদারুণ পরিচয়, তা সাময়িক। চিরন্তন ছিল তার জনতার 'শত কোটি কণ্ঠ কলকলনিনাদ'। সে দেখতে চেয়েছিল 'দ্বিশপ্ত-কোটিভুজৈর্ধৃত খর করবালে' !

উনিশ শ আটত্রিশ সাল। সুকান্তর বয়স মাত্র বারো বছর। সুকান্তর বড়দা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মারা গেলেন। বারো বছর বয়সের কিশোরের বিস্ময়, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় বুঝিবা অসীমের রহস্য-ধাঁধায় বদ্ধ হয়ে গেল। সচেতন সুকান্তর এই এক শিক্ষা।

কিন্তু মৃত্যুস্মৃতি কখনো কাউকে চিরকালীন যন্ত্রণায় ধরে রাখে না। কারণ এই মায়া-প্রপঞ্চময় বিশ্বের অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষকে মায়ার মোহাঞ্জনে অনেক কিছু ভুলিয়ে দেওয়ার। একে একে অনেক মৃত্যু ঘটেছে বেলেঘাটার বিখ্যাত ভট্টাচার্য পরিবারে, কিন্তু সবই কবি সুকান্তর

মধ্যে রেখাপাত করেই সরে গেছে, দিয়ে গেছে তার ওপর বলিষ্ঠ-জীবনবরণের স্থায়ী প্রত্যয়ের প্রত্নলিপি।

সুকান্তর রাণীদি নিজের অজ্ঞাতেই অবোধ-শিশু সুকান্তকে দিয়েছিল কল্পনাপ্রবণ মন হওয়ার রসদ, কবি হওয়ার কান, আরও দিয়েছিল শিশুমনের রোমান্টিক কৌতূহলকে চরিতার্থ করার ছন্দ, শব্দ, কথা, সুর, ধ্বনি, ছড়ার রূপ। সেই রাণীদি যখন সুকান্তর সামনে থেকে এক আকস্মিক নিয়তি-নির্দেশে অন্তর্হিত হয়ে যায়, তখন সুকান্তর সেই কৌতূহলই বড় হয়ে ওঠে, দুঃখ-শোক ছায়া ফেলে সঙ্গে সঙ্গে সঁরে যায়। তা-ই বেলেঘাটার বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যেই অস্পষ্ট, সুদূর কোন শোকবিহ্বল ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

উনিশ শ তেত্রিশ কি চৌত্রিশ সালের ঘটনা। সুকান্তর তখন কতই বা বয়স? সাত-আট বছর!

রাণীদি মারা গেল। সুকান্তর অতি প্রিয়, অতি আদরের জ্যাঠতুতো বোন রাণীদি। এমন শোকের ছায়ায়, এমন ক্রন্দনাকুল পারিবারিক পরিবেশে সুকান্তর শিশুসুলভ মনে বিস্ময়চকিত, বিহ্বল অবোধ শিশুর কিছু না-বোঝা, না-জানার মধ্যেও থেকে যায় মূল্যবান কিছু হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতা। কিন্তু সে শূন্যতা বড় হয়ে থাকেনি। সুকান্তর কাছে তা স্মৃতি হতে হতে একসময় ধূসর হয়ে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

শিশু, বালক, সদ্য-কিশোরের সামনে একাধিক পারিবারিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এসবের থেকেও সবচেয়ে যে মৃত্যু তার জীবনকে ভয়ংকর ভূমিকম্পের মত নাড়া দিয়ে যায়, তা হল সুনীতিদেবীর অসীম রোগ-ভোগ ও অকাল মৃত্যু।

সুনীতিদেবী সুকান্তর মা। তাঁর মৃত্যুর সময় সুকান্তর বয়স অবশ্যই বয়সের অনুপাতে সবকিছু বোঝার, জানার, অনুভব করার মত মানসিক গড়নের উপযোগী নিঃসন্দেহে। উনিশ শ আটত্রিশ সালে গোপাল ভট্টাচার্যের মৃত্যুর কিছুকাল বাদেই মায়ের দিক থেকে আঘাত আসে। সুনীতিদেবী তীব্র অসুস্থতার মধ্যে বিছানা নেন।

মায়ের অসুখ দুরারোগ্য কর্কটরোগ। পেটের ভিতর যেখানে রঞ্জনরশ্মির আলোর কণা ছাড়া আর কারোর দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেই শরীরের দুর্গমতম অংশে সন্ধানী রঞ্জন রশ্মিতে ধরা পড়ে দুরারোগ্য ব্যাধিটিকে। সমগ্র পরিবার, মানুষ, অর্থনৈতিক অবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা—চতুর্দিককে হতাশার, অসহায়তার কালো থাবা ক্রমশ ঘিরে ধরতে থাকে।

রোগের প্রথম আক্রমণে মধুপুর, ঈষৎ সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পরও আবার মধুপুরে যাওয়া। মূল বাসনা—রোগিনীর রোগের উপশম ঘটানো। প্রথম সাধারণ উদরের রোগ হিসেবেই বিশ্বাস ছিল সকলের। দ্বিতীয়বারের চিকিৎসায় ধরা পড়ে ক্যান্সার। তবু আশা—হয়ত মধুপুরেই গেলে এমন কালান্তক যন্ত্রণার উপশম হবে।

ভয়াবহ-কঙ্কালসার, শীর্ণদেহ সুনীতিদেবী মধুপুরে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন সুকান্ত তার জ্যাঠাইমার বাড়ি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলিতে গভীর-নিবিষ্ট। সুনীতিদেবীর শেষ কাজটুকুও সারা হয় মধুপুরেই।

প্রথমে রোগ-যন্ত্রণা, পরে বিদেশ বাস, শেষে অসহায় মৃত্যু—এই-সব সূত্রে সুকান্ত মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। এই সাময়িক বিচ্ছিন্ন সম্পর্কগুলি যখন চিরন্তন বিচ্ছিন্নতার বিষাদকে কালবৈশাখীর ঘন মেঘের মত সুকান্তর মাথার ওপর এসে ভাসতে থাকে, তখন সুকান্তর বয়স বারো। সঙ্গে একাধিক ছোট ছোট অসহায় শিশু-অনুজ।

কবি সুকান্তর একুশ বছরের জীবনের দুটি প্রধান পর্ব। মায়ের মৃত্যুর আগে ও পরে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত সুকান্তর এক জীবন। মায়ের মৃত্যু তার জীবনের মোড় দেয় ঘুরিয়ে। কবি-কিশোর সুকান্ত কবি-আত্মায় চিরকালের শিল্পীদের স্বভাবেই জন্ম-নিঃসঙ্গ। মায়ের মৃত্যু তাকে করল বাইরের জীবনেও নির্মমভাবে নিঃসঙ্গ। এ নিঃসঙ্গতা অভিশাপ, আবার বুঝি নিয়তির আশীর্বাদও!

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,

সত্যিই সুকান্ত মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল আত্মজ অনুজদের সঙ্গে নিয়ে। বারো বয়সের এক কিশোর কি-ই বা জানে সংসারের ? তার কাঁধে তাই তো 'জানা-অজানার বোঝা !'

তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ-বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।

এখানে তো কবির নিজের জীবনের কথা। বাইরের জীবনে আহত হতাশগ্রস্ত, বহু মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় বিষাদখিন্ন, কিন্তু অন্তর্লোকে আছে রক্তিম পথের জন্য আর্তি—যে পথ পূর্বদিকের, যে পথে আছে লাল সূর্যের পথের নিশানা।

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,

* * *

রানার ! রানার ! কি হবে এ বোঝা বয়ে ?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?
রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে আকাশ হয়েছে লাল
আলোর স্পর্শে কবে কেটে যাবে এই দুঃখের কাল ?

কিশোর কবির এমন সব জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন, আবেগস্পন্দিত আর্তি, রানারের অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক-প্রতিম ব্যঞ্জনায় যা ব্যক্ত করে, তা সেই বারো বছরের কবির আন্তর অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোত। সুকান্তর ছিল ভয়ংকর সাহস, দুর্বার বাসনা, দুরন্ত প্রাণশক্তি—তা না হলে সে একদা এক নিষ্ঠাবান সাচ্চা কমিউনিস্ট কর্মী হয় কি করে ? কি করেই বা সে সমস্ত জটিল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিশুদ্ধ কবিপ্রাণের অধিকারী হয়ে ওঠে ? তার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, তার সমগ্র

জীবনের রক্তস্বাক্ষর-শপথ, তার মৃত্যু-অভিজ্ঞতাও এনেছে তার মধ্যে আরও বেগে ছুটে চলার দুর্দম এক রানারের 'ডাইনামিসিটি'।

শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির 'মেলে'
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার!

বার বার যে প্রশ্ন মনে জাগে, এমন সমস্তই কি ছিল সেই অসহায় কিশোর সুকান্তর মনে? প্রথম মৃত্যুর প্রত্যক্ষ আঘাত পাওয়া, মাতৃহীন ভাইগুলির শূন্যমনে মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসা, বেলেঘাটার কর্ত্রীহীন বাড়িতে অসহায় নিরাশ্রয় আশ্রয় গ্রহণ—এসবের মধ্যেই তো ছিল এক কিশোরের মনে আগামী দিনগুলির জানা-অজানার বোঝা! দূর থেকে দেখা মৃত্যু! আবার কাছে থেকে তার অস্তিত্ব, ছায়াময় প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা—দু'য়ে কত তফাৎ!

যেনবা বার্গম্যানের সেই নায়ক ও মৃত্যুর দাবাখেলাকে প্রত্যক্ষ করে চলে সুকান্ত তাদের বেলেঘাটার বাড়ির নির্জন রুদ্ধশ্বাস, শোকস্তব্ধ পরিবেশে! এ পরিবেশ অসহনীয়। স্নেহবুভুক্ষু সুকান্ত সাংসারিক জীবনে আরও এক শূন্যতাকে বরণ করে নিল বাধ্য হয়ে। এতগুলি অসহায় ভাই-এর সংসর্গে থেকে সে কি করবে? কি করতে পারে? কোথায় তার জীবন? কোথায় গেল তার একান্নবর্তী পরিবারের আনন্দ-উচ্ছল সেই দিনগুলি রাতগুলি, তার গভীর আত্মীয়তার, অন্তরঙ্গতার প্রাণজড়ানো অনুভবগুলি? কোথায় সুস্থ প্রাণের আর্ত-স্বীকৃতি—'ঘরেতে অভাব, পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া'?

এমন অ-দৃশ্য, অথচ অবধারিত ক্ষয় থেকে, কবি-আত্মার সার্বিক ক্ষুধার অতৃপ্তিজনিত ক্লান্তি থেকে, এমন গ্লানিময় জীবন-পরাজয়ের

ভীরুতার পরিবেশ থেকে, এমন সঙ্গীহীন দুঃসহ ভাব থেকে কবি সুকান্ত যে মুক্তি পেতে চায়! মুক্তি! সেই পরম মুক্তি তো তাকে পেতেই হবে!

কে সুকান্তকে মুক্তি দেবে? কেমন করে? তার মুক্তি কি বাইরের আহ্বানে?

সুকান্ত গভীর বিষাদমগ্ন নির্জন পরিবেশে, তার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিল। এ সিদ্ধান্ত যেন এক শপথ! প্রথম মুক্তি ঘটল অন্তরের জড়তাকে ভেঙে চুরমার করার। 'রানার' কবিতায় তাই যেন ধ্বনিত হয়েছে তার কবিজীবনেরই, একমাত্র ধুয়ার মত, সেই শব্দ ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ের, কবি ভাষায় নিষ্ণাত প্রাণপ্রেতির হৃদ্য রূপ—

দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখন—
নেই, দেরি নেই আর;
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার।

সুকান্তর কবি-আত্মায় যে কবি-রানার বসে থাকে, সে তো থামার মানুষ নয়! সে তো নিস্তেজ, নির্জীব বসে থাকার, সব কিছুর সঙ্গে অবিরাম আপোষ করার মানুষ নয়। সে এমন এক সত্তা যে সঙ্গী চায়। নিঃসঙ্গ থেকেও সঙ্গী সঙ্গে নেওয়ার আপোষহীন এক কবিসত্তা সংগ্রামের গভীর গুরু গুরু দামামা ধ্বনি, শঙ্খধ্বনির অভিনন্দন শুনলো নিজ-আত্মার নির্দেশের মধ্যে।

সমস্ত মহৎ কবির এমনি মানসরীতি!

মায়ের মৃত্যুতে সুকান্তর যে অভিজ্ঞতা, তা তাকে ঠেলে দিল সংসারের আঙিনা পেরিয়ে, দরজার বাইরে, বিশাল বিশ্বের নীল আকাশের নীচে কঠিন রুক্ষ পথে!

না, আর পারিবারিক জীবন নয়। কারণ কবি সুকান্তর ভিতরের আর এক অভিন্ন সুকান্তর বড় করে নির্দেশ—'তোমাকে এই একুশ বছরে, এমন কিশোর থেকেই বালক কবি, তরুণ কবি, যুবক কবি, প্রৌঢ়

কবি, পরিণত কবি হয়েই কবিতা লিখে যেতে হবে। তোমার কবিতা তো কবিতা নয়, খামে আঁটা এক ভারী ওজনের চিঠি—যাতে আছে চিরকালের, সেই পৃথিবীর জন্মের—তার সঙ্গী মানুষের আবির্ভাব-লগ্নের প্রথম কবিতা—মানবতা। রূঢ় কঠিন বাস্তব জীবনকে নিঙড়ে, সরস আখকে পিষে ফেলে মধুর রস নিষ্কাষণের মত বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে তার সম্মিলিত রূপকে আত্মার আধিত্যকায় বা স্বচ্ছ দর্পণে বিম্বিত করে কবিতা তো তোমাকে লিখতে হবে!' বুঝিবা এমনি ছিল বারো-তেরো বছর বয়সের সেই কিশোর কবির বাসনালোকের অলিখিত ছবি।

মুক্তি চাই, মুক্তি! শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা থেকে শ্বাসহীনতায় নিমজ্জিত হওয়া আর নয়, মুক্তির সর্তে জীবনের শ্বাসগ্রহণ!

মায়ের মৃত্যু কবি সুকান্তর জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। একদিকে গৃহ আর একদিকে বাইরের বিপুল জীবন। বাইরের বিপুল জীবনের আকাঙ্ক্ষা গ্যেটের সেই আলোর পিপাসার মত—'লাইট, লাইট, মোর লাইট!' চৈতন্যের সংসার-জীবন ছেড়ে বড় মুক্তির বাসনায় সন্ন্যাস-জীবন বরণের মত! নিজের জীবন তুচ্ছ করেও বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে। সুকান্তর মন এই নিঃসঙ্গ পরিবেশে তৈরী হতে শুরু করেছে মানব শরীরের বিবৃদ্ধির মত, গাছের বীজ থেকে বৃক্ষ হয়ে ওঠার মত, উৎস থেকে সমতল অতিক্রম করে সাগরের দিকে নদীর অমোঘ, উন্মাদ প্রবাহের মত।

'নেচার এ্যাভর‍্স্ ভ্যাকুয়াম।'

প্রাকৃতিক গঠনের মধ্যেকার এমন একটি নিয়মের মতই যেন বা সুকান্তর এই ফাঁকা শূন্য পরিবেশে, মনে, জীবনাচারে আসে বাইরে বেরুবার আর্তি। এক অলৌকিক শক্তি—সেকি তার নিয়তি যে গড়ে আবার ভাঙে, যে হাসায় আবার কাঁদায়, যে লালন করে আবার ধ্বংসও দিয়ে যায়—তাকে জীবনের মাঝখানে আর এক জীবনের আশ্বাসে, আস্বাদে, আকুতিতে, আশ্লেষে, আনন্দে আকর্ষণ করে।

শুরু হল বাড়ির বাইরে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বাড়ি নিয়মিত-অনিয়মিত যাওয়া-আসা। বাইরে এই সূত্র, অনিয়ম, ভিতরে, অন্তরে সূত্রহীন নিয়মে আন্তরিক আকর্ষণ।

পিতা বর্তমান, কিন্তু গৃহকর্ত্রীহীন মাতৃহীন কিশোর। পিতা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এতগুলি অনাথ সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব তখন কিছুটা মাইনে-করা মহিলার ওপর, কিন্তু তা ছাড়াও অগ্রজতুল্য পৈতৃক গ্রন্থব্যবসায়ে যুক্ত কর্মচারী প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ কালীরতন ভট্টাচার্যের ওপর দেখাশোনার আছে নির্দেশ।

সুকঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় ও প্রাচীন সংস্কার দিয়ে শাসিত সংসার-ব্যবস্থায় বিরক্ত, হতাশ, দমবন্ধ সুকান্ত যার কথা ঈষৎ শ্লেষাত্মক দেয়াল-লিখনে স্পষ্ট করেছিল—'কালীরতন চাঁদবদন'—সেই কালীরতন পরিবারের শাসক, রক্ষক, নিয়মনিষ্ঠ পরিদর্শক।

সুকান্ত নিজেকে ছড়াতে শুরু করে। নিজেকে ব্যাপ্ত করার এও এক শিক্ষা। কবি সুকান্তর কবিতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পথ এভাবেই তৈরী হয়। অভিজ্ঞতা আসে অনুভূতিতে। পরবর্তীকালে আমৃত্যু কবিতার জন্ম হয়েছে এইসব অভিজ্ঞতার অনুভূতি-দর্পণে যথাযথ প্রতিফলনে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী, সত্যিকারের সাম্যবাদী চেতনায় কবির শিক্ষার স্কুল তো এমনই!

নতুন জীবন-অবলম্বনে আসে বিস্ময়ের অসীমতা, আসে জিজ্ঞাসার নিত্য নতুন দিক, দেখা দেয় সীমাহীন কৌতূহল চরিতার্থ করার প্রখর, প্রতপ্ত, প্রচণ্ড বাসনা। ঘরের, পারিবারিক জীবনের কিশোর কবি এবার জনতার শ্লেটে বর্ণ পরিচয়ের পাঠ নেবার ভূমিকায় চলে আসে।

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।'

বেলেঘাটার বাড়ি ছিল সীমাবদ্ধ মানস-বিকাশের ভূমি। বয়সে কিশোর, অভিজ্ঞতায় কিশোর, সমস্ত রকম পরিচিতিতেও সুকান্ত তখনো কিশোর। ভিতরে কবি-মনের পিপাসা, বাইরে পিপাসা চরিতার্থ করার দুরন্ত জীবন-রূপ পানীয়।

আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

এ হল সুকান্তর কালের শুধু নয় সর্বকালের অগ্রজ, সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আত্মার উক্তি। এই উক্তি বুঝি কনিষ্ঠ কিশোর কবি-প্রাণেরও। দুর্বার, দুর্মদ আকর্ষণে, নাড়ীর যোগেই বুঝিবা কনিষ্ঠ কিশোর-প্রাণের সচল সঞ্চরণ হল শুরু।

মানুষের কৃত্রিম সমাজ পরিবার থেকে বিশ্ব সংসারের অকৃত্রিম মানব্যদরবারে এসে দাঁড়ানো।

সুকান্ত পিপাসার্ত কবিসত্তায় আকণ্ঠ-জীবন-পানে উৎসুক, উন্মুখ, যেনবা উন্মুখ-হৃদয়।

এমন হৃদয়বান কবি-কিশোর বাইরের আলোয় এসে প্রথমে নির্দিষ্ট কয়েকটি আস্তানা চিনে নিল—কালীঘাটের মামার বাড়ি, শ্যামবাজারের মাসীর বাড়ি, বাগবাজারে জ্যাঠাইমার বাড়ি, বৈমাত্রেয় বড় ভাই মনোমোহন ভট্টাচার্যের বাড়ি, আর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণাচল বসুর বাড়ি।

পাহাড়ের উৎসমুখ থেকে নদী তখন সমতলে নিস্তরঙ্গ জীবনকে ধরার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। এরপর, সাগরের আহ্বান! সে আহ্বানে কার সাধ্য নীরব থাকার ?

সমুদ্রের অজস্র কলধ্বনি—অযুত-কণ্ঠ মানুষের আহ্বান যেন! এই আহ্বানই সুকান্তের জীবনে বড় আহ্বান!

স্বল্প পরিসরের জীবনে এইভাবেই ভাঙা-গড়ার খেলা চলেছিল সুকান্তর জীবনে-মনে। শৈশব, বাল্য, সদ্য-কৈশোর। এই ত্রিস্তরে কবি সুকান্তর জীবন পরিবার থেকে সরে এসেছে বাইরের আত্মীয়দের অন্তরঙ্গ জীবন-স্বভাবে, সেখান থেকে সরে এসে মিশেছে বন্ধুদের,

পরিচিতদের ভিড়ে। তখন শহুর-কলকাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় থর থর কম্পমান! আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের হিমশীতল স্রোতের মধ্যে দ্রুত সব পটপরিবর্তন! চমকিত মানুষ, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ আড়ষ্ট, দুরু দুরু বক্ষ! সুকান্ত আত্মীয়দের থেকে চলে আসে প্রায়ই একাধিক পরিচিতদের মধ্যে। যোগাযোগ হয় নানান মানুষের সঙ্গে। মানুষ! মানুষ! বিচিত্র তার কোলাহল! অমোঘ তার আকর্ষণ! লোভনীয় তার বন্ধন! চিরন্তন তার রূপ-স্বরূপ! রূপে মানুষ, স্বরূপে মানবতা, রূপে প্রয়োজনের অতৃপ্তি, স্বরূপে আধ্যাত্মিক স্থিতি। মানবতা তো আধ্যাত্মিকতার, সমস্ত রকম বিশুদ্ধ অস্তিত্বের একমাত্র সত্য, শাশ্বত রূপ! সুকান্ত তারই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে একদিন চৈতন্যের মত গৃহত্যাগী হয়ে যায়। দু'হাতে তার দ্বি-সপ্ত-কোটির শপথ।

বিস্তীর্ণ সমতলে নদীর স্রোত কলধ্বনি ছড়িয়ে আত্মীয়তা রচনা করে চলে চারপাশের ভূমি, গাছপালা, মাটির ধস, তীর, দিগন্ত—সবার সঙ্গে।

কেন নদীর এই আত্মীয়তা? কি তার লক্ষ্য? কোন্‌দিকে তার এমন ধীর, অমোঘ গতি? এমন নিশ্চিত দৃষ্টিক্ষেপ?

সমুদ্রের দিকে। নদী সমুদ্রের দিকে এগোয়।

সুকান্তের কবিসত্তা হাত বাড়ায় আত্মীয়-স্বজন থেকে পরিচিত-অপরিচিতদের ভিড়ে। সেখান থেকে সাম্যবাদী, বিপ্লবী অগণন মানুষের শরীরের ঘর্ম-কর্ম-মর্মের ঘ্রাণে। কবিতাকে চিরকালীন করতে হবে। কিশোরের ধ্যান যে তা-ই!

সুকান্ত এসে দাঁড়ায় অগণন জনসমুদ্রে।

নদী আসে সাগরে।

কিন্তু সাগরে আসার আগে? নদীর চলে বিপুল, বিশাল সাগরকে গ্রহণ করার অন্তরীক্ষ প্রস্তুতি। দীপ জ্বালাবার আগে দীপশলাকার নির্মাণ ব্যবস্থা।

সুকান্তও কবি হয়ে মানুষের কাছে আসার জন্যে তৈরী হয় ধীরে ধীরে। সে অধ্যায়ে আর ভট্টাচার্য পরিবারের সুনীতিদেবী-নিবারণ-

চন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান মাত্র হয়ে থাকেনি, সে অধ্যায়ে কবি সুকান্তর জীবনের, মনের দ্রুত রূপ ও রঙ বদলানোর শুরু ও শেষ।

এই পরিবর্তনের ইতিহাস অলিখিত, কিন্তু সুকান্তর জীবনযাপনের, আচার-আচরণের দিনলিপিতে তা বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর, গভীর ভীতি-প্রদ, আশাপ্রদ। তা বিপ্লবীর হৃদয়-রক্তে রঙীন, বিপ্লবীর বিপ্লববাসনার রক্তচন্দনে রক্তিম।

পঞ্চম অধ্যায়

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

উনিশ শ ছত্রিশ সাল থেকে উনচল্লিশ সাল!

সুকান্তর বয়স কতই বা। দশ-এগারো থেকে চোদ্দর সীমাভুক্ত! তার পক্ষে বিশ্ব রাজনীতি বা দেশীয় জাতীয় আন্দোলন ও অন্যান্য খবর জানার কথা নয় তখন। বোঝার মত মনও তৈরী হয়নি।

কিন্তু সুকান্ত তখন সেই বেলেঘাটার হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আর্ত, উৎসুক। রুদ্ধশ্বাস এক সদ্য-কিশোর সাময়িক হাহাকারের দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুমুক্ষু।

স্মৃতি সব সময়েই সুদূর, কিন্তু সব সময়েই দুঃখের হয় না। স্মৃতি হয় ধূসর, সব সময়েই হয় না বিষাদের, হাহাকারের, হতাশার বা যন্ত্রণার।

কিন্তু সুকান্তর স্মৃতিচারণ! সে তো যন্ত্রণার, গভীরতম ব্যথা-বেদনার, একাকিত্বের অমোঘ অস্ত্র—নিঃসঙ্গতার! ধূসর বৈচিত্র্যহীন বাড়ির পরিবেশ থেকে সুকান্ত বাইরে পা ফেলতে শুরু করেছে ভিতরের তাগিদেই।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা শেষ। এক বালকের পক্ষে পরীক্ষার চার দেয়ালের মধ্যে ছুটির—ঘরের চারপাশের দরজা-জানলা হাট করে খুলে-দেওয়া হাওয়া যে কি মাতাল করে দিতে পারে, বালকরা বোঝে।

সুকান্ত সব বালকের ব্যতিক্রম।

কোন খেলাধুলায়, উতরোল জনতায় যাওয়া নয়, কোন শরীর চর্চা নয়, কোন বন্ধুত্বের গরিমায় বন্ধুজনের মধ্যে কর্মহীন অবসরের আলস্য-জড়ানো আড্ডাতেও মেতে থাকা নয়।

কেউ তার সঙ্গী নয়—না আড্ডা, না খেলাধুলা, না তার বাড়ীর ভাই-দাদারা। তার সঙ্গী একটি বাঁধানো খাতা। স্বর্ণখনির সেই গোপন উল্লসিত প্রবেশ-মুখ!

একটি নিঃসঙ্গ খাতায় লেখা হয়ে যায় নিঃসঙ্গ সুকান্তর অলৌকিক সব মনের ভাবনা। আর হাঁপিয়ে-ওঠা বেদনাঘন স্মৃতির টুকরোয় চমকে-ওঠা মুহূর্তগুলি সুকান্তকে 'বাহির পানে' মুখ ঘুরিয়ে দেয়।

নিঃসঙ্গ কবিমন লিখল 'রাখাল ছেলে'র মত রূপক গীতিচিত্র, ঠিক সমসময়বর্তী কালের হৃদয়-বেদনার যথাযথ প্রতিচিত্রণ। এক রাখাল ছেলের রূপকে এক চিরকালের কিশোর কবি-রানারের হৃদয়ের নন্দন-বোধন, উদ্বোধন বা উন্মোচনও।

সুকান্ত আর গৃহে নয়, গৃহের বাইরে এক পথিক মানুষ, যার নতুন করে পথ চলা শুরু।

মানুষের সঙ্গে মেশার অনেক সূত্র সন্থ-বাইরে-বেরুনো সুকান্তর জীবনকে সচকিত করে রাখে অজ্ঞাতে।

বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাই স্কুলের সপ্তম মানের ছাত্র তখন সুকান্ত। ক্লাসের বন্ধু অরুণাচল বসু—আর এক সাহিত্য-পাগল। ক্লাশের শিক্ষকের আসনে আসীন আর এক শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-রসিক শিক্ষক নবদ্বীপ দেবনাথ। এদের সূত্রেই স্কুলের হাতেলেখা পত্রিকা 'সপ্তমিকা'। সম্পাদনা ও সংগঠন—যৌথ দায়িত্বে আছে সুকান্ত।

সুকান্তর বাইরের সদ্য-প্রবৃত্ত জীবন-ব্যবস্থায় বন্ধু অরুণাচল বসুর মরমীয় শিল্প-রসিক সান্নিধ্য, তাদের বাড়ির হৃদ্য পরিবেশ, সুকান্তর স্নেহকাঙাল হৃদয়ে অরুণাচলের মা সরলাদেবীর অনাবিল স্নেহবর্ষণ ও সাহিত্য বিষয় নিয়ে গল্প, কথা, খেলা, শিক্ষক নবদ্বীপ দেবনাথের অকৃত্রিম প্রেরণা সুকান্তর কবিমনের প্রসার ঘটাবার পক্ষে হয়েছিল যথোপযুক্ত।

কিশোর কবির বয়সের ধর্মে ভাবালু, রোমান্টিক, আবেগবান হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এই ভাবালুতার মধ্যেই কবি সুকান্তর মনের বিশেষ কোমল কোণটি চিহ্নিত হতে থাকে অতি সংগোপনে। একদিকে স্কুলের পরিবেশ, বন্ধু অরুণাচলের বাড়ির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, আর এক-দিকে বৈমাত্রেয় দাদা মনোমোহনের বাড়িতে বসে নবরূপে শিল্পীমনের লালন পালন।

নিজের বাড়ি নয়, দাদার বাড়ি। দাদা মনোমোহন ভট্টাচার্য সম্পর্কে

সুকান্তর এক অনুজ অশোক ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ—'দাদা স্বয়ং ছিলেন শিল্পী ; আর তাঁর বাড়ীতে ছিল শিল্পী-মনকে লালিত করার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ। সেখানে ঘরে দেওয়ালে টাঙানো থাকতো হাতে আঁকা নানান ছবি, গ্রামোফোন বা রেডিওতে বাজাতো গান, আর সব ছড়িয়ে ছিল দাদার খেয়ালী মনের স্ফূর্তি, যা সুকান্তকে জোগাতো অফুরন্ত আনন্দ।'

দাদা-বৌদির গভীর স্নেহের সাহচর্যে শিল্পী সুকান্তর কবি-আত্মার বিকাশ আরও গতিপ্রাণ, সবল, অমোঘ হয়ে ওঠে। মনোমোহন ছিলেন খেয়ালী। সে খেয়ালীপনা যথার্থ এক চিত্রশিল্পীর খেয়ালীপনা। বাড়ি-পালানো এক সদ্য-কিশোরের কবি-মন বাড়ির বাইরে তার মনের সমধর্মী, সমমর্মী অগ্রজকে দেখে! দাদা-বৌদির ছিমছাম, গুছোনো সংসারে, দুজনের প্রাণমন উচ্ছল জীবনাচারে অপার মুক্তির আস্বাদ পায়।

এই আস্বাদ মনের ফিল্টার কাগজে এক কবির রসদ হয়ে ওঠে। সুকান্ত বিষাদময়তা, স্মৃতির ধূসর দুঃখময় গ্লানি ও ম্লানিমাকে মন ও জীবন থেকে সরিয়ে বড় জীবনকে গ্রহণ করার জন্য তৈরী হতে থাকে।

একসময়ে রেডিওর সংগে যোগ ঘটে সুকান্তর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি, সুকান্তর লেখা একটি গানের প্রখ্যাত গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিকের কণ্ঠে প্রচার—এসব ঘটনা সুকান্তকে নিয়ে আসে সবাকার মধ্যে, জনগণের আসরে। প্রভাতের দীপ্ত সূর্য, গোধূলির রক্তরাঙা আকাশ, রাত্রির অমা-অন্ধকার, এই বিশাল বিশ্বের সদা-প্রবাহিত বাতাস—সর্বত্র সুকান্ত সকলের অজ্ঞাতে প্রচারিত হল, প্রকাশিত হল, নন্দিত হল। বুঝিবা সেই অ-দৃশ্য ইথারের মত কিশোর কবির সদ্য-জাগ্রত আত্মা কম্পমান।

রবীন্দ্র-প্রীতি সুকান্তকে দিয়েছিল আর এক গভীর শিক্ষা। শিশুকালে রাণীদির 'কথা ও কাহিনী'র আবৃত্তিতে যার শুরু, সুকান্তর স্বরচিত কবিতায় রবীন্দ্র-মৃত্যুর পরে বেতারে তার প্রচারে তার বিস্তার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উনিশ শ একচল্লিশ সালে। সে সময়ে সুকান্ত বেতারে যে 'প্রথম বার্ষিক' নামে কবিতাটি পাঠ করে, তাতে রবীন্দ্র প্রভাব

ওতপ্রোত হলেও কবিতার বিষয়ে আবেগ-অন্তরঙ্গতায় ছিল সুকান্তর আজীবন লালিত অহং, ছিল প্রত্যয়—

তোমার সন্ধ্যার ছায়াখানি
কোনপথ হতে মোরে
কোন পথে নিয়ে যাবে টানি'
অমর্ত্যের আলোক সন্ধানী
আমি নাহি জানি।

এমন রোমান্টিক সংশয়ের মধ্যেও সময়-সচেতন, ইতিহাস-প্রাণিত সেই কিশোর-কবি সুকান্ত সিদ্ধান্তে আসে—

এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়,
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীর তলে মানুষের সমাধি রচনা,
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে—
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়॥

এসব কথা উনিশ শ একচল্লিশে রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরে সুকান্তর চিন্তা-ভাবনার কথা। তখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স সুকান্তর।

কিন্তু তারও আগে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যথার্থ অর্থে শুরু হওয়ারও আগে সুকান্ত সেই বাঁধানো খাতায় নিজের খেয়ালে কবিতা লিখে চলে দিনে রাতে। কম লেখে সুকান্ত, কিন্তু যা লেখে তাতে ভাবালুতা থাক, আবেগ থাক, অবুঝ মনের নিজের বিষাদময় জীবনের প্রতিচ্ছবি থাক, তবু সে সব তার নিজস্ব বোধের ও বুদ্ধির অধিগত আন্তরিক অকৃত্রিম আর্ত স্বীকৃতি। না, বলা ভাল, স্বীকারোক্তি।

অহংমুখ কবি সুকান্ত ছোটবেলা থেকেই, নিজে অন্যায় করে না, 'অন্যায় যে সহে' তাকেও সহ্য করতে পারে না। বাড়ির পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, উৎকেন্দ্রিক ছন্নছাড়া জীবনাচারে অভ্যস্ত সুকান্ত শুধু বাঁধানো খাতায় কবিতা লেখার বিলাসের জীবন চায়নি, চাইতে পারে না।

যার শৈশব কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতায়—প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জারক রসের কাজ করেছে রূঢ় কঠিন জীবনের বাস্তবতায়, তার বিলাস-বাসনা তো অন্তরের অভিলষিত সম্পদ-কামনা হতে পারে না! মানুষের মনের ও জীবনের বিকাশের যাঁরা গবেষক, তাঁরা তা বলেন না!

এত অল্প বয়সে বাড়ির বাইরে আসার পর তার এক অবলম্বন তো প্রয়োজন। কি সেই অবলম্বন? নিজের জীবন নিজেরই গড়ে তোলার ভাগ্যলিপি যে তার! হাতের জটিল রেখার ভাষায় বুঝি তারই নির্দেশ, উন্নত ললাটের ভাঁজে ভাঁজে বুঝি তারই লিখন!

সুকান্তর পরিচিতির মধ্যে যে কজন বন্ধু কাছে আসে, তার মধ্যে প্রতিবেশী সমবয়সী রবীন ঘোষকেও ধরতে হয়। রবীন ঘোষ নানান গঠনমূলক কাজে জড়িত। সুকান্তও জড়িয়ে গেল সে সব কাজে।

নোংরা মাঠ পরিষ্কার করে সুকান্তর অতি প্রিয়তম খেলা ব্যাডমিণ্টনের জন্য খেলার মাঠ তৈরী করতে হবে?

উদ্যোগী সুকান্ত প্রতিবেশী-বন্ধু রবীনের পাশে।

ছেলেদের লেখাপড়ায় অসুবিধে? পয়সার অভাবে বুঝি অনেকেই পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। চলে এসো, সকলে মিলে বিনা পয়সার কোচিং ক্লাস করি। হৈ-হট্টগোলের তুমুল পরিবেশে সুকান্ত শিক্ষকতা শুরু করল বন্ধুদের সহযোগিতায়! পাড়ায় লাইব্রেরী না হলে বিদ্যার, চিন্তার স্ফূর্তি ঘটবে কি ভাবে? জ্ঞানের পিপাসার চরিতার্থতা কোথায়, যদি গ্রন্থাগার না থাকে?

এখনকার বেলেঘাটায় 'ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী' নামে যেটি বর্ত্তমান, সেটি সুকান্তর এমন গঠনমূলক প্রথম চিন্তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। বই সংগ্রহ হয়েছিল সে সময়ে এবাড়ি-ওবাড়ি ভিক্ষা করেই। কিন্তু এই যে সংগঠনের উদ্যোগ, সাহস, উৎসাহ, কর্মক্ষমতা, শ্রম, আন্তরিক সহযোগিতা—সবকিছুই আসে সুকান্তর মধ্যকার আর এক অস্থির উজ্জ্বল সুকান্তর থেকে।

উৎকেন্দ্রিক জীবনে, বাইরের জীবনে এক সদ্য-কৈশোরে পা-দেওয়া সুকান্তর এইসব ছিল আর এক বড় আশ্রয়। আগামী দিনের বড়

সংগঠক, বড় কর্মী, বড় সাম্যবাদী-সমাজবাদী বিশ্বাসের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এই সময়ে, এইরকম সব ছোটখাটো প্রয়াসের মধ্যেই।

না, কোন পিছুটান ছিল না সুকান্তর। অন্তত এই সব কাজের সময়। একদিকে এইসব সংগঠনের কাজে মেতে ওঠা, আর এক দিকে গভীরে গোপনে সেই বাঁধানো খাতায় কবিতা লিখে যাওয়া। মনের মধ্যে রহস্যময় অন্ধকারে যেসব সোনা, মণি-মুক্তা জ্বলে, ঝিকমিক করে ওঠে, সেগুলিকে সযত্নে সাজিয়ে রাখা। একদিকে কর্মী, আর একদিকে কবি, একদিকে কায়িক শ্রম, আর একদিকে কায়িক শ্রমশূন্যতায় মানস-ভ্রমণ, একদিকে প্রত্যক্ষ জনতার উল্লাস আর একদিকে এক কিশোরের কবি-আত্মার উল্লাস!

কোন সংশয়-পীড়িত আবেগ নয়, কোন সংসার জীবনে অভিজ্ঞ মানুষের তাড়িত কঠিন পদক্ষেপ নয়, এক অর্বাচীন ভাগাবেগ-লালিত কিশোর মনের সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত দ্বিমুখী বহিঃপ্রকাশ—কর্মী সুকান্ত, কবি সুকান্ত।

অল্প বয়সের উত্তেজনা, অনভিজ্ঞ মনের উদ্যোগ-আয়োজন—সব ক্ষণকাল-স্থায়ী। সুকান্তর সমস্ত বাইরের কর্মতৎপরতা একটা সংগঠনের জন্ম দিয়েই শেষ। আর একদিকে তার নতুন করে হাত-বাড়ানো। কিন্তু এমন সব কর্মতৎপরতাতেই কবি সুকান্তর ভবিষ্যতের বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ কবি হয়ে-ওঠার রসদ। কে তা অস্বীকার করবে?

উনিশ'শ আটত্রিশ সালের সেই বড়দার মৃত্যুর বিষাদঘন স্মৃতি ক্রমশ দূরে সরে যায়। তার পরে সুকান্তর বহির্জীবনের ব্যস্ততা বাড়ে। সব কাজের মধ্যে প্রিয় কাজ হল হাতে-লেখা পত্রিকা 'সপ্তমিকা'র প্রকাশনা যথাযথ, সময়ানুগ করা। সুকান্ত তার সম্পাদনায় থেকে অন্যের লেখায় কলম চালায়। এভাবেই কবি সুকান্তর অভিজ্ঞতা তৈরী হয়ে যায় সংগোপনে। এও এক অভিনব শিক্ষা।

সুকান্তর ছিল অসাধারণ সূক্ষ্ম রসবোধ। নিজে যেমন নির্মল হাসতে পারত, হাসাতেও পারত অবলীলায়। দাদা-বৌদির বাড়িতে বৌদিকে কৌতুক করার কথাগুলি সুকান্তর ওই বয়সের অসাধারণ নির্মল

কৌতুকরসবোধের স্বাক্ষর দেয়। 'সপ্তমিকা' পত্রিকার পাতায়—যে পত্রিকা ছিল শুধুই হাতে-লেখা, যার সম্পাদকস্বয়ং সুকান্ত—তাতে কবির লেখা একটি হাসির কবিতা সুকান্তর ছন্দজ্ঞানের যেমন বলিষ্ঠ পরিচয় দেয়, তেমনি বিষয়ের মধ্যে সুনিপুণ হাস্যরস পরিবেশন-দক্ষতারও প্রমাণ দেয়। বাড়ির বিষাদময় পরিবেশে ক্লান্ত সুকান্ত কবিতায় তার অক্লান্ত সরস মনটিকে ঠিক বাঁচিয়ে রাখে।

বদ্যিনাথের সর্দি হল কলকাতাতে গিয়ে,
আচ্ছা করে জোলাপ নিল নস্যি নাকে দিয়ে।
ডাক্তার এসে, বল্ল কেশে, 'বড়ই কঠিন ব্যামো,'
এ সব কি সুচিকিৎসা ?-আরে আরে রামঃ।
আমার হাতে পড়লে পরে, 'এক্‌সরে' করে দেখি,
রোগটা কেমন, কঠিন কিনা—আসল কিংবা মেকি।
থার্মোমিটার মুখে রেখে সাবধানেতে থাকুক,
আইসব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটা দিন তো রাখুক।

সে সময়েই ছন্দের অন্তমিলে, চরণের মধ্যকার অনুপ্রাসে, সমধ্বনি-সমন্বিত শব্দগুচ্ছের যথাযথ প্রয়োগে যে তার কবিতার কান কত নিখুঁত, স্পর্শকাতর ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, এইসব চরণ তা প্রমাণ করে। পল্লীগ্রামের সরল বদ্যিনাথের অকপট বিস্ময়ের লিপিচিত্রে সুকান্ত বিস্ময়করভাবে একজন দক্ষ চিত্রকর, নিপুণ চরিত্র-নির্মাতা। প্রমাণ, কবিতাটির উপসংহারের চরণগুলি—

'ইনজেক্‌শান নিতে হবে' অক্সিজেনটা পরে,
তারপরেতে দেখা এ রোগ থাকে কেমন করে।'
পল্লীগ্রামের বদ্যিনাথ অবাক হল ভারী,
সর্দি হলেই এমনতর ? ধন্য ডাক্তারী॥

'সুচিকিৎসা' নামের এই কবিতাটিতে সে সময়ের ডাক্তারী ব্যবস্থার প্রতি কোন শ্লেষের দিক আছে কিনা সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়েই বলি, সুকান্তর সেই অল্পবয়সের এমন একটি নিটোল কৌতুক-রসের কবিতার কঠিন কাঠামো, ছন্দের চমৎকৃতি কিশোর কবি-মনের বিশেষ গঠনটিকে বিশ্বস্ত করে দেয়।

এমন কবিতা লেখার মানসিকতা যখন সুকান্তর, তখন তার বাড়িতে ছন্নছাড়া অবস্থা, বাংলা তথা সারা ভারতে জাতীয় আন্দোলনের দুর্বার জোয়ার, প্রথম একমাত্র সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার অনুপ্রেরণায় ভারত তথা বাংলাদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিস্তারের ঘটনা ঘটে চলেছে। সুকান্ত এসব বিষয়ে তখন একেবারেই অজ্ঞ।

কিন্তু ভারত যে পরাধীন। সুকান্ত অন্তত এটুকু জানে, সে এক পরাধীন শোষিত দেশের নাগরিক। দেশের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা, অসহায়তা, অভাব-অভিযোগ সবই শাসককুলের সৃষ্ট। ঠিক প্রত্যক্ষ রূপে নয়, পরোক্ষ স্বভাবে সুকান্তর মধ্যে এই মনোভঙ্গি সক্রিয় ছিল বলেই সেই তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের কবি গভীর আবেগে, উত্তেজনায় জন্ম দিয়ে দেয় 'ভবিষ্যতে'-এর মত কবিতা।

সুকান্তর এক ভাই ভূপেন্দ্রনাথ তখন 'নাগরিক' নামে হাতেলেখা পত্রিকা প্রকাশ করে। সুকান্তর প্রায় সমবয়সী এই ভাই। সময়টা উনিশ শ চল্লিশ সালের কোন এক কালসীমা। সুকান্তর কবিতা চাই। ভূপেন্দ্রনাথের এই অনুরোধে সুকান্ত কবিতা দেয়। একাধিক কবিতা প্রকাশ করে বন্ধুর মত ভাই ভূপেন্দ্রনাথ। সেইসব কবিতার মধ্যেই একটি 'ভবিষ্যতে' নামের কবিতা।

স্বাধীন হবে ভারতবর্ষ থাকবে না বন্ধন,
আমরা সবাই স্বরাজ যজ্ঞে হবরে ইন্ধন।
বুকের রক্ত দিব ঢালি স্বাধীনতারে
রক্তপণে দিব ডালি ভারতমাতারে

*   *   *

আমরা সবাই ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর
আমরা হব মুক্তিদাতা আমরা হব বীর।

এ এক বিস্ময়। এক তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের কিশোরের কলমে স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আবেগপ্রবণ ভাবনার কবিতা রচনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে ইয়োরোপে। সে এক ভয়াবহ ঘটনা, ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সমগ্র বিশ্ববাসীর পক্ষে।

ভারতে তার তরঙ্গ তখনো প্রত্যক্ষভাবে আসেনি। সুকান্ত তেমনি বিশ্বরাজনৈতিক পরিবেশে অবোধ কিশোরের মত কবিতা লিখে চলেছে। অথচ সে জানে না, এই যুদ্ধই অদূর ভবিষ্যতে তার কবি-প্রতিভাকে তাড়িত করবে, উজ্জীবিত করবে পরম পরিণতির দিকে। সুকান্তর বাইরের জীবনের অভিজ্ঞতা এখনো সীমাবদ্ধ—আত্মীয়স্বজন, কাছের কিছু বন্ধু, রেডিওয় কবিতা-পাঠ, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে কিছু সংগঠন-মূলক, সমাজ-সেবামূলক কাজ করার মধ্যেই তার সীমা, তার কর্মতৎপরতা, তার চিন্তা-চেতনার পরিণতি।

অথচ এসবই তার প্রতিভার পক্ষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার আগাম প্রস্তুতি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু ও শেষ—এর মধ্যবর্তীকালেই সুকান্তর কবি-আত্মার আর এক নবজন্ম, বিকাশ, পরিণতি।

ভয়াল দিনগুলি তার সামনে বিশালকায় এক আদিম মানুষের অমার্জিত নখের থাবা বাড়িয়ে আছে। 'এবার যে ওই এলো সর্বনেশে গো।' যুদ্ধ, বন্যা, ঝড়, মন্বন্তর, দাঙ্গা—এইসব চিরকালের প্রতিকূল, অমানবিক, নৃশংস ঘটনাবলী দিয়ে কবি সুকান্তকে গ্রাস করতে উন্মুখ আসন্ন আগামী দিন।

সে অধ্যায় যেন আলো-আঁধারে রহস্যময় এক কঠিন, রুদ্ধশ্বাস নাট্যাভিনয়ের রঙ্গপীঠ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংগে সংগে তার অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের আলো পড়ে। যুদ্ধের ঝন্‌ঝনার শব্দে রঙ্গমঞ্চে নেপথ্যলোক ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সে নাটকের দর্শক আমরা সকলেই—উৎসুক, উন্মুখ।

দর্শকের আসনে সুকান্ত—ব্যস্ত, শ্রমতৎপর, কখনো, বা বিভ্রান্ত এক কর্মী, সংগঠক। কণ্ঠে তার সাম্যের গান। বাঁ হাতের শক্ত কব্জিতে ধরা রক্ত পতাকা, ডান হাতের মুঠোয় ধরা লেখনীমুখে আছে লেলিহান আগুন—যার অপর নাম নিরন্তর আপোষহীন প্রতিবাদ।

কবির প্রতিবাদ! ত্রিকালদর্শী কবির সরব ছন্দোময় ভবিষ্যৎ বাণী। দর্শকের আসন থেকে কবি সুকান্তর বিশাল মঞ্চে ত্বরিত পদক্ষেপে

প্রবেশ! এ সুকান্ত কর্মী, সংগঠক, মানবপ্রেমিক, জনতার জননেতা, সাম্যবাদী, সমাজসেবী!

এ সুকান্ত এক নব বাস্তবতার, নব মানবতাবাদ ঘোষণার উচ্চকণ্ঠ কবি!

'হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে।
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বার বার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে এসেছে অন্ধকার।

সুকান্তর শিশু ও বালকজীবনের পারিবারিক পরিবেশ ভয়াবহ মৃত্যু দিয়ে ঘেরা। মৃত্যুদর্শনের অভিজ্ঞতায় ক্লান্ত জীবন ক্রমশ সচেতন এক কবিমনে আনে—মৃত্যুকে ভয় নয়, মৃত্যুকে আঘাত করার, অস্বীকার করার, তাচ্ছিল্য করার এবং মৃত্যু-আনয়নকারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল-ভাবে রুখে দাঁড়াবার মত বাসনা। সামনে আগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা মনে রেখেই এই কবিতার পরবর্তী চরণগুলিতে কিশোর কবি ক্রমশ এনেছে আগুন জ্বালাবার আহ্বান।

এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি,
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি,
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

আগুন এখন সারা বিশ্বে, আগুন ইউরোপ থেকে এশিয়ার দিকে লেলিহান শিখায় দ্রুতগামী। আগুন সে সময়ের অবিভক্ত আন্দোলনে, আগুন সে সময়ের সদ্য-গড়া কম্যুনিস্ট পার্টিতেও। আগুন সুকান্তর লেখনীতেও।

চারপাশের অগ্নিময় বিস্ফোরক পরিবেশের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিশোর কবি সুকান্ত!—স্থিতধী, অথচ ক্রুদ্ধ, ব্যস্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত, মৃত্যুর চিত্রে স্তম্ভিত তবু সর্বকালের আশাবাদী মানবিক!

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বিপর্যস্ত কলকাতা বিমুগ্ধ কবি

বাস্তব জীবনের বাঙালী কবি সুকান্ত এক এবং অদ্বিতীয়।

সুকান্ত জীবনপ্রেমিক এক বাউল, মানবপ্রেমের একতারায় নতুন বিপ্লবের নবতম সুর-স্রষ্টা।

যে বাউল বাইরের ডাকে বেরিয়ে পড়ে, সে ফেরার পিছন পথে নিজেই কঠিন দেয়াল রচনা করে নেয়। বহির্বিশ্বে ক্রমাগত সঞ্চিত বোঝা আর বন্ধন গ্রহণ করে, তাকে সুরে গানে আপন করে সেসব ত্যাগ করতে করতেই তার নিরাসক্ত অগ্রগমন!

সে ত্যাগে, সে সুরে গানে থাকে মানুষের কথা, জীবনের বাণী, বস্তু-নিষ্ঠ পরিবেশের স্বচ্ছ দর্পণের রহস্যময় মায়া, অত্যদ্ভুত আকর্ষণ।

পরিবার জীবন থেকে সরে এসে সুকান্ত যখন বাইরের জগতে তার অতি প্রিয় পরিচিত শহর কলকাতায় আত্মরক্ষার, অস্তিত্বের পুনরুজ্জীবনে, সুস্থ সবল সর্বরকমের মালিন্যমুক্ত শ্বাস গ্রহণে উন্মুখ, তখন বহির্বিশ্বের কি রূপ?

তেরো-চোদ্দ বছরের এক রোমান্টিক, আবেগপ্রাণ কবি-কিশোরের পক্ষে তেমন পরিবেশ-সচেতন হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, তবু এমন এক রুদ্ধশ্বাস সর্ব-বিনাশী পরিবেশ রচিত হতে চলেছিল, যা পরবর্তীকালে সুকান্তর দ্রুত ও ত্বরিত জীবন-পরিক্রমায় সত্য, উজ্জ্বল, অনুভূতিপ্রাণ রোমান্টিক-বিদ্রোহী-আত্মার কবির পক্ষে অনতিক্রম্য।

যুদ্ধ, বন্যা, মন্বন্তর, কংগ্রেসের আন্দোলন, সাম্যবাদী, নতুন চিন্তার উদ্ভব, গণবিক্ষোভের তীব্রতার মধ্যে নানান 'ক্রস্ কারেন্ট', তীব্র সংকট, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। সময়-পরিধি উনিশ শ উনচল্লিশ থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ।—এক কিশোর কবির তেরো থেকে একুশ বছর বয়সের কাল—ধূসর দিগন্তে মিলিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।

বুঝিবা সভ্য-সবুজ-হওয়া থেকে সবুজেই চিরবিনাশের কাল।

উনিশ শ উনচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর। শান্ত ঊষা-লগ্ন। ধীর, স্থির নিস্তব্ধ জাগতিক পরিবেশ, প্রকৃতি। ভীরু অথচ স্বস্তির নিঃশ্বাসে শান্ত পৃথিবীর মানুষ।

অতর্কিতে হিটলারী সেনাবাহিনীর পোল্যাণ্ড সীমা অতিক্রমণ এবং স্বাধীন পোল রাজ্য আক্রমণ।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই উনিশ শ চোদ্দ সালের তেসরা আগস্ট জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়াম আক্রমণের মধ্য দিয়ে। আর শেষ হয় উনিশ শ আঠারোর এগারোই নভেম্বর হতমান ম্লান জার্মানীর নিরঙ্কুশ পরাজয় ও যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে।

কিন্তু একি! পঁচিশ বছর একমাস পরে আবার যুদ্ধ! আবার সেই সর্ববিনাশী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ডাক!

'এবার যে ওই এলো সর্বনেশে গো।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পয়লা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ উনচল্লিশ সাল এবং প্রথম বলি এই পোল্যাণ্ড। কোন রকম 'চরমপত্র' দেওয়া, অথবা আগে থেকে সাবধান করার কোন নৈতিক দায়িত্ব ছিল না নাৎসী ফ্যাসীবাদের নায়ক হিটলারের। তাই অমারাত্রির অন্ধকারে জন্ম-নেওয়া ঘৃণ্য ফ্যাসীবাদে সারা বিশ্ব হতবাক, স্তম্ভিত, বিমূঢ়, মানুষ হয়ে জন্মানোর লজ্জায় নতমুখ, ভিতরে ধিক্কার।

বেলা দ্বিপ্রহর। এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ আসে ওয়ারশ থেকে লণ্ডন হয়ে কলকাতায়। কিন্তু তা সংবাদই। সুদূর প্রাচ্যের এই জনবহুল কলকাতার জনগণের মুখাবয়বে তার অতিদূর-প্রসারী ব্যাপকতাকে বোঝার আভাস-ইঙ্গিত ছিল না। কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ও প্রয়াসও ছিল না। না, থাকার কথাও নয়!

মানুষে মানুষে বিশ্বাসই তো সর্বকালের সমস্ত মানুষের কাম্য।

অতি দ্রুত পট-পরিবর্তন। নাটকীয় ঘটনার অভিনব সংস্থান বিশ্বরাজনীতির রণাঙ্গনে।

উনিশ শ উনচল্লিশ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর। জার্মানীর বিরুদ্ধে

একাধিক রাষ্ট্র ফ্রান্সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরাধীন ভারতের শাসক রাজশক্তির আদিভূমি বৃটেনেরও যুদ্ধ ঘোষণা। ভারতের জনমতের প্রতি প্রবল উপেক্ষা দিয়েই এমন সদম্ভ সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদে যুদ্ধ ঘোষণার দিনই মাদ্রাজে হাজার হাজার যুদ্ধ-বিরোধী মানুষের কণ্ঠ সোচ্চার। বিক্ষোভ, মিছিল। 'বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে'।

এবং প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসুরিক শক্তিতে দাপিয়ে বেড়ায়, অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরে, আদিমতম ভয়ংকর কোন শ্বাপদের মত মুখব্যাদান করে শুরুর স্থানের চারপাশের একাধিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে। চলচ্চিত্রের কাহিনীর মত যুদ্ধের পর্দায় একভাবে ঘটে চলে ঘটনার পর ঘটনা—পয়লা থেকে নয়ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই জার্মান সৈন্যদের কবলে চলে আসে স্বাধীন পশ্চিম পোল্যাণ্ড, সতেরোই সেপ্টেম্বর ঘটে 'জার্মানদের ব্রেস্ট-লিটোভস্ক প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈন্যদের পূর্ব পোল্যাণ্ড আক্রমণ', আঠারোই সেপ্টেম্বর ওয়ার্'শর আত্মসমর্পণ, রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পোল্যাণ্ডের পার্টিশন হল এই ওয়ার্‌শ। চোদ্দই অক্টোবর স্কাপাফ্লোতে বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ রয়েল ওক্ নিমজ্জিত, তিরিশে নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে, তেরোই ডিসেম্বর জার্মান পকেট দক্ষিণ আমেরিকার ব্যাটলশিপ্ গ্রাফস্পীর রোমাঞ্চকর নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়, আর সতেরোই 'ডিসেম্বর সেই জাহাজের মণ্টে ভিডো বন্দরে আত্মনিমজ্জিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফের আত্মহননের ঘটনাও ঘটে। এইভাবে উনিশ শ উনচল্লিশ সালের শেষ চারটি মাস প্রতীচ্যের ভূমিতে চলে যুদ্ধের দুর্মদ অগ্রগমন।

এদিকে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরকম?

দোসরা অক্টোবর, উনিশ শ উনচল্লিশে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে চল্লিশটি কারখানার নব্বই হাজার শ্রমিকের প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। এর সংগে মিলিত হয় বিখ্যাত টাটা কোম্পানির কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট, একটি জাতীয় সরকার গঠনের ও তার হাতে সরকারী ক্ষমতা অর্পণের কঠিন দাবী, ফ্যাসিজ্‌ম্ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিবাদী সোচ্চার-কণ্ঠ।

এর ফল—ভারতের স্বাধীনতা-কামী জনমতের বিরুদ্ধে নির্মম দমন ও পীড়ন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা জাগ্রত করার অপপ্রয়াস এবং ভারতীয় ধনিক শ্রেণীকে সুযোগ-সুবিধা দানের প্রলোভনে আত্মপক্ষে নিয়ে আসার হীন তৎপরতা।

এক জটিল দাবা খেলা! যেনবা ভরপুর কড়া মদের নেশায় রক্তচক্ষু দুই বিবদমান গোষ্ঠী!

পাশাপাশি আসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র নিন্দুক ও বিরোধী। এর ফল দাঁড়ায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণায়, নেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করায়।

শোষিতকে নিয়ে চিরকালের শোষকদের সেই রহস্যময় চতুর দাবা খেলা!

দ্রুত পট-পরিবর্তন। উনিশ শ চল্লিশ সালে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের পতন, ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যের পলায়ন, জাতীয়তাবাদী ভারত ফ্রান্সের আকস্মিক পতনে যেমন মর্মাহত, তেমনি ফ্যাসীবাদের ব্যাপক প্রসারে উৎকণ্ঠিত, সংশয়াচ্ছন্ন, অন্তর্মনে চিন্তাকুল।

সারা পৃথিবী তখন তুমুল উত্তেজনায় তোলপাড়।

এরই সমান্তরাল ভারতে তখন আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রঙ বদলের পর্ব। গান্ধীজির সংগে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ, গান্ধীজির উনিশ শ চল্লিশ সালে একক সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ, প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের গ্রেপ্তার বরণ। এরপর থেকে বহির্ভারত ও ভারতের মধ্যে একের পর এক পরিবর্তিত ঘটনার মিছিল।

উনিশ শ একচল্লিশ সালের জুন মাসে হিটলারী জার্মানী কর্তৃক আচম্বিতে সে সময়ের একমাত্র সফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ, উনিশ শ বিয়াল্লিশে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ও মহাযুদ্ধের চরম পর্যায়ের দিকে গতিমুখরতা, ভারতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ, জাপানীদের হাতে আটই মার্চ রেঙ্গুনের পতন, উনিশ শ বিয়াল্লিশের সাতই ও আটই আগস্টে গান্ধীজির 'কুইট

ইণ্ডিয়া' শ্লোগানে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা সৃষ্টি, হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার, আটক, নিহত হওয়ার ঘটনা।

ক্রমশ উনিশ শ বিয়াল্লিশের ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বড় কেন্দ্র, এক স্থায়ী যুদ্ধ-পরিকল্পনার উপনিবেশ। ব্রিটেনের সংগে জাতীয়তাবাদী ভারতের যে বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহিতার সম্পর্ক তুঙ্গে ওঠে উনিশ শ বিয়াল্লিশের আগস্ট মাসের মধ্যবর্তীকালে, তার চরম পর্যায় শুরু হয় পরবর্তীকালের কয়েকটি ভয়াবহ ঘটনায়।

মন্বন্তর, মুনাফাখোর-সৃষ্টি, দাঙ্গা, সাম্যবাদী মানুষের ওপর অসহনীয় নিপীড়ন।

যুদ্ধের খরচের ভার অসহনীয়ভাবে পড়ে ভারতের সাধারণ মানুষের ওপর। গড়ে ওঠে ভারত সরকারের ভারতীয় কিছু সুবিধাবাদী মানুষ ও সমরবিভাগের কর্মকর্তাদের লোলুপ বাসনার আর্তিতে ধনিক, মজুতদার ও মুনাফাখোর গোষ্ঠী-নির্ভর উপনিবেশ। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, মুদ্রাস্ফীতিতে দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ, সাধারণ মানুষের তীব্র জীবন সংকট, জীবনধারণে অব্যবস্থা, চতুর্দিক ঘিরে সমাধানহীন বিপর্যস্ততা।

এর মধ্যে আসে কলকাতার মানুষের প্রত্যক্ষ যুদ্ধভীতি। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জাপানী বোমারু অভিযানের আশংকায় মন্বন্তরে রুদ্ধশ্বাস মানুষ হয়ে ওঠে ভীত সন্ত্রস্ত। সরকার পূর্বদিক থেকে শত্রুর আগমন আশংকায় 'পোড়া মাটির নীতি' অনুসরণে পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রধান জীবিকার নির্ভর হাজার হাজার নৌকা ধ্বংস করে। মন্বন্তরের দ্রুত বিস্তার ও অসহায়, অন্নহীন জীবন যাপনের ফলে মন্বন্তরের কালো হাত প্রসারিত হয়। সরকারী ঔদাসীন্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বিয়াল্লিশ সালের শরৎকালে মেদিনীপুরে ভয়াবহ সাইক্লোন ও বন্যায় বিপুল পরিমাণ শস্যহানির পরোক্ষ ফলও তেতাল্লিশের প্রথম মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করে।

'মাগো, একটু ফ্যান দাও।'

অতি সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষুধার্ত উদরের এইটুকুই ছিল

তাদের কথা, দাবী, বুঝিবা অপদার্থ যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির কাছে অনুগত প্রজার শ্লেষাত্মক প্রার্থনা।

দুর্ভিক্ষের শুরু প্রথম বোম্বাইয়ে, উনিশ শ তেতাল্লিশে, ক্রমবিস্তার ঘটে বাংলাদেশ থেকে মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম পর্যন্ত।

এমন যুদ্ধ, এমন মহামারী, এমন মন্বন্তর এবং এমন ঘৃণ্য ক্লীবতার প্রতীক বা ভেকধারী বৃটিশ রাজশক্তির ভিতর থেকে জন্ম নেয় তিনটি শব্দ, তিনটি অস্তিত্ব, তিনটি জীব। অন্ধকারের জীব তারা, নিশাচর, নরলোলুপ, নীতিভ্রষ্ট, মানবতাধ্বংসী স্থলচর, জলচর, খেচর বা সর্বভুক!

এক, মুনাফাখোর, দুই, মজুতদার, তিন, কালোবাজারি!

দেখা দিল ব্যাপক ও প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি, তথাকথিত ভদ্রমহলে এমন 'ভিটামিন কোটিং'-দেওয়া সুযোগ-সন্ধানী পাপাচার, বিদেশী সৈন্য ও অফিসারদের মনোরঞ্জন এবং অবসর-যাপনের নামে 'সরকারী' ও 'বেসরকারী' পৃষ্ঠপোষকতায় গণিকাবৃত্তির স্থায়ী স্রোত—সবরকমের দালাল সম্প্রদায়েব জন্ম। উনিশ শতকের বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্বের দেশীয় 'বাবু' সমাজের ও তার মোসাহেবদের কথাই মনে পড়ে যায়। তবে তা ছিল সীমাবদ্ধ রাজবংশ ও 'বাবু' বংশে, আর এ হল ব্যাপকভাবে জন জীবনে, মানবতা বিধ্বংসী জীবনচর্যায়! দুরারোগ্য ক্যান্সারের মত আশ্রয় নেয় রক্তের এক রহস্যময় সজীব কণিকায়!

এসবের পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমতুল্য দেখা দেয় সাম্যবাদী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমপ্রসার। তখন সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া বিশাল বিশ্বে দ্বিতীয় কোন সাম্যবাদী দুনিয়া ছিল না। ছিল না তার দীপ্ত, জ্বলন্ত, গর্বিত, মহত্তম প্রাণস্পর্শী, পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত শক্তিমান নব-চেতনার প্রতি-স্পর্ধা প্রকাশ করার মত কোন রাষ্ট্র, সমাজ।

একদিকে ফ্যাসিবাদ, আর একদিকে সাম্যবাদ।

একদিকে ইতালির মুসোলিনী, জার্মানীর হিটলার, আর একদিকে রাশিয়ার স্ট্যালিন, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো!

সম্পূর্ণ অসুস্থ, বর্বর, বন্য ফ্যাসিজম্ চিরকালের সম্পূর্ণ সুস্থ বিশুদ্ধ, জীবন্ত কমিউনিজমের চিরশত্রু।

ভারতের কমিউনিস্টরা ছিল সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক ও অনুসারী, তাই ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তারা ছিল প্রথম থেকেই সোচ্চার। কিন্তু উনিশ শ উনচল্লিশ সালের তেইশে আগস্ট দশবছরের জন্য যে আকস্মিক এক অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় স্টালিনী রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারী জার্মানীর, তাতে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত বিহ্বল। এই অবস্থা বজায় থাকে উনিশ শ একচল্লিশ সালের বাইশে জুনের পূর্ব পর্যন্ত।

ফ্যাসিবাদী হিটলার আক্রমণ করে রাশিয়া। আবার বিশ্বের রাজনীতি-সচেতন মানুষ আর এক হতবাক বিস্ময়ের সম্মুখীন। ন যযৌ ন তস্থৌ! এ এক ত্রিশঙ্কু।

উনিশ শ উনচল্লিশের গ্রীষ্মকাল থেকে উনিশ শ একচল্লিশের গ্রীষ্মকাল। এই সময়-পরিধিতে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের কমিউনিস্টদের মত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভ্রান্ত, বুদ্ধিহত। এ সময়ে ভারতীয় কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং রাশিয়া ও চীনের স্বপক্ষে থেকে দেশীয় স্বাধীনতার সর্ত-সাপেক্ষে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজী হওয়ার পরেও কংগ্রেসের নেতারা হলেন কারারুদ্ধ। এর ফলে সারা দেশে প্রচণ্ড উত্তাল বিক্ষোভ, অবর্ণনীয় ক্রোধের জ্বলন্ত হুংকার।

এই পটভূমিকায় হিটলারী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় রাশিয়ার একমাত্র যুদ্ধপ্রয়াস—এই নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় কমিউনিস্টরা বৃটিশকে যুদ্ধে সাহায্য দনের জন্য প্রস্তুত হয়, নীতিগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল দীর্ঘ আট বছর ধরে নিষিদ্ধ। সেই নিষেধ উনিশ শ বিয়াল্লিশের বাইশে জুলাই প্রত্যাহৃত! আবার এক জটিলতম ক্রস-কারেন্ট!

এক অভাবনীয় দৃশ্য সারাদেশের 'ক্রশ-কারেন্ট' রাজনীতির আবর্তে!

একদিকে কারান্তরালে অত্যাচারিত জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের অবস্থান ও কারাগারের বাইরে সারা দেশে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ

—যার ঐতিহাসিক অভিধা 'আগস্ট বিপ্লব', আর একদিকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মুক্তি ও যুদ্ধে সাহায্য দানের বাসনা প্রকাশ।

ক্রোধের আগুন বৃটিশদের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতম কমিউনিস্ট-বিরোধিতা—বিক্ষোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা-জাতীয় কুৎসায়—রূপ নেয় দ্রুত।

রাশিয়ায় 'সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য যুদ্ধ' মূর্ত হয় 'জনযুদ্ধে'। ভারতের কমিউনিস্টদের ঘোষণাও ছিল তাই।

তথাকথিত দেশদ্রোহিতার গ্লানি, নিন্দা, 'বৃটিশ সরকারের সঙ্গে অশুভ মিতালি' এবং 'যোশী-ম্যাক্সওয়েল চুক্তি' ইত্যাদি চক্রান্তের অভিযোগ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি'র বিরুদ্ধে প্রচারিত হলেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সংগঠন ক্রমশ দ্রুত মজবুত ও বিশাল হয়ে ওঠে। সে এক নতুন জন্ম-নেওয়া সমুদ্রের বিস্তার! রাজশক্তির অত্যাচারের খড়্গ তাকে নির্মমভাবে সহ্য করতে হয়। তবু তারাই নাৎসী-বিরোধী জনমত গঠন করে। এই জনমত শুধু সভা, শোভাযাত্রা, মিছিলে তৈরী হয়নি, জনমত শক্ত ভিত্তি পায় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গঠন, কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে।

এসব ঘটনা যুদ্ধ ও তার অনুবর্তী ঘটনা, তার অনুসারী অবশ্যম্ভাবী উপ-জাত অবস্থা।

এসবের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় অবিরাম বোমাবর্ষণ এবং পরবর্তী সময়ের স্রোতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসে নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠনের সংবাদ, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের কলকাতায় নভেম্বরে ইংরেজ-বিরোধী গণ অভ্যুত্থান, উনিশ শ ছেচল্লিশ-এর ভিয়েৎমান-মুক্তি-দিবসের ছাত্র অভিযান, উনত্রিশে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটের পর বিজয়োৎসব, রসিদ আলি দিবসের রক্তিম সংগ্রামী পরিবেশ।

দেখা দেয় সর্বমানবতা-বিধ্বংসী হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা উনিশ শ ছেচল্লিশ সালের ষোলই আগস্ট। এ এক কলঙ্কিত ঐতিহাসিক অধ্যায়। এক অধোমুখ মানুষের অশ্রুসজল স্বীকৃতি।

যেনবা আয়নায় এক দগ্ধ, বিকৃত, বীভৎস মানুষের মুখের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব !

এমন একটি জটিল এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ ও তারও পরবর্তী দু'বছরের সারা ভারতবর্ষে তথা সারা বাংলাদেশে ! এই সারা বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতাতেও।

এমনি এক কলকাতায়, এমন এক যুদ্ধ-সমকালীন জটিল পরিবেশে কবি সুকান্তর বয়স তেরো চোদ্দ থেকে একুশ বছরের চিরকালীন অথচ চির-উজ্জ্বল প্রান্তরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিশোর সুকান্ত তখন মনের দিক থেকে বাড়ি-ছাড়া, বাইরের জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে কতকাংশে। এই মানসিক অবস্থায় কলকাতার বিচিত্র রূপ তাকে করে আঘাত, আঘাতের মধ্যে প্রবল আকর্ষণও। কিশোরের বিস্ময়, ভয়, মুগ্ধতা, কৌতূহল, সদ্যস্ফুট সংগ্রামী চেতনা পল্লবিত হয় এই কালেই, এমন কোলাহলময় 'কল্লোলিনী' কলকাতায়, এই জীবনচলোর্মিমুখর, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, মানুষের রক্ত ও হৃদয়ে রক্তিম উত্থিত উদ্ধত কলকাতায় !

সুকান্তর মৌলিক ভাব-ভাবনার কবিতাগুলি এই পর্বেই লেখা। তার তর-তাজা মনের আয়না হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন রচিত কবিতা ও শেষ হওয়ার পরের দু'বছরের রচিত কবিতাবলী।

কিন্তু এই কিশোর কিভাবে নিয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত ও ক্লান্ত কলকাতাকে ? তার ব্যক্তিক জীবনে কি এর প্রতিক্রিয়া ?

সুকান্তর এক অলৌকিক বিশ্বচৈতন্যের বিকাশ এই যুদ্ধ-ব্যস্ত কলকাতার প্রেক্ষিতে !

উনিশ শ উনচল্লিশে সংশয়ী সুকান্তর লেখা একটি চিঠির অংশ : 'আমার চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসগুলো আমাকে দগ্ধ করতে ছুটে আসে আর তার সে রোমাঞ্চকর বিশ্বাস আমাকে লুব্ধ করে। আশার চিতায় আমার মৃত্যুর দিন সন্নিকট। তাই চাই আজ আমার নির্বাসন।

তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, তোমাদের ভুলতে চাই। দীন হয়ে বাঁচতে চাই। তাই সুখের দিনগুলোকে ভুলে তোমাদের কাছে শেখা মরণমন্ত্রকে ভুলে, ধ্বংসের প্রতীক স্বপ্নকে ভুলে মৃত্যুমুখী আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু পারব না, তা আমি পারব না ;—আমার ধ্বংস অনিবার্য।'

একদিকে বাঁচার প্রবলতম ব্যসনা—তাকে পবিত্র আকুতি বলাই ভাল, আর একদিকে হতাশা মেশানো সংশয়াকুল স্বগতোক্তির মত জিজ্ঞাসা, এমন যৌথ স্বীকৃতি তেরো চোদ্দ বছর বয়সের আবেগপ্রাণ কবিমনে স্পষ্ট।

একাধিক পত্রাংশে এসবের স্পষ্ট স্বীকৃতি :

'...বড় ভাল লেগেছিল পৃথিবীর স্নেহ, আমার ছোট্ট পৃথিবীর করুণা। বাঁচতে ইচ্ছা করে, কিন্তু নিশ্চিত জানি কলকাতার মৃত্যুর সঙ্গেই আমিও নিশ্চিহ্ন হব। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'

বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা চিঠিতে উনিশ শ একচল্লিশ সালের নভেম্বরে কিশোর কবির যে মানসিকতা, তা তার সমকাল সচেতনার চমৎকার স্বাক্ষর।

'...ম্লানায়মান কলকাতার...স্পন্দনধ্বনি শুধু বারম্বার আগমনী ঘোষণা করছে আর আসন্ন শোকের ভয়ে ভীত ব্যথিত জননীর মতো সাইরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—নগরীর বুঝি অকল্যাণ হবে। আর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে কলকাতা, তবে নাটকটি হবে বিয়োগান্তক। এই হল কলকাতার বর্তমান অবস্থা। ...আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে পৃথিবী কলকাতার দিকে চেয়ে, কখন কলকাতার অদূরে জাপানী বিমান দেখে আর্তনাদ করে উঠবে সাইরেন—সম্মুখে মৃত্যুকে দেখে, ধ্বংসকে দেখে। প্রতিটি-মুহূর্ত এগিয়ে চলেছে এক বিপুল সম্ভাবনার দিকে। এক একটি দিন যেন মহাকালের এক একটি পদক্ষেপ, আমার দিনগুলি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে বাসরঘরে নববধূর মতো, এক নতুন পরিচয়ের সামীপ্যে ১৯৪২ সাল কলকাতার নতুন সজ্জা গ্রহণের এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। বাস্তবিক ভাবতে অবাক

লাগে, আজন্ম পরিচিত কলকাতা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে অপরিচয়ের গর্ভে, ধ্বংসের সমুদ্রে, তুমিও কি তা বিশ্বাস কর অরুণ ?'

এক কিশোর কবির অন্তর-লালিত মনটির সঙ্গে আসন্ন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ-থমথমে, ভীত কলকাতার এমনি পরিচয়ের এক দলিল।

উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের কলকাতার অভিজ্ঞতা সুকান্তর জীবনে আরও গভীর-প্রোথিত।

বন্ধু অরুণাচল বসুকেই উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখছে : '···দৈবক্রমে এখনো বেঁচে আছি, তাই এতদিনকার নৈঃশব্দ্য ঘুচিয়ে একটা চিঠি পাঠাচ্ছি···বেঁচে থাকাটা সাধারণ দৃষ্টিতে অনৈসর্গিক নয়, তবুও তা দৈবক্রমে কেন, সে রহস্য ভেদ করে কৃতিত্ব দেখাবো তার উপায় নেই, যেহেতু সংবাদপত্র বহুপূর্বেই সে কাজটি সেরে রেখেছে। থাক্, এ সম্বন্ধে আর নতুন করে বিলাপ করবো না, যেহেতু গতবছর এমনি সময়কার একখানা চিঠিতে আমার ভীরুতাই যথেষ্ট ছিল।···

'—এখন ভীরুতা নয়, দৃঢ়তা। তখন ভয়ের কুশলী বর্ণনা দিয়েছি ; কারণ সে সময়ে বিপদের আশংকা ছিল, কিন্তু বিপদ ছিল না। তাই বর্ণনার বিলাস আর ভাষার আড়ম্বর প্রধান অংশগ্রহণ করেছিল, এখন তো বর্তমান বিপদ। কাল রাত্রিতেও আক্রমণ হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে, আর এটা একরকম ভরসারই কথা। গুজবের আধিপত্যও আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। ···তাই আক্রমণের একটা ছোটখাটো আভাস দিচ্ছি। প্রথমদিন খিদিরপুরে, দ্বিতীয় দিনও খিদিরপুরে, তৃতীয়দিন হাতিবাগান ইত্যাদি বহু অঞ্চলে—(এইদিনকার আক্রমণ সবচেয়ে ক্ষতি করে), চতুর্থদিন ডালহৌসী অঞ্চলে—(এইদিন তিনঘণ্টা আক্রমণ চলে আর নাগরিকদের সবচেয়ে ভীতি উৎপাদন করে, পরদিন কলকাতা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়) আর পঞ্চম দিন অর্থাৎ গতকালও আক্রমণ হয়। কালকের আক্রান্ত স্থান আমার এখনো অজ্ঞাত।

···(রাত্রি) ৯-১০ মিনিট এমনি সময়ে সেদিনকার সবচেয়ে বড়

ঘটনা ঘটলো,···রেডিও চলছিল, বন্ধ করতেই সাইরেনের মর্মভেদী আর্তনাদ কানে গেল।······এমন সময় রঙ্গমঞ্চে জাপানী বিমানের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু স্তব্ধ। আর শুরু হয়ে গেল···আমার অবিরাম কাঁপুনি। ক্রমাগত মন্থর মুহূর্তগুলো বিহ্বল মুহ্যমানতায় নৈরাশ্যে বিঁধে বিঁধে যেতে থাকল, আর অবিশ্রান্ত এরোপ্লেনের ভয়াবহ গুঞ্জন, মেসিনগানের গুলি আর সামনে পেছনে বোমা ফাটার শব্দ। সমস্ত কলকাতা একযোগে কান পেতেছিল সভয় প্রতীক্ষায়, সকলেই নিজের নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্দিগ্ধ। দ্রুতবেগে বোমারু এগিয়ে আসে, অত্যন্ত কাছে বোমা পড়ে আর দেহে মনে চমকে উঠি, এমনি করে প্রাণপণে প্রাণকে সামলে তিনঘন্টা কাটাই। তখন মনে হচ্ছিল, এই বিপদময়তার যেন আর শেষ দেখা যাবে না। অথচ বিমান আক্রমণে তেমন কিছু হয়নি, যার জন্য এতটা ভয় পাওয়া উচিত। কালকের আক্রমণে অবশ্য অত্যন্ত সুস্থ ছিলাম।'

এই এক কিশোর কবি-মনের রোমান্টিক অভীপ্সায় প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র। 'বিহ্বল মুহ্যমানতায় নৈরাশ্য বিঁধে বিঁধে যেতে' থাকা এক কবির মন, 'নিজের প্রাণ সম্পর্কে ভীষণ রকম সন্ধিগ্ধ' এক কবির মন, 'দেহে মনে চমকে'-ওঠা একটি কবি-আত্মা, 'এখন ভীরুতা নয়, দৃঢ়তায় দৃপ্ত' কবিপুরুষ—যে কবিপুরুষ বয়সে নবীন, আজন্ম ও আমৃত্যু নবীনই থেকে গেছে—তার কাছ থেকে কি ধরণের কাব্য-অভিজ্ঞতার পরিচয় আশা করবে পাঠক? কি রকম হবে তার কাব্যের অভিব্যক্তি? কোন্ ধরণের কবিপ্রাণতায় সে কিশোর কবিমন হবে উন্মুখ, উন্মুখর?

সে কবি এক রানার। তার অভিজ্ঞতা গতিশীল কবি-আত্মায় নিত্যশুদ্ধ!

সারা কলকাতা সহরে তখন 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।' এই অবস্থায় সুকান্তর মানস-প্রতিক্রিয়া সংশয়, শঙ্কা, অনিশ্চয়তা, মৃত্যুভীতি আবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার দুরন্ত বাসনায় জটিল।

কলকাতা থেকে যুদ্ধের আসন্ন ভয়াল রূপের কথা ভেবে সহরবাসী

তখন স্বভাবতই গ্রামমুখীন, পলায়ন-তৎপর। এমন সব দলে সুকান্তর পরিবারের কিছু লোকও ছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচার তাগিদে এই যে পলায়ন, এই পলায়ন নানান অসুবিধার মধ্যে পড়ে—অর্থ নষ্ট, অকারণ সব দুর্ভোগ, জীবনধারণ ও জীবন যাপনের ক্লান্তিতে জড়িয়ে গিয়ে পুনঃ প্রত্যাবর্তনে রূপ নেয়।

যায়নি কেবল সুকান্ত। চিঠিতে তারই স্বীকৃতি :

'আজ আমার ভাইয়েরা চলে গেল মুর্শিদাবাদ। আমারও যাবার কথা ছিল কিন্তু আমি গেলুম না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবার এক দুঃসাহসিক আগ্রহাতিশয্যে এক ভীতি সংকুল রোমাঞ্চকর পরমমুহূর্তের সন্ধানে……।'

এই হল কবির মানসিকতা। ব্যক্তি সুকান্ত শারীরিক অর্থে দুর্বল, বোমার ভয়ে কাঁপে। কিন্তু কবি সুকান্ত! দুঃসাহসী, নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত, মৃত্যুর আগমনের মধ্যে 'রোমাঞ্চকর পরমমুহূর্তের সন্ধানে' প্রতীক্ষারত।

আরও বিস্ময়কর, এমন কিশোর কবির একই বিষয়ে দুই বিচিত্র ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা ও তার অনুভবগম্য সিদ্ধান্ত। এই বিষয়টি হল 'মৃত্যু' ভাবনা। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে কবি মৃত্যুর ভয়াবহ পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি। মায়ের মৃত্যু, দাদার মৃত্যু, রাণীদিরও অবোধ, অবুঝ সুকান্তর সামনে থেকে হঠাৎ চলে যাওয়া—এমন সব ঘটনা সুকান্তকে করে তোলে হতাশ, নির্জন, নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ, সমস্ত দরজা জানালা-বন্ধ-করা, দমবন্ধ-করা এক ঘরের বাসিন্দা। যুদ্ধ-সমকালীন যে মৃত্যুভাবনা তা কবির মৃত্যুভাবনা। এক মৃত্যু-স্বভাব থেকে আর এক বড় দর্শনায়নে দীপ্ত মৃত্যুচেতনায় কাবমানসের সাবলীল উত্তরণ। সুকান্তর ব্যক্তিজীবন, সুকান্তর কবিমন। এ দুয়ে আপাত বিরোধ, কিন্তু অদ্ভুত সূক্ষ্ম নিবিড় যোগ!

যুদ্ধ-সমকালীন কলকাতায় দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে কবি সুকান্তর গতিবিধি ছিল বিচিত্র, বাধাহীন, আত্মসমীক্ষায় দীপ্ত।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-ব্যবস্থায় এসেছে ব্ল্যাক মার্কেট, কন্ট্রোল, পারমিট। উনিশ শ একচল্লিশ থেকে উনিশ শ তেতাল্লিশের

শেষ পর্যন্ত, এমন কি চুয়াল্লিশ সালের মধ্যকাল পর্যন্ত কলকাতার রূপ রুদ্ধশ্বাস। রাস্তায় রাস্তায় উদ্বাস্তুর অভিধায় নয়, গ্রাম থেকে আসা সর্বহারা গ্রামবাসীর মিছিল, দ্বারে দ্বারে করুণ প্রার্থনা—'মাগো একটু ফ্যান দাও'। রাস্তার ফুটপাত আবর্জনাপূর্ণ, এ. আর. পি মিলিটারির তৎপরতার ছবি, বড় বড় বাড়ির সামনে পাঁচ ছ' ফুট উঁচু ব্যাফ্‌ল্ ওয়াল, পার্ক খেলার মাঠ-ময়দান খুঁড়ে রাখা স্লিট ট্রেঞ্চ কোন আদিম বিশালকার জন্তু জানোয়ারের প্রতীক-প্রতিম বিশ্বাস, রহস্য তুলে ধরে। এ হল দিনের আলোয় কলকাতার রূপ।

আর রাত? ব্ল্যাক আউট—সর্বত্র ব্ল্যাক আউটের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। চোখে ঠুলি দেওয়া গ্যাসপোষ্টের আলোয় সে অমা আরও প্রেতরূপ নেয়! মাঝে মাঝে সাইরেন, গণিকাবৃত্তির নিশ্চুপ নিঃসাড় সচলতা, কালোবাজারের কালো লোলুপ, ধূর্ত হাতের সারা সহর ঢেকে রহস্যময় সঞ্চালন, সম্প্রসারণ।

দিন আর রাত। রাত আর দিন।

আহ্নিক গতির এমন অমোঘ নিয়মে কলকাতার চিত্র বাইরে যথাযথ, ভিতরে সবরকম নৈতিক বোধ ও বোধিতে ভূমিকম্পের কম্পন।

এমন রুদ্ধশ্বাস, ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর পরিবেশে কবি সুকান্ত কোথায়? কি এমন তার বলিষ্ঠ বিলাস, বিশ্বাসও—যা সব বড় কবিরই ঘরানা?

ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখছেন, 'সন্ধের পর শহরে লোকজন অল্পই চলাফেরা করত। কিন্তু সুকান্ত তার স্বাভাবিক নিয়মেই এই অন্ধকারের মধ্যে সারা সহর চৌকি দিয়ে ফিরত।...সুকান্ত কিন্তু এই বোমাবর্ষণের আশংকার মধ্যেও সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াত তার নিজের কাজে আবার কখনো বা নিছক আড্ডা দেবার প্রেরণায়।...মনে হত যেন কলকাতার এই ভীতিময় অবস্থাটাকেই উপভোগ করত।'

ছোটখাটো চেহারার কবি-কিশোর, গায়ের রঙ শ্যামলা। সলজ্জ মুখ। শ্রবণ শক্তি কিছুটা দুর্বল। স্বল্পভাষী। কিন্তু এতসবের মধ্যেও এই কিশোরের ছিল বুদ্ধি দীপ্ত মুখ-চোখ, সার্বিক ব্যক্তিত্ব, ছিল

যে কোন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বিশিষ্টতা, উন্নত ভঙ্গি। বয়স কতই বা, চোদ্দ বছরের এক রোমান্টিক কিশোর তখন। রানারের মতো দুর্বার দুর্জয় মনোবল নিয়ে কলকাতাকে করতে চাইছে অস্থি, মাংস, মজ্জা, রক্ত প্রাণ, মন, আত্মা, করতে চাইছে মা, প্রিয়া, বধূ, ভাই-বোন, গ্রহণ করতে চাইছে নতুন মানবতাকে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করার উপযোগী মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে।

কলকাতা যুদ্ধ-সমকালীন কালটিতে কবি সুকান্তর প্রতিষ্ঠা-করা বুঝিবা এক মন্দির। সুকান্তর সমস্ত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিঠি, ছড়া, গানের মধ্যে থেকে সেই মন্দিরের চেহারা চোখে পড়ে, চোখে পড়ে মন্দিরের ঊর্ধ্বমুখী চূড়াও।

কলকাতা-মন্দিরে দেবতাটি হল ভূলুণ্ঠিত, অবমানিত মানব্য বা মানবতা। তার পূজারি হল কবি সুকান্ত স্বয়ং এবং সে পূজার পরমতম, সর্বজীবের দেহে ছিটানো শান্তিজল হল শহর ও গ্রামবাংলার অগণন মৃত ও জীবিত, শোষিত ও উপেক্ষিত মানুষ, মানুষের আত্মা, মানুষের কলকণ্ঠে উতরোল মিছিল।

সেদিনের অন্ধকার কলকাতায় এক কিশোর আশ্চর্য বিশ্বচৈতন্যে বিকশিত হয়ে, নিজের অবিনাশী তারুণ্য, যৌবন নিয়ে সারা সহর পরিক্রমা করছে একা, নিঃসঙ্গ, কোন এক ছন্নছাড়া বাউলের মত।

ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে শরীরে। মুগ্ধ হতে হয় অবলীলায়।

কবিদের দস্তুরিই বুঝি এই?

কবি জীবনানন্দ দাস ছিলেন এমনি নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর গভীর রাতে কলকাতার পথ-পরিক্রমা 'সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী' হ'য়ে আছে কবিতায়। সেই নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ছিল মানসভ্রমণের বকলমে এক প্রত্যক্ষ, জনগণ-বিচ্ছিন্ন কবিসত্তার বিকাশে সহায়ক।

আর কবি সুকান্তর এমন ভ্রমণ?

প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে মানব্যের সংমিশ্রণ। তারই রসদে এক বস্তুতান্ত্রিক কবির অজস্র মিছিলের মধ্যে থেকেও শ্লোগানের

সমকণ্ঠে নয়, সর্বকালিক কবিকণ্ঠের স্বাতন্ত্র্যে নবমানবতার মাঙ্গলিক রচনা সম্ভব হয়েছে কবিতায়।

সুকান্ত এক প্রতিবাদ—সমকালের কাব্যধারায় তীব্রতম প্রতিবাদ।

সুকান্ত এক জীবনবেদ—সমকালের অনুবর্তী কাব্যধারাগুলির মধ্যে নতুন মন্ত্রের নতুন বেদের ভাষ্যকার।

সুকান্তর প্রত্যেকটি কবিতার জন্ম এমন ভাষ্য হয়েই!

প্রত্যেকটি কবিতার পিছনে আছে বস্তুজগত, মনের জগত আর কবির-আত্মার অধিষ্ঠানে ধ্যানতন্ময়রূপে স্থিত বেদনার জগত—যা স্বভাবী সর্বকালের পাঠককুলকে দেয় জীবনমন্ত্রোচ্চারণের অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য, গতি, বিশ্বাস, নির্ভয়, দীপ্ত ও দৃপ্ত পায়ে চলার প্রতিশ্রুতি।

কবি সুকান্ত রানার। কর্মী, সংগঠক সুকান্ত রানার। সাম্যবাদী সুকান্ত রানার! অকাল বিয়োগে আত্মগোপনকারী সুকান্ত এক রানার!

রানার চলেছে, রানার!

মানুষের মিছিলের মধ্যেও সে রানার। নিঃসঙ্গে পথের যাত্রী হিসেবেও সে রানার। নিঃসঙ্গ হাঁটার সময় সুকান্ত মাঝে মাঝে নিজের হাতের আঙ্গুল সামনে শক্ত সোজা করে আপন মনে কাউকে যেন শাসন করত। একথা বলেছেন সুকান্তর ভাই অশোক ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি সুকান্ত' গ্রন্থে। কার বিরুদ্ধে এমন শাসানি? সুস্থ রক্তবীজের মত প্রবল জনস্রোতের বিরুদ্ধ শক্তিকে?

হয়ত তা-ই! নিঃসঙ্গতার পরিবেশেই সুকান্ত নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলে!

কলকাতার অন্ধকার পরিবেশে নিঃসঙ্গ কবির এমন আঙুল শক্ত করা শাসন হয়ত আত্ম-শাসনও!

'কবি ব'লে নির্জনতা প্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরনের কবি? আমি যে জনগণের কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার চলবে কি করে?'

এমন অকপট স্বীকৃতির স্বচ্ছ আয়নায় কবি সুকান্তর আপাত

পরিণত জীবনের ও মনের কবিতাগুলি রচনার প্রেক্ষিত স্পষ্ট হয় চলচ্চিত্রের মত।

উনিশ শ উনচল্লিশ-চল্লিশ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্বকাল্ পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলি কিশোর কবির তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, পরিণত চিন্তা-চেতনায় ঋদ্ধ।

সবুজ পাতা আর বিদ্ধ যন্ত্রণার কাঁটায় গজিয়ে থাকা যেন বা বিশাল এক রক্ত গোলাপের ঝাড়!

সপ্তম অধ্যায়

সে কিশোর সে কবিও

না, তখনো ভারতবর্ষের মাটিতে প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল, তাণ্ডব, পৈশাচিক নৃত্য শুরু হয়নি।

উনিশ শ উনচল্লিশ সালের কথা।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়। না, 'যুদ্ধ' নয়, বরং 'নরমেধ যজ্ঞ' বলাই শ্রেয়—তার আরম্ভ উনিশ শ উনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বরের উষালগ্নে।

প্রচণ্ড ফ্যাসিবাদী হিটলার আর তার আজ্ঞাবহ অন্যান্য রাষ্ট্র ও সৈন্যবাহিনী—এদের সমবেত আক্রমণের জোয়ার দ্রুতগতিতে গড়িয়ে আসে উনিশ শ চল্লিশ সালের শেষ পর্যন্ত। যেন দুরন্ত পৃথিবীধ্বংসকারী এক কালবৈশাখী, পৃথিবীর বুকে প্রচণ্ড শক্তির এক উল্কাপাত!

না, তখনো ভারতে তার প্রত্যক্ষ রূপ, আঘাত-অভিঘাত স্পর্শ করেনি।

সুকান্ত এ সময়ে তেরো-চোদ্দ বছরের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে।

সে কিশোর, সে আবার কবিও।

কবি? কিশোর বয়সেই পূর্ণ, বলিষ্ঠ জীবন মন প্রত্যয়ের কবি?

অনেকটা স্বভাব-কবির মতই আবেগপ্রাণ, ভাবালু, উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

কিন্তু এই কিশোর জন্ম-রোমান্টিক, ভয়ংকর কল্পনাপ্রবণ! এই রোমান্টিক বংশের কবিদলের রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত থাকার কারণেই জন্মমাত্রই কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধার কৃষ্ণ-সঙ্গ পাওয়ার মত সুকান্ত যেনবা জন্ম থেকেই পেয়েছিল বিশ্বনাগরিকত্ব। তার জীবন-যাত্রার দ্রুত স্তর-বদলের তথ্য, ইতিহাস, ঘটনা যেনবা তারই সায় দেয়, সাক্ষ্য দেয়ও!

এক মধ্যবিত্ত পরিবারে থেকেও সে কবি!

পরিবার থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেও সে কবি!

বাইরের অজস্র মানুষের সঙ্গ পেতে পেতে সেই কবি হয়ে যায় বিশ্ব-নাগরিক। কবির বিশ্বনাগরিকত্ব। এ তো এক পরম আশীর্বাদ। কিন্তু কিশোর বয়সের এক বাঙালী কবি-যশ-প্রার্থীর পক্ষে এ এক ঘটনা, এক বিস্ময়।

পারিবারিক জীবন-পরিবেশে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ছিল অন্তরঙ্গ অনুভূতি, গোপন বিশ্বাস, বোধ ও বোধি দিয়ে মোড়া। মহাযুদ্ধের মৃত্যুভয়? তা তো কবির সামনে প্রত্যক্ষ হয়নি তখনো? তা হলে এক কিশোর কবির চোখে তার স্বরূপ কি?

স্বরূপ কেবলমাত্র কবি-কল্পনার কষ্টিপাথরেই স্থিত, নির্দিষ্ট।

যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব কবির কল্পনাপ্রবণ মনে এক অদ্ভুত ধীরগতি ছায়াপাত ঘটায়! কবি সুকান্ত হয় সংশয়-আক্রান্ত, হয় চিরকালের মানবতা সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দ্বিধাগ্রস্ত। হয়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে সমস্ত রকম অমানবিক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সত্তা ও শক্তিতে প্রাণিত।

কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, পরোক্ষ, দূরবর্তী যুদ্ধ ঘটনাগুলির পটভূমিকায় কবিমনে ঘটে উত্তুঙ্গ রোমান্টিক কল্পনার আচম্বিত জাগরণ।

সমকাল, সমকালের পৃথিবী, তার 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর জালে আবদ্ধ রাজার প্রাণের মত শক্তিময় অস্তিত্ব আকর্ষণ করে কবি সুকান্তকে। এ এক অদ্ভুত আকর্ষণ।

এ আকর্ষণ লৌহখণ্ডের প্রতি শক্তিমান চুম্বকের। এ আকর্ষণ পৃথিবীর প্রতি সূর্যের! এ আকর্ষণ পৃথিবীর সবুজ, বাতাস, নীল, সচ্ছল জীবনের প্রতি প্রত্যেকটি সৌরপরমাণুর!

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-মানচিত্রে তখন একদিকে পূর্বপ্রাচ্য চীন, অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের ছোট ছোট কয়েকটি দেশ। উনিশ শ উনচল্লিশ-চল্লিশ সালের যুদ্ধের ঘর্ঘর রথচক্র প্রচণ্ড দাপটের সংগে চলেছে দ্বিমুখী স্রোতে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন চরম যুদ্ধ। সে যুদ্ধে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের শোচনীয়, দুঃখজনক পতনের খবর শোনে সারা বিশ্ব। মানবিক চেতনা-

সম্পন্ন মানুষ ক্ষুব্ধ, স্তম্ভিত। ফ্যাসীবাদী হিটলারের নাৎসী বাহিনীর হাতে অকথ্য নির্যাতনের কথায় পৃথিবীর প্রত্তিটি ভূখণ্ডের খবরের কাগজ মুখর। দশই জুনে ইতালীর সিদ্ধান্ত—সরকারীভাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনীর আত্যন্তকাল সামরিকবাদের প্রচার ও অদ্বিতীয় ইতালী রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নকে সফল করতে জার্মান নাৎসী দলনায়ক হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সংবাদ আসে। পশ্চিম রণাঙ্গণের যুদ্ধে ফ্রান্সের পতন ও আত্মসমর্পণ যুদ্ধের ভয়াবহ গতি স্তম্ভিত করে। অগণন মানুষের মৃত্যু, কর্তৃপক্ষের অন্যায় শোষণ বিনা বাধায় চলে।

চলে এদিকেও—পূর্ব রণাঙ্গণের অন্যতম কেন্দ্র চীনে। তখন জাপানীরা চীনাদের ওপর বর্বর অত্যাচারে পৈশাচিক উল্লাসমত্ত। পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গণের এই ভয়াবহ যুদ্ধের ফল—নির্বিচারে সংখ্যাহীন অসহনীয় মৃত্যু, মানুষের কণ্ঠরোধ, মানব্যের কবর।

উনিশ শ চল্লিশ সালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষের পক্ষে মিত্রশক্তি বৃটিশ শাসকের অন্যতম বিশ্বযুদ্ধনেতা উইন্‌স্টন চার্চিল বক্তৃতা দেন লণ্ডনের হাউস অব কমন্সে 'আমরা লড়াই চালিয়ে যাব উপকূলে, পাহাড়ে পর্বতে। আমরা কদাপি আত্মসমর্পণ করব না।' এই বিখ্যাত বক্তৃতার অংশটি ওই বছরেই চৌঠা জুন সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীও শোনে বি বি সি-র প্রচারে! এই বীরত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার সেই প্রচারক চার্চিল স্বয়ং নন, তখন যুদ্ধব্যস্ত পরিবেশে তা বি বি সি-র পক্ষে রেকর্ড করা আদৌ সম্ভব ছিলনা। প্রচার করেন চার্চিলের অন্যতম ভক্ত, বি বি সি-র বিখ্যাত অভিনেতা নরম্যান শেলি চার্চিলের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করেই—যিনি আজও এই ছিয়াত্তর বছর বয়সে জীবিত, যাঁর বক্তৃতা তাঁর প্রিয় নেতার ভাবমূর্তি স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল, যাঁর বক্তৃতা চার্চিলও নাকি পরে অনুমোদন করে বলেন, 'চমৎকার! আমার দাঁতগুলোও যেন শেলির মুখে বসানো রয়েছে'—চার্চিলের একথা বলার অর্থ—চার্চিল বক্তৃতা করার সময় দাঁত ঘষার মত বিশেষ শব্দ করতেন। ভারত-উপনিবেশে চার্চিলের এমন একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতার তাৎপর্য

তখন সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে। আত্মসমর্পণ না করার বীরত্বের শপথে কিন্তু ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর তখন নাভিশ্বাস। কিন্তু মিত্রশক্তির দাসত্ব যে সে চায়নি কোনদিন।

যুদ্ধের নানান খবর কলকাতায় আসে সংবাদপত্রের শিরোনামায়, বেতারে, প্রকাশিত নানান আলোকচিত্রে। কলকাতার পথে পথে মিছিল, প্রতিবাদে, আন্দোলনে ধর্মঘটে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ঘৃণা দেখা দেয়। কবি সুকান্তর কবিমনে এইসবে জাগে তীব্র প্রতিক্রিয়া। 'পূর্বাভাস', 'নিবৃত্তির পূর্বে', 'পরাভব'—এরকম কয়েকটি কবিতা সেই সর্বমানবতাবিধ্বংসী খবরের সূত্রেই রোমান্টিক যন্ত্রণা থেকে জাত।

উনিশ শ চল্লিশ সালের আগস্ট মাসের উনিশ তারিখ।

কবি সুকান্তর লেখনীতে ব্যক্ত হল যুদ্ধগত প্রতিক্রিয়ার রোমান্টিক বিহ্বল আর্তি—

সন্ধ্যার আকাশ তলে পীড়িত নিঃশ্বাসে
বিশীর্ণ পাণ্ডুর চাঁদ ম্লান হয়ে আসে।
বুভুক্ষু প্রেতেরা হাসে শাণিত বিদ্রূপে,
প্রাণ চাই শতাব্দীর বিলুপ্ত রক্তের—
সুষুপ্ত যক্ষেরা নিত্য কাঁদিছে ক্ষুধায়
ধূর্ত দাবাগ্নি আজ জ্বলে চুপে চুপে,
প্রমত্ত কস্তুরীমৃগ ক্ষুব্ধ চেতনায়
বিপন্ন করুণ তোলে আর্তনাদ।

কবি বয়সে কিশোর, কিন্তু অভিজ্ঞতায় প্রবীণের মত। চিরকালের কবিত্বের দাবি যে কবির রক্তে প্রবহমান, তার তো মানসিক দুঃখ যন্ত্রণা ও অস্থিরতা অবিরাম! কবির অভিজ্ঞতা এখনো স্ব-চেতনা ও জীবনচর্যা নির্ভর বাস্তবতায় দীপিত নয়, তা কল্পনার সাযুজ্যে সত্য। সেই কল্পনার অতিরেকেই কবির কাছে স্পষ্ট হয় সমকালের যুদ্ধ-আক্রান্ত পৃথিবীর নিদারুণ রূপ।

দূর পূর্বাকাশে
বিহ্বল বিষাণ ওঠে বেজে
মরণের শিরায় শিরায়।

মুমূর্ষু বিবর্ণ যত রক্তহীন প্রাণ—
বিস্ফারিত হিংস্র বেদনায়।
অসংখ্য স্পন্দনে চলে মৃত্যু অভিযান
লোহের দুয়ারে পড়ে কুটিল আঘাত,
উত্তপ্ত মাটিতে ঝরে বর্ণহীন শোণিত প্রপাত।

এই হল উনিশ শ চল্লিশ সালের আগস্ট মাসের পৃথিবীর যুদ্ধ-আক্রান্ত অঞ্চলগুলির আত্মিক স্বরূপ।

এমন: আত্মিক সংকটে মৃত্যু-চিন্তা কবির মনে গভীর হয়ে ভাসে।

স্বপ্নোত্থিত পিরামিড দুঃসহ জ্বালায়
পৈশাচিক ক্রুর হাসি হেসে
বিস্তীর্ণ অরণ্য মাঝে কুঠার চালায়।
কালো মৃত্যু ফিরে যায় এসে।

'পূর্বাভাস' রচনার প্রায় একমাস পরে সেপ্টেম্বরের চব্বিশ তারিখে সুকান্ত লেখে 'নিবৃত্তির পূর্বে' এবং তারও চারদিন পরে লেখে 'পরাভব' নামের কবিতা। এই দুটি কবিতাতেও সেই সমকালীন যুদ্ধ-আক্রান্ত চিত্র তুলে ধরে কবি। 'নিবৃত্তির পূর্বে' কবিতায় সিদ্ধান্ত টানে—

দৃষ্টিহীন আকাশের নিষ্ঠুর সান্ত্বনা ঃ
ধু ধু করে চেরাপুঞ্জি—সহিষ্ণু হৃদয়।
ক্লান্তিহারা পথিকের অরণ্য-ক্রন্দন ;
নিশীথে প্রেতের বুকে জাগে মৃত্যুভয় ॥

সমকাল-চেতনায় কবিমানসের শিক্ষা, হয়ত বা অভিজ্ঞতাও দ্বিমুখী। মৃত্যুভয় ও ভাবনাজড়িত রোমান্টিক নৈরাশ্য, আর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জীবনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার ঐকান্তিক বাসনা।

কিন্তু উনিশ শ চল্লিশ-একচল্লিশ সালে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের বুকে যুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্য ও তজ্জনিত মৃত্যু প্রবাহ আরম্ভ হওয়ার আগে কবি সুকান্ত রচিত কবিতাগুলিতে যে মৃত্যু-ভাবনা, তা কেবল রোমান্টিকতা নয়, তার সঙ্গে আছে ব্যক্তিক জীবনের প্রত্যক্ষ মৃত্যু-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা।

পরিবার জীবনের বহুমৃত্যুর ঘটনায় বিষাদের ছায়াপাত ঘটে। সেই বিষাদের ছায়া থেকে সুকান্ত নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই বেরিয়ে আসে বাইরে। বাইরে একের পর এক পরিচয়ের পরিধি বাড়তে থাকে। কবির রোমান্টিক আকৃতি বহু মানুষের পরিচয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু মৃত্যু-স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি সুকান্তকে তাড়া করে ফেরে। এক অন্ধকার রাতে যে মৃত্যুভয় গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দার মত রহস্যজনক পদশব্দে, অশরীরী ছায়াপাতে সুকান্তকে বেষ্টন করেছিল, বাইরের বহু পরিচয়ের কলকণ্ঠের মধ্যে সে তাকে মুক্তি দেয় নি।

তাই কিশোর কবির, সদ্য-অভিজ্ঞতা-উৎসুক কবির সমস্ত ঔৎসুক্যে জড়িত থাকে ভয়, নৈরাশ্য, হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, নিঃসঙ্গতার অতল গভীর বেদনা।

একদিকে সাত-আট বছর বয়স থেকে বর্তমান বয়স পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় মৃত্যুস্মৃতি, আর একদিকে অনেক দূরে প্রত্যক্ষ-যুদ্ধে লিপ্ত প্রতীচ্যের অনাত্মীয়, অপরিচিত মানুষগুলির মৃত্যুভাবনার বড় আপন, হৃদয়ের শব্দের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের মত বোধে রোমান্টিক চিন্তা।

দুটি সূত্রই কিশোর মনে সহজ সুদূর। কিন্তু প্রথমটি বাস্তবতায়, দ্বিতীয়টি কল্পনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া থেকে উনিশ শ একচল্লিশের মধ্যভাগ পর্যন্ত কবি সুকান্তর অভিজ্ঞতা যন্ত্রণার, অ-স্থৈর্যের, আপাত-নৈরাশ্যের, স্ব-নির্ভর নিঃসঙ্গতার।

এমন ব্যক্তিক ও পারিপার্শ্বিক এবং বিশ্বজনীন সংকটেই কবি সুকান্ত রচনা করে রাজনীতির ধারণা-বিবর্জিত কবিতা 'নিবৃত্তির পূর্বে' 'আমার মৃত্যুর পর' 'স্বতঃসিদ্ধ' 'পরাভব' 'আলো-অন্ধকার' 'হে পৃথিবী' 'স্মারক' 'স্বপ্নপথ' 'আসন্ন আঁধারে' 'প্রতিদ্বন্দ্বী'—এমন সব কবিতা।

'হে পৃথিবী' কবিতায় কিশোর কবি লেখে,

> বিস্মৃত শৈশবে
> যে আঁধার ছিল চারিভিতে
> তারে কি নিভৃতে

আবার আপন করে পাব,
ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে যাব,
স্মৃতির মর্মরে ?

এমন প্রশ্নের মধ্যেই কবিতা শেষ করেনি কবি। এরপরেও কবি নিজের গোপন বাসনার কথাটি বলে ওঠে,

প্রভাত পাখির কলস্বরে
যে লগ্নে করেছি অভিযান,
আজ তার তিক্ত অবসান।
তবু তো পথের পাশে পাশে
প্রতি ঘাসে ঘাসে
লেগেছে বিস্ময় !
সেই মোর জয়।

একদিকে প্রবল সংশয়, আর একদিকে গভীর বিস্ময়। একপক্ষে সূক্ষ্ম অবিশ্বাস, অন্যপক্ষে অবিশ্বাসকে জয় !

আমার মৃত্যুর পর, জীবনের যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর ॥

নিজের মৃত্যুচিন্তা কবিকে স্পর্শ করে থাকে, কিন্তু তা জীবনের যাবতীয় অনাদর, লাঞ্ছনা, বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে থেকে যে প্রতিটি মানুষের অন্তরে সমন্বিত হয়ে যাবে এমন বিশ্বাসকে জয় করেই ঘোষণার মত রেখেছে কবি 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতার শেষে। সেই অবিশ্বাসকে জয় !

চল্লিশ সালের পরিবেশে এমনি মানসভঙ্গি কবি সুকান্তর। 'স্বতঃসিদ্ধ' কবিতায় কবির সেই সমকালীন পরিবেশচেতনা রোমাণ্টিক আবেগে উপস্থাপিত ;—

মৃত্যুর মৃত্তিকা পরে ভিত্তি প্রতিকুল—
সেখানে নিয়ত রাত্রি ঘনায় বিপুল ;
সহসা চৈত্রের হাওয়া ছড়ায় বিদায় ;
স্তিমিত সূর্যের চোখে অন্ধকার ছায়।

সমকাল, সেই চিহ্নিত বিশ্ব, তার অনুবর্তী স্মৃতি, কবির নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সূত্র,—

> বিরহ বন্যার বেগে প্রভাতের মেঘ
> রাত্রির সীমায় এসে জানায় আবেগ,
> ধূসর প্রপঞ্চ-বিশ্ব উন্মুক্ত আকাশে
> অনেক বিপন্ন স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।
> তবু তো প্রাণের মর্মে প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা
> অজস্র ফুলের রাজ্য বাঁধে লঘু বাসা ;

উনিশ শ উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশ সালের মধ্যবর্তীকাল। কবি সুকান্তর পক্ষে বুঝি থেমে থাকার, অবসর যাপনের কাল। প্রকৃতি, প্রেম, রোমান্টিকতা, বিলাস, দুঃখ, মৃত্যুভয়—এমন সব বৃত্তি কবির মন আচ্ছন্ন করে থাকে।

কারণ স্পষ্ট। গৃহ পরিবেশে বিচ্ছিন্ন এক কিশোর তখনো তার কাব্যের বা কাব্যভাবনার নির্দিষ্ট পথ ধরতে পারেনি, চিনতেও শেখেনি। শুধু মৃত্যু-অভিজ্ঞতা তো কোন কবির কাব্য-বিষয় হতে পারে না। শুধু স্মৃতি কবিকে যে বিষয়ে মাত্র বিলাসীই করে তোলে। শুধু প্রকৃতি, বা নৈরাশ্যময় অনুভূতির যাবতীয় জিজ্ঞাসা, আবার সব অবস্থায় আশার দিকে ধাবিত হওয়া—এসবই কোন বড় কবির একমাত্র কাব্য বিষয় হতে পারে না।

সুকান্তর ক্ষেত্রেও হয়নি। তবে সমকালীন দুটি বছর যুদ্ধ আরম্ভের পর প্রত্যক্ষভাবে কলকাতার বুকে বসে যুদ্ধ অভিজ্ঞতার পূর্ব পর্যন্ত সময়-চেতনায় কবির মানস-পরিবেশ রাবীন্দ্রিক, কেবল-রোমান্টিক, প্রাক-অভিজ্ঞতা-লব্ধ মৃত্যুভীত।

সুকান্তর তেরো-চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই একটা স্থিতির, স্থিরতার সময় আসে। উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ আছড়ে পড়ার আগে তীরের এক শান্ত নিস্তরঙ্গ চঞ্চলতা।

দূর থেকে এক বিশাল কালবৈশাখীর মেঘ ঝড়ের বেগে আগ্রাসন! তার স্বরলিপি কবির চেতনায় অস্পষ্ট কাকলি রচনা করে। কবির

নিজস্ব মৃত্যু-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে উত্তাল জীবন-মৃত্যুর সংঘর্ষপর্বের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে কবিকে নিক্ষেপ করবে ভয়ংকর এক দুকূলপ্লাবী জীবন-ভোগের দিকে—যার অতিসূক্ষ্ম কাব্যিক প্রেরণা, প্রত্যয় ও শাশ্বত সত্যরূপ—'মানব্য'।

তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ কবি সুকান্ত!

এই অবস্থার প্রাক মুহূর্তে যেনবা নিজের কিছু প্রস্তুতির মতই চলে কাব্যচর্চা। 'তরঙ্গ ভঙ্গ' কবিতায় তাই আছে বিলাস, আছে রোমান্টিক পলায়নপরতার অকপট স্বীকারোক্তি—

> আজ জীবনেতে নেই অবসাদ!
> কেবল ধ্বংস, কেবল বিবাদ—
> এই জীবনের একী মহা উৎকর্ষ!
> পথে যেতে যেতে পায়ে পায়ে সংঘর্ষ

অসহায়তা, ক্লান্তি, প্রাণধারণের শক্তিহীনতা, অথবা রক্তারক্তি এসবের মনোভাবনায় কবি হয়েছে পুরনো দিনের প্রতি মমতাময়! এ বুঝি বিলাসী কবির পশ্চাদপসরণ! কবির অকপট স্বীকৃতি তাই—

> —একী অবসাদ ক্লান্তি নেমেছে বুকে,
> তাই তো শক্তি হারিয়েছি আজ
> দাঁড়াতে পারি না রুখে।
> বন্ধু আমরা হারিয়েছি বুঝি প্রাণধারণের শক্তি
> তাই তো নিঠুর মনে হয় এই অযথা রক্তারক্তি।
> এর চেয়ে ভালো মনে হয় আজ পুরনো দিন,
> আমাদের ভাল পুরনো, চাই না বৃথা নবীন।

বসে বসে শুধু যেন কবিতা লিখে যাওয়া। জীবনের প্রত্যয়ে যে গতিশীলতা সব সময়ে সক্রিয় থাকে এ যেন তা নয়। 'আলো অন্ধকার' কবিতায় সেই নৈরাশ্য সেই মৃত্যুভয়, সেই স্বপ্ন দেখা—

> প্রতিবার
> স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি অন্ধকারে মৃত্যুর চিত্কার

মুহূর্ত-কম্পিত-আমি বন্ধ করি অলৌকিক গান,
প্রচ্ছন্ন স্বপন মোর আক্ষরিক মিথ্যার পাষাণ ;

এমনি জীবন কবি কিশোর সুকান্তর, যে সেখানে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামনে না রাখলে আর চলে না। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' কবিতায় একেবারে নিজের নির্জনে নিমজ্জিত মুখ রাখা ছাড়া আর কি ?

খুঁজে নিতে হবে পুরাতন হাতিয়ার
পাণ্ডুর পৃথিবীতে।
আফিঙের ঘোর মেরু-বর্জিত শীতে
বিষাক্ত আর শিথিল আবেষ্টনে
তোমারে স্মরিছে মনে।

অন্য এক রক্তিম হার্দ্য ভাবনায়, বেদনায় একেবারে নিঃসঙ্গ নিজের মধ্যেই মুখবিম্বের অন্বেষণ 'স্মারক' কবিতায়—

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয় তো পড়িবে মনে
রজনীগন্ধা বনে।

যে কিশোর কবি কাব্য-অভিজ্ঞতায় বলে ওঠে,

আমার দিনান্ত নামে ধীরে
আমি তো সুদূর পরাহত,

সেই কবিই আবার 'আসন্ন আঁধারে' কবিতার শেষতম ভাবনায় যেনবা গভীর জিজ্ঞাসায় বলে ওঠে—

যতদূরে দৃষ্টি যায়—
চেয়ে দেখি ঘিরেছে কুয়াশা।
উড়ন্ত বাতাসে আজ কুমেরু কঠিন
কোথা হতে নিয়ে এল জড়-অন্ধকার ;
—এই কি পৃথিবী ?
একদিন জ্বলেছিল বুকের জ্বালায়—
আজ তার শবদেহ নিস্পন্দ অসাড়।

এইভাবেই কবির মনের চলাফেরা চলে নিঃসঙ্গে !

প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ যখন ভারতের মাটিতে পা দেয়, তখন সুকান্তর

বয়স পনেরো পূর্ণ। ঠিক তার আগে সুকান্তর কাব্যে যে অভিজ্ঞতার ছবি তা কখনো রাবীন্দ্রিক, কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসে, আশা-নিরাশায়, দুঃখ-দুঃখহীনতায়, প্রশ্ন-উত্তরে, অবসাদে-বিলাসে রঙ্গমঞ্চের একাধিক গতিময় আলোয় বার বার ঘুরে ফিরে আসা-যাওয়ার মত।

সুকান্ত তার অল্প বয়সের অভিজ্ঞতায় থিওরি-সর্বস্ব, কিন্তু আগামী আসন্ন প্রবল বন্যাকে উপযুক্তভাবে কাব্যে বহন করার মত শক্তি, সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে প্রতীক্ষারত।

কলকাতার বুকে বোমাবর্ষণের আগের তিন বছরে কবি সুকান্তর কবিতা রচনার বিশেষ প্রবণতার এটি একদিক।

অন্যদিকে কোবিদ কবি, বিশ্বকবি, গ্রহসনাথ প্রজ্ঞাঋদ্ধ রবীন্দ্রনাথ।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু মহাপ্রয়াণ ও সুকান্ত

সাত আগস্ট, উনিশ শ একচল্লিশ সাল।

বাংলা তেরশ আটচল্লিশের বাইশে শ্রাবণ।

বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু! সুবিশাল আকাশের কক্ষ পথ থেকে এক শক্তিমান গ্রহের পতন! পৃথিবীর সর্বকালের জ্যেষ্ঠ কবির অন্তিম লগ্ন!

সুকান্তর মত এক সর্বকনিষ্ঠ কবির বয়স তখন কত? প্রায় পনেরো বছরের সীমালগ্ন এই কবি।

পনেরো বছরের সুকান্ত পুনর্বার এক মৃত্যু প্রত্যক্ষ করল। কি অর্থে পুনর্বার? কেমন সে মৃত্যু অভিজ্ঞতা? কবি সুকান্তর সৃষ্টিশীল মনে কি এর প্রতিক্রিয়া?

এর আগে সুকান্ত তখন পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে অল্প বয়সের মনের সম্পর্কে একাধিক মৃত্যুর দ্রষ্টা।

সুকান্তর আট-নয় বছরের বাল্যকাল থেকে সদ্য-কৈশোরে পা দেওয়া পর্যন্ত সমগ্র একান্নবর্তী পরিবারে ছিল যেনবা মৃত্যুর মিছিল। বালক সুকান্তর একান্ত প্রিয় রাণীদি থেকে শুরু করে একে একে সুকান্তর পিতামহী, বড়দা গোপালচন্দ্র, মেজদার ছোট দুই মেয়ে শ্রী আর মঞ্জু, জ্যাঠামশাই, পরিবারের অন্যতম ব্যক্তি পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শেষে নিজের মা সুনীতি দেবীর মৃত্যু।

এমন পারিবারিক মৃত্যুর মিছিল থেকে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এক বালক ও সদ্যকিশোরের মনের ভাণ্ডারে সম্ভব! এমন মৃত্যুর মিছিলের যে কান্না, বেদনা, দুঃসহভার, দুঃখ, অসহায়তা, গভীর বিষাদ উত্তরোল হয়ে এক বালক ও কিশোরের কোমল হৃদয়ে জমা হতে পারে ধীরে, অতি ধীরে—শীতের দিনের আসন্ন সন্ধের মত, বা গভীর রাতে শিশিরের শব্দের মত,—তা-ই সঞ্চিত হয়েছিল সুকান্তের বুকের গভীরে, হৃদয়ের কোমল কোণটিতে।

তার উৎকেন্দ্রিক জীবনে মৃত্যুর অভিজ্ঞতাই বুঝি ছিল একমাত্র সঞ্চয়, পাথেয়।

রাণীদির মৃত্যু। মা সুনীতি দেবীর ইহলোক ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ।

শান্ত, ধীর পুকুর। সচল, বেগবান নদী। চিরকালের শব্দময় সমুদ্র।

সুকান্তর জীবনে রাণীদির আকস্মিক অন্তর্হিত হওয়ার ঘটনা শান্ত ধীর, কল্পনাময় এক অনুভূতিতে বেজে থেমে গিয়েছিল। রাণীদির মৃত্যু নিছক এক বালকের কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়।

মা সুনীতিদেবীর মৃত্যু সেই শান্ত মৃত্যু-অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন রূপ। এক 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত' সুকান্তকে অসহায় বিষন্নতা দিয়ে বাইরে এনে দাঁড় করিয়েছিল! নদীর প্রবাহের মত সব কিছু চরম নিরাসক্তিতে ছেড়ে ছেড়ে ফেলে ফেলে চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা যুগিয়েছিল সদ্য-কিশোর সুকান্তর মনে। নদীর মত উৎকেন্দ্রিক, ছন্নছাড়া, বাধাহীন তার স্বভাব।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু? সমুদ্রের শব্দ, ধ্বনি শোনার অভিজ্ঞতা দেয় সুকান্তর জীবনে। এখানে বিশ্ব-নাগরিক কবি সুকান্ত যে!

পুকুর পিছনে রেখে নদীর স্রোতে এগিয়ে আসতে আসতে সমুদ্র-স্নান! রবীন্দ্র-মহাপ্রয়াণ এক কনিষ্ঠ কবির সদ্য-আরম্ভ কবিজীবনে যেনবা তেমনি সীমাহীন শোক-সমুদ্রস্নান। এই স্নানে রবীন্দ্র-পরিবেশে, রবীন্দ্রনাথের কাছে আছে অবধারিত শিক্ষা ও দীক্ষা। কবি সুকান্তর কবি জীবনের শিক্ষাপর্বে ও দীক্ষাগ্রহণে রবীন্দ্রনাথ শ্রেয় এবং প্রেয়।

সেই ঐতিহাসিক বাইশে শ্রাবণে ঘন মেঘের স্বরলিপি আঁকা প্রাকৃতিক পরিবেশে এক কবির মহাপ্রয়াণে যে মহাশোকের গণরূপ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল সারা পৃথিবীতে, ভারতে, তথা বাংলাদেশে, তা কেন্দ্রিত হয়েছিল কলকাতার বুকে—সুকান্তর অতি প্রিয় সেই কলকাতায়। সেই অকারণ অবারণ জনতাস্রোতের চলার শব্দের মধ্যে

কবি কিশোরের পদশব্দও বেদনার্ত সম্মিলিত হৃদয়-শব্দের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছিল নিঃশব্দে।

সে এক ঐতিহাসিক দিন। এমন দিনে সুকান্তও ছিল শ্মশানপথ-যাত্রী। সুকান্তর সেই সহমর্মী শোকযাত্রার অভিজ্ঞতা, তার বাইরের আকৃতি-প্রকৃতি এমন এক রানারের—যে নতুন চিঠির বাহক অনন্ত কালের। যে এক 'ডাকঘরে'র বুঝিবা বয়স্ক কোন অমলের কাছে চলেছে নতুন চিঠি নিয়ে আসার, পৌছে দেওয়ার।

অনন্তকালের রানার সুকান্ত। অনন্তকালের কবি সুকান্ত।

রানার চলেছে, রানার!

সেই শোকযাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন সুকান্ত সহোদর ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত' গ্রন্থে :

'মহাকবির মহাপ্রয়াণে সুকান্ত গভীর বেদনা পেয়েছিল। আমার মনে আছে তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল অতি নিকট আত্মীয়বিয়োগের শোকচিহ্ন। সুকান্তর আগ্রহে আমিও তার সঙ্গে শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণ করলাম। সুকান্ত আর আমি চলেছি নিমতলা শ্মশানের পথে, উদ্দেশ্য শেষবারের মত মহাকবির দর্শনলাভ। রাস্তায় অগণিত জনতার স্রোত। তাদের সবার মুখে শোকের কাতরতা। আমরা দুজন সেই বিশাল জনস্রোতে ভেসে চলেছি। বিশাল এ জন সমুদ্র, কোথায় এর শেষ, কোথায় এর শুরু জানবার উপায় নেই। সামনে আর পেছনে শুধু মানুষ আর মানুষ। নদী যেমন সাগরে মেশে তেমনি মূল রাস্তার আশে-পাশের অলিগলি থেকে জনতার স্রোত এসে এই বিশাল জনসমুদ্রে মিশে যাচ্ছিল। আর রয়েছে ফুল। কত লোক যে ফুল আর ফুলের মালা সঙ্গে করে এনেছে তার যেন শেষ নেই। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, আর আমাদের জীবনে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে জনতা নিমতলা ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেছে। পথের কেউ জানে না মহাকবির নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা। সবারই অন্তরের ইচ্ছে একবার শেষবারের মত মহাকবির দর্শন। বাস্তবিক, এক সঙ্গে এত লোকের সমাবেশ এর আগে আমরা কখনও দেখিনি।...

'সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা নিমতলার শ্মশানঘাটে পৌছলাম। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্যে আর এগোতে পারলাম না। সুকান্তর তখনও কোন রকমে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার জন্যে কি ব্যাকুলতা। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হল ; আমরা সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরে এলাম। তখনও জনতার স্রোত চলেছে জনসমুদ্রে, মেশবার আকুল আগ্রহে, মহাকবির শেষ দর্শন কামনায়।

'রেডিওতে সারাদিন ধরে ধারা-বিবরণী প্রচারিত হয়েছিল আর সুকান্ত রেডিওয় কান দিয়ে সারা দিনটা কাটিয়ে দিয়েছিল শোকযাত্রায় যাবার আগে পর্যন্ত। বিকেলের দিকে কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে একটি কবিতা পাঠ করেন। এ এক আশ্চর্য পরিস্থিতি। জানি না এমন বিস্ময়কর ঘটনা এর আগে ঘটেছে কিনা। এক মহাকবি সারা জীবনের অজস্র সম্ভার দেশবাসীকে উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন আর এই বিদায়ের করুণ বীণা বাজালেন আর এক কবি যাঁর বীণায় এর আগে শুধু আগুনের সুর বেজেছে। এই করুণ সুর সেইক্ষণে অভিভূত করেছিল আর এক আশ্চর্য প্রতিভাবান তরুণ কবিকে। এক সূত্রে গাঁথা এ এক বিচিত্র মালা।

'রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের শোকযাত্রা এবং তাঁর শেষ কৃত্যের পূর্ণ বিবরণ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেই করুণ বিবরণ প্রচার করা হল আকাশবাণীর (তখন নাম ছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিও) কলকাতা কেন্দ্র থেকে। সে বিবরণ এমনই করুণ রস-সিঞ্চিত যে রেডিওর সামনে উপস্থিত সবার চক্ষু সজল হয়ে উঠেছিল। আজও মনে পড়ে এ সময় আমি বার বার সুকান্তর দিকে চাইছিলাম, বুঝতে চাইছিলাম তার মনের অস্থিরতা।'

কবি সুকান্ত যে কি ভীষণ অস্থির ছিল সেই ঐতিহাসিক বাইশে শ্রাবণে, তার প্রত্যক্ষ চিত্র হল এই। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতার আবৃত্তি শুনিয়ে সুকান্তর রাণীদি সুকান্তর কল্পনা ও ছন্দের কানকে দিয়েছিলেন বলিষ্ঠতা, প্রসারতা, মোহমুগ্ধতা, ধ্বনিপ্রীতির, কবিতাপ্রীতির সহজ স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতা। কিশোরকালে সনিষ্ঠ অধ্যয়নে সুকান্তর

কাছে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন নিষ্ঠাবান সাধুর পোষাকের ওপরকার নামাবলী। নানাভাবে সুকান্ত রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবি।

রবীন্দ্র প্রতিভা আন্তর্জাতিক মেঘের মত। সুকান্ত-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হয় সেই 'মেঘছায়ে' গুরুর কাছে পাঠ ও দীক্ষা গ্রহণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে উনিশ শ একচল্লিশের প্রায় শেষ পর্যন্ত সুকান্ত যেসব কবিতার রচনাকার, সেগুলির অধিকাংশতেই সচেতনভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব ওতপ্রোত।

বুঝিবা রবীন্দ্রপ্রভাব নয়, রবীন্দ্র-শিক্ষা! হয়ত রবীন্দ্র দীক্ষাও!

সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে বড় কবি হওয়ার অনুপ্রাণনা অনুপ্রেরণার শিক্ষা গ্রহণ করে। মানুষকে ভালবাসার, সমস্ত রকম অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে ঋজু শালবৃক্ষের মত উন্নত, প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বে দাঁড়াবার চারিত্র্য।

গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে শিষ্য একলব্যের প্রভাবিত হয়ে প্রণাম!

তারপর? কালের নির্দেশে গুরুর থেকে ভিন্ন পথে নেমে পড়ে সুকান্ত। তার শিক্ষা সে রবীন্দ্র-মৃত্যুদিনেই বুঝি পেয়ে যায়!

কবির মহাপ্রয়াণে সুকান্ত মিশেছিল জনতার স্রোতে, জনতার মিছিলে! জনতা সুকান্তকে ঘিরে! একা নয়, অনেকের মধ্যে!

কবিকে পেতে হবে জনতার সঙ্গ, জনতাকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে হবে জন্মে-জীবনে-মরণে। এমন শিক্ষা, উপলব্ধি বুঝি ঘটেছিল কবি সুকান্তর মনে, মননে, বোধ ও বোধির জগতে সেই ঐতিহাসিক বাইশে শ্রাবণে।

তাই কলকাতার বুকে জাপানী বোমাবর্ষণ! কবি সুকান্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রবল কম্পন।

জনতার জন্যই কবি! কবির সঙ্গে সব সময়ে জনতা।

এই বিশ্বাসেই কবি সুকান্তর কবিতা চলার পথের প্রান্তে নতুন বাঁক নেয়।

কিন্তু এই নতুন বিষয় আর অঙ্গের কবিতা রচনার আগে রবীন্দ্রনাথের নামাবলী গায়ে দেওয়া সুকান্ত কবিতার ভাষা চর্চা করে গেছে তেরো থেকে পনেরো বছরের মধ্যে রচিত একাধিক কবিতায়।

'কবি সুকান্ত' গ্রন্থের রচয়িতা সুকান্ত-অনুজের ভাষায় 'আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন তিনি—যার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে চারটি কবিতা এবং একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন কবিগুরুর উদ্দেশে। স্বভাবতই এ সময় মহাকবির সমসাময়িক রচনার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন সুকান্ত। রবীন্দ্রনাথের যুদ্ধবিরোধী ঘোষণাসমূহ—বিশেষ করে নোগুচির প্রতি তাঁর আবেদন—আর পাঁচজনের সঙ্গে সংশয়াচ্ছন্ন সুকান্তকেও মানবতার প্রতি আস্থাশীল করেছিল।'

বিশ্ শতকের পৃথিবী ছুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এরই মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ ছুই বিশ্বযুদ্ধের ও তাদের পূর্ব প্রস্তুতির এক ত্রিকালদর্শী কবি ঋষির মত প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। অবশ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তিনি সম্পূর্ণ দেখতে পারেন নি, তবু ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা এই কবির ভবিষৎ বাণী ছিল যুদ্ধের ভয়াল পরিণামকে কেন্দ্র করেই।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালের মানবতার কবি। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে যে মানবতার কবর খোঁড়া হয়, রবীন্দ্রচিত্তকে তা ব্যথিত করে। রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা শোনান নিরীহ দেশবাসী ও যুদ্ধবাজ জাতিদের। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাপানী কবি নোগুচিকে সোচ্চার হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের আবেদন, র‍্যাথবোনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের খোলা চিঠি সুকান্তর আন্তরিক কবি প্রণামকে আরও বেশী সশ্রদ্ধ ও গভীর প্রত্যয়ে দৃঢ় করে তোলে।

এমন কণ্ঠ বড় প্রিয় ছিল সুকান্তর। সুকান্তর বলিষ্ঠ কবিকণ্ঠ স্পষ্ট ও সোচ্চার হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশেই। তাই কনিষ্ঠ এই মানবতার কবি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিশ্বকবির কাছে মানবতার বিস্ময়কর স্বীকৃতির শিক্ষা নেয়। কলকাতায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধ অভিজ্ঞতার পূর্ব পর্যন্ত রচিত কবিতার আবহ হলেন রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রকাব্য।

কিশোর কবির অন্তরঙ্গ নেশা তন্মিষ্ঠ মনে রবীন্দ্রসংগীত শোনা। এমন সঙ্গীতের গভীর নেশাই কিশোর কবিকে উদ্বুদ্ধ করে গান রচনায়। রবীন্দ্রনাথের গান সুকান্তর গীত রচনায় হয় নামাবলী।

গানের সাগর পাড়ি দিলাম

সুরের তরঙ্গে,

প্রাণ ছুটেছে নিরুদ্দেশে

ভাবের তুরঙ্গে।

*　　*　　*

হে মোর মরণ, হে মোর মরণ!

বিদায় বেলা আজ একেলা

দাও গো শরণ।

*　　*　　*

শীতের হাওয়া ছুঁয়ে গেল ফুলের বনে,

শিউলি বকুল উদাস হল ক্ষণে ক্ষণে,

ধূলি-ওড়া পথের পরে

বনের পাতা শীতের ঝড়ে

যায় ভেসে ক্ষীণ মলিন হেসে আপন মনে।

*　　*　　*

মেঘ-বিনিন্দিত স্বরে—

কে তুমি আমারে ডাকিলে শ্রাবণ বাতাসে?

তোমার আহ্বান ধ্বনি—

পরশিয়া মোরে গরজিল দূর আকাশে।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের এক কিশোর কবির হাতে এমন সব সুরমাধুর্যে সুন্দর গানের মালা! রবীন্দ্র-অনুসরণ প্রত্যক্ষ, অমোঘ বুঝিবা! তবু এতে কিশোর কবির অসম্মান, নেই, গ্রহসনাথ কবি রবীন্দ্রের প্রভাব এই সময়ে সব দিক থেকেই স্বাভাবিক।

তবু বিস্ময়কর হল এক কিশোরের পক্ষে এমনভাবে অকুণ্ঠ রাবীন্দ্রিক হয়ে ওঠা! কি বাচনভঙ্গি, কি শব্দ বিন্যাস, কি ছন্দ সুষমা, কি সুর-জ্ঞান! সুকান্তর হাতের লেখাও ছিল রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির অনুরূপ। সেখানেও অপেক্ষা করে আছে আর এক বিস্ময়। এমন আত্মীয়তা বাংলাদেশের কবিকুলে দুর্লভ!

সুকান্তর একেবারে নিরঙ্কুশ 'কবি সুকান্ত' হয়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত এমনি নিরলস রবীন্দ্রতর্পণ!

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায়, রবীন্দ্র-তর্পণেই যেনবা সুকান্ত লেখে 'প্রথমবার্ষিকী' 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে।' 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' নামে তিনটি কবিতা, 'সূর্যপ্রণাম' নামে একটি গীতিনাট্য—সেই সংগে ছোটদের জন্য 'এক যে ছিল' কবিতাটিও।

'প্রথম বার্ষিকী' কবিতার নামেই এর রচনাকাল চিহ্নিত। রবীন্দ্র-প্রভাব এই কবিতায় গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করার মত।

আর বার ফিরে এল বাইশে শ্রাবণ!
আজ বর্ষ শেষে হে অতীত,
কোন সম্ভাষণ
জানাব অলক্ষ্য পানে?
ব্যথাক্ষুব্ধ গানে,
ঝরাব শ্রাবণ বরিষণ!

কবিগুরুর স্মৃতিচারণে বেদনাবিহ্বল কবিপ্রাণের সশ্রদ্ধ নিবেদনের প্রারম্ভটুকু এইভাবে নিবেদিত হওয়ার পর সুকান্ত কবিতার সিদ্ধান্ত আনে পৃথিবীর সৎ অস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষায়, সমকালীন যুদ্ধ-চেতনায়। উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের আগস্টে কলকাতায় বসে কিশোর কবি আপন পবিত্র সত্তার পরিচয় দেয়—

এখন আতঙ্ক দেখি পৃথিবীর অস্থিতে মজ্জায়;
সভ্যতা কাঁপিছে লজ্জায়;
স্বার্থের প্রাচীর তলে মানুষের সমাধি রচনা
অযথা বিভেদ সৃষ্টি, হীন প্ররোচনা
পরস্পর বিদ্বেষ সংঘাতে,
মিথ্যা ছলনাতে
আজিকার মানুষের জয়;
প্রসন্ন জীবন মাঝে বিসর্পিল, বিভীষিকাময়,

রবীন্দ্রনাথ এক বৃহত্তম, মহত্তম মানবতার প্রতীক-প্রতিম চরিত্র। রবীন্দ্রস্মরণ যেন কবি সুকান্তর কাছে সমকালের দর্পণে সর্বাবয়ব ইতিহাস দর্শন। তা মানুষের ইতিহাস, মানব্যের ইতিহাস।

শুধু মৃত্যুর প্রথম বর্ষের স্মরণ-উদযাপন নয়, সুকান্ত পরবর্তী বছরে রবীন্দ্র-স্মরণে রচনা করে তাঁর বিখ্যাত সেই কবিতা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'। এই কবিতার জন্মের সময় কবির নিজস্ব জীবনযাপন ও মানস-গঠন কি রকম ছিল? সে সময়ের কবির গভীরতম অন্তরঙ্গ সঙ্গী মোহিতমোহন আইচ্ একটি তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে—'কলকাতার ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি 'পথে পথে শঙ্কা' ছড়ায়। বেলেঘাটার অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শ্রীসুশীল মুখার্জী প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'জনরক্ষা সমিতি'। জনরক্ষা সমিতির কাজ খাদ্য আন্দোলন করা, Control-এর দোকানে লাইন সাজানো, লাইনে যাতে কোনো অনুপ্রবেশ না ঘটে তা দেখা। খাদ্যের সারিতে দাঁড়ানো সুকান্ত এখানেও স্বেচ্ছাসেবকদের একজন। আর এই লাইনে দাঁড়ানো অভ্যাসই তার অন্যতম কবিতার জন্ম দিল: 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।' (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)'

বস্তুত তখন দুর্ভিক্ষে, মন্বন্তরে সারা বাংলাদেশ তথা কলকাতা কংকালের মত শরীর নিয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসরমান। ঝড়, বন্যা, মহামারী, গণিকাবৃত্তি, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধে অস্থিরতা, অবিশ্বাস, অনীহা, মুনাফাবাজি, ব্ল্যাকমার্কেটিং, শোষিতের ওপর শোষকদের অকথ্য ঘৃণ্য অত্যাচার। ঊর্ধ্বের আকাশে ঘৃণিত শকুনদের মত জাপানী বোমারুর আকস্মিক আনাগোনা, ভয়াল নিষ্প্রদীপ কলকাতা নগরী। মাঝে মাঝে সাইরেনের সংকেতে হিষ্টিরিয়া রোগীর মত কলকাতার মানুষের হৃৎকম্পন।

সে এক দুর্বিসহ রুদ্ধশ্বাস অবস্থা!

এরই মধ্যে আসে বাইশে শ্রাবণ। আসে রবীন্দ্রস্মরণের সজল, অশ্রুবিধুর সন্ধ্যা!

কিন্তু এমন বীভৎস পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বন্দিত হবেন? বিশেষ করে অনুজতম কবিকণ্ঠে?

রবীন্দ্রনাথ হলেন মানুষের জীবন ও চিরকালের মানবতার এক

দুরূহ ব্যঞ্জনার প্রতীক। এমন প্রতীক-প্রতিম ব্যঞ্জনায় সুকান্ত রচনা করে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা।

স্বরচিত কবিতা কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাইশে শ্রাবণের এক ভাসমান 'মেঘছায়ে সজল বায়ে'র সন্ধ্যায়।

'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি' একটি সংগঠন। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বালিগঞ্জ লেকের প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি।

কবি সুকান্ত সেকালে এর ভাষান্তর করে 'ভারতীয় জীবন ত্রাণ সমাজ' নামে।

এই সমিতির ঘরে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সুকান্ত পড়ে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি। কবিতা নয়, কবিপ্রণাম! হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভক্তি নয়, ভালবাসার সহৃদয় আর্তি! শুধু কবিপ্রণাম নয়, প্রণাম-মন্ত্রের মাধ্যমে যুগের বাণীরচনা। অনুজ কবির পক্ষে চিরকালের কবিদের কাছে শাশ্বত 'মানব্য'-বেদের টীকাভাষ্য উপহার।

সেদিনের সেই সান্ধ্য সভায় উপস্থিত সংগঠনটির সভ্য পৃষ্ঠপোষক প্রায় সকলেই। সুকান্তর জ্যাঠতুত দাদা রাখাল ভট্টাচার্য প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও পরিচালক সন্তোষ সেনগুপ্তের সহপাঠী ও অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। দুজনেই এই সংগঠনের সভ্য। এঁরা ছাড়া সুকান্তর পরিবারের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

এই সূত্রে পরিবারের কিশোরদের এই সংগঠনের নানান রমণীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে যাওয়ার ও যোগ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ক্লাবের কিশোর, তরুণ, যুবক সভ্যদের অফুরন্ত, বিপুল উৎসাহ। গানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন তখনকার উদীয়মান কণ্ঠসংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, হাস্যরসিক অজিত চট্টোপাধ্যায়, অন্যান্য বিশিষ্ট গুণীজন, সুধীজন—কবি বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, সুবিনয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সংগঠনের পরিবেশ অপূর্ব, মনোরম, শ্রোতাদের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পশ্চিমদিকে সাঁতার শেখার জন্যে তৈরী দীর্ঘ দীঘিটি

শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে ভরপুর। সন্ধের অন্ধকার দীঘির জলে বিশাল নৌকার মতো ভাসমান।

সংগঠনের বাড়িটি সুন্দর সজ্জিত বাংলো। সামনে বারান্দা। পূর্বে চওড়া রাস্তা, আর পুষ্পলতায় সাজানো প্রবেশ পথ। দক্ষিণে ফুলের বাগান আর বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণ।

বাংলো বাড়ির একতলার হলঘরে সভা। শ্রোতাদের উৎসুক চোখ মঞ্চের দিকে। মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

আজ বাইশে শ্রাবণ। কবি-প্রণামের মন্ত্রোচ্চারণ করে কবি-আত্মার অনন্ত অভিনন্দনের ক্ষণটিকে নির্দিষ্ট করে রাখা।

অনুষ্ঠানে গান করলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস। প্রভাত ভট্টাচার্য কিশোরী বোন পারুলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্র-নাথের গান কোরাসে বাঁধলেন।

এসব গানের পরিবেশে সুর-পাগল শ্রোতারা মুগ্ধ। রবীন্দ্র প্রীতির আন্তরিক অভিব্যক্তি সকলের মুখে-চোখে।

চারপাশ আলোক-উজ্জ্বল। অনুষ্ঠানে সমবেত শ্রোতারা প্রায় সকলেই সুখী, ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের। রবীন্দ্র-অনুষ্ঠান বুঝি সেকালেও ছিল বিলাস! এমন গানের পরিবেশে সকলেই যেনবা মদমত্ত! মদ সুরের, মদ রবীন্দ্রনাথের কথার, শব্দের, কবিতার ধ্বনির! মদ শ্রবণের বিলাসে! আরামে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্রোতৃকুল!

> এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি
> প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
> এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
> নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
> এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
> তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।

এক কিশোর-কণ্ঠ আবেগে স্পন্দিত হতে হতে অনুষ্ঠান কক্ষের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে এইভাবে—

> এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
> মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।

তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লজ্জিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করছে সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবি বয়সে কিশোর, কিন্তু তখনকার অধিকাংশ সাধারণ শ্রোতার কাছে সে একেবারে অর্বাচীন, অপরিচিত, বুঝিবা অপাংক্তেয়। হাতে 'অত্যন্ত সাধারণ কাগজে, দোমড়ানো মোচড়ানো ভিজে ন্যাতার মতো একটি ব্রাউন রঙের খাতার পৃষ্ঠায়' লেখা কবিতাটি। সুকান্তর আবৃত্তি করার অভ্যাস ও ভঙ্গী ছিল রাবীন্দ্রিক। ভাল লাগারই কথা।

কিন্তু সেদিনকার সেই সভায় প্রভাত ভট্টাচার্যের সঙ্গে কোরাস গানের অন্যতম সঙ্গী তাঁরই বোন প্রত্যক্ষদর্শী পারুল বসুর মূল্যবান মন্তব্য, নাকি সচিত্র উপচার। 'অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো, অল্পবয়স্ক আর রাখালদার ভাই বলেই যেন দয়া করে সুকান্তকে কবিতাটি পড়তে দেওয়া হয়েছে। আর সাধারণ শ্রোতা সেই আধুনিক, সুবেশী, সৌখীন অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের ঝকঝকে মানুষগুলি তাঁরা। তখন কি করছেন? মুখে-চোখে উপেক্ষা, উদাসীনভাব। কবিতা পাঠের কোন প্রতিক্রিয়া নেই তাঁদের মুখে-চোখে। বুঝিবা কিছুটা উন্নাসিকতা।

'সুকান্তর গায়ে আধময়লা জামা, পায়ে জুতো নেই, ওই অভিজাত সমাবেশে সামিল হওয়ার মতো সাজ-পোশাক চেহারা তার মোটেই ছিল না। অত্যন্ত সংকোচের সংগে লাজুক সুকান্ত মাথা নীচু করে' পড়ে চলল স্ব-রচিত, কবি-হৃদয়ের রক্তে রক্তিম উজ্জ্বল পংক্তিগুলি।

তবুও নিশ্চিন্ত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—

এমন পংক্তি কানে এলেও শ্রোতারা চমকিত হন না। বরং 'নিচু গলায় কথা' বলে চলেন নিজেদের মধ্যে। এমন নির্বিকারভাব,

শ্রোতাদের এমনি তাচ্ছিল্যের মধ্যেই সভা মধ্যে নতুন বজ্রের মত ধ্বনিত হল,—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

রবীন্দ্র-প্রণাম-মন্ত্রটির অমোঘ গুপ্তি রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে পথ ধরে অন্য। বিষয়ে আর রাবীন্দ্রিক নয় সুকান্ত। পরিবেশ তাকে দিয়েছে বাস্তব জীবনের, তার নিষ্ঠুর পট-বিস্তৃতির অভিজ্ঞতা। উনিশ শ তেতাল্লিশের কবিকে তো 'দুর্ভিক্ষের কবিত্বে'র শপথ নিতেই হবে!

রবীন্দ্র-স্মরণে রবীন্দ্র-উত্তরণের পরবর্তী ধাপ রচনা করে সুকান্ত তার কবিতায়।

কিন্তু কে শোনে এমন কথা? সমস্ত শ্রোতা তখন অমনোযোগী। কবি-আবৃত্তিকার সুকান্তর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা নীচু করা কিশোর কবি তখনো কবিতার শেষতম সিদ্ধান্তের পংক্তিগুলির ওপর উন্মুখ। সর্বকালের মানুষের কাছে শোনাতে যেনবা সে প্রয়াত রবীন্দ্রনাথের আত্মার কাছেই শপথবদ্ধ!

তাই আজ আমারো বিশ্বাস
'শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস',
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।

কবিতাটির প্রথমাংশে সেই দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে শিষ্য একলব্যের প্রণামের মত কবিপ্রণাম, শেষাংশে গুরুর দেওয়া শক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়া!

কবিতা পড়া শেষ হতেই ভীরু লাজুক কবি মঞ্চ থেকে নেমে এল। এমন একটি কবিতা পাঠ। কোথায় তা উদ্বেলিত করল শ্রোতাকে!

বরং যেন বাইশে শ্রাবণের এমন বিধুর সন্ধ্যায় এই অর্বাচীন কবি কবিতাটি পড়ে 'বিরাট এক ছন্দপতন ঘটিয়ে ফেলেছে'।

'অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের ওই মানুষগুলি যেন সুকান্তর ওই জ্বালাময়ী কবিতার বক্তব্য সহ্য করতে পারেন নি সেদিন। কেউ কেউ বিরক্তও হয়েছিলেন।

'সারা দেশে তখন প্রবল অস্থিরতা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর করাল ছায়া। সুকান্তর কবিতার ভাষায় 'জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি'কে উপেক্ষা করে মানুষ দু'মুঠো খাদ্যের জন্য রেশনের লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষিত। এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ওই বক্তব্য ছাড়া আর তার কি হবে?

'কিন্তু সুখী অভিজাত মানুষের সমাবেশে ওর ওই কবিতা কোন অভিনন্দনই পায়নি সেদিন।'

এই উক্তি করেছেন সেদিনের অনুষ্ঠানটির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা পারুল বসু।

সেদিনের সেই 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে, সেই বাইশে শ্রাবণের সন্ধ্যায় সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসু।

অনুজ সর্বকনিষ্ঠ কবি-কিশোর সুকান্তকে প্রথম দেখা অগ্রজ কবি বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতি-আলেখ্য সুকান্তর মহৎ মর্যাদা বা স্বীকৃতিই বলা যায়

'বন্ধুমহলে নাম শুনেছিলাম আগেই; চোখে দেখলুম লেক-লগ্ন একটি ক্লাবের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে। উজ্জ্বল আলোয়, সুবেশ, চিক্কণ এবং সাধারণতঃ কাব্য সম্বন্ধে উদাসীন মেয়ে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে কালো একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ চেঁচিয়ে, বেশ স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিজের লেখা একটি কবিতা পড়লো। পড়াটা ভালো লাগলো আমার, কবিতাটিও মন্দ না। সভার শেষে একটু আলাপ করলুম ছেলেটির সঙ্গে।

'এর পরে সুকান্ত একদিন এলো আমার কাছে। কালোকোলো শক্তপোক্ত চেহারা, ছোট করে ছাঁটা রুক্ষ চুল, আধ-ময়লা মোটা জামা

কাপড়, পায়ে (খুব সম্ভব) জুতো নেই। তার বড়ো বড়ো মজবুত হাতপায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তার রক্তের আত্মীয়তা সেই কৃষক-মজুরেরই সঙ্গে, যাদের কথা লিখতে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গর্কীর মতো, তার চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দুটি সরল।'

বুদ্ধদেব বসু স্বীকৃতি দেন কিশোর কবিকে। নিজে থেকেই কবিতাটি চেয়ে নেন সুকান্তর কাছ থেকে। দ্বিতীয়বার পড়েন মন দিয়ে। যেখানে পংক্তিটি ছিল 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের লাইনে প্রতীক্ষায়,' তার বদলে অগ্রজ কবি পরামর্শ দেন ইংরাজি শব্দটি বদলে দেওয়ার। পরিমার্জনায় পংক্তিটি হল—'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।'

শুধু মৃত্যুদিন স্মরণে নয়, রবীন্দ্র-জন্মদিনেও সুকান্ত রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছে নতুন প্রাণের, জীবনবোধের প্রতীতিতে, প্রতীকে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনভিজ্ঞ কিশোরের রোমান্টিক মনের অভীপ্সিত কবি নন, রবীন্দ্রনাথ সুকান্তর কাছেও অনাগত এক কালের কবি—যাঁর কাছে মানব-প্রেম-বুভুক্ষু মানুষের চাওয়া-পাওয়ার অন্ত নেই, অন্ত থাকতেও পারে না কোনদিন।

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ,
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধ বাক্; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের।

এমন সব চরণে হৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত একাগ্রতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের ভাষা যাবে শোনা
ভেঙে যাবে রুদ্ধশ্বাস নিরুদ্যম সুদীর্ঘ মৌনতা
আমাদেরই দুঃখে সুখে ব্যক্ত হবে প্রত্যেক রচনা
পীড়নের প্রতিবাদে উচ্চারিত হবে সব কথা।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে যেনবা আয়নায় নিজের বিশ্বাস-বাসনাকে ব্যক্ত করার ব্যগ্র আকুতি!

আমি দিব্য চক্ষে দেখি অনাগত সে রবীন্দ্রনাথ:
দস্যুতায় দৃপ্ত কণ্ঠে (বিগত দিনের)
ধৈর্যের বাঁধন যার ভাঙে দুঃশাসনের আঘাত
যন্ত্রণায় রুদ্ধবাক, যে যন্ত্রণা সহায়হীনের।

সুকান্ত যে রবীন্দ্র-আশীর্বাদপুষ্ট কবিমন নিয়েই তার যাত্রা শুরু করে, রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতাগুলি তার প্রমাণ। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে' কবিতাটি সম্ভবত উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালেরই রবীন্দ্র-জন্মদিন স্মরণে লেখা। কবিতাটি লেখার পর সে সময়ের 'ছাত্র ফেডারেশানে'র বেলুড় শাখার একটি শিবিরে আয়োজিত দেয়াল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সুকান্ত তখন অসুস্থ, নিজে শিবিরে যেতে না পারায় দেয়াল পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক প্রদ্যোৎ গুহ ও অলকা মজুমদারের কাছে কবিতাটি পাঠিয়ে দেয়।

বাংলাদেশ তথা সারা কলকাতার বুকে অক্টোপাশের শক্ত বন্ধনে জর্জরিত হওয়ার মত যুদ্ধ, বন্যা, মন্বন্তর, মহামারী, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। কবিতাটি সেই অভিজ্ঞতা, সেই মানসিকতা এবং সেই পরিবেশ ও কালের সাক্ষ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আগামী দিনে আহ্বানের সচিত্র ও আবেগাত্মক বর্ণনার চিত্ররূপ! অনেকটা কিশোর মনে-প্রাণে পর্যুদস্ত, আত্মার সংকটে সঙ্গীন কবির স্বীকারোক্তিও!

ইতিহাস মোড় ফেরে, পদতলে বিধ্বস্ত বার্লিন,
পশ্চিম সীমান্তে শান্তি, দীর্ঘ হয় পৃথিবীর আয়ু,
দিকে দিকে জয়ধ্বনি, কাঁপে দিন রক্তাক্ত আভায়।
রাম রাবণের যুদ্ধে বিক্ষত এ ভারত জটায়ু
মৃতপ্রায়, যুদ্ধাহত, পীড়নে দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।

ইতিহাস-সচেতনা যে এক কমিউনিস্ট কবির পক্ষে কবচকুণ্ডলের মতো মনের অধিকার, এই স্বীকারোক্তিতে তা সত্যে স্বীকৃত।

পূর্বাচল দীপ্ত করে বিশ্বজন সমৃদ্ধ সভায়
রবীন্দ্রনাথের বাণী তার দাবি ঘোষণা করুক।

এবার নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ সংগীতের সুর ;

সুকান্ত রবীন্দ্র-প্রভাবিত থেকেও, রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়েও যে নব বাস্তবতা—যা বিপ্লবের অন্তঃশক্তিতে দীপ্র, দীপ্য হবে— যেন তার প্রতি ভাবের আনুগত্যে স্থির।

জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক,
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও প'চিশে বৈশাখ ॥

স্পষ্ট রবীন্দ্র-প্রভাবে প্রভাবিত 'সূর্য-প্রণাম' গীতিনাট্য, পূর্ব নাম 'পঁচিশে বৈশাখ'—ভাই ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করা।

বেলা শেষে শান্ত ছায়া সন্ধ্যার আভাসে
বিষণ্ণ মলিন হয়ে আসে,
তারি মাঝে বিভ্রান্ত পথিক
তৃপ্তিহীন খুঁজে ফেরে পশ্চিমের দিক।
পথপ্রান্তে
প্রাচীন কদম্ব তরু মূলে
ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যাত্রা যায় ভুলে।

শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ যে গদ্য ছন্দে লেখনী ধরেছিলেন, সুকান্ত সেই ছন্দের বিস্ময়কর অন্তমিল রেখে ভাবে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে বুকের গভীরে গ্রহণ করেছেন।

আবার মলিন হাসি হেসে,
চলে নিরুদ্দেশে।
রজনীর অন্ধকারে একটি মলিন দীপ হাতে
কাদের সন্ধান করে উষ্ণ অশ্রুপাতে
কালের সমাধিতলে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন মৃত্যুদিন—সুকান্তকে নানাভাবে দোলা দেয়। জন্ম নেয় এমনি সব কবিতা।

যে ক্লাবঘরে সুকান্ত তার বিখ্যাত কবিতা 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'

পড়ে, সেই 'ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি'র লেকের ধারে বাংলো বাড়িটি যুদ্ধের সময় মিলিটারির প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ দখল করে। ক্লাবের যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এমন একটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যথিত হয় কবি সুকান্ত। লেখা হয় একটি কবিতা ওই ক্লাবের সদস্য 'শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে' 'ভারতীয় জীবনত্রাণ সমাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শোকোচ্ছ্বাস' এই শিরোনামে।

মনে পড়ে লেকের সেই পথ ?
মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা হাওয়ার চাবুক ?
অনেক উজ্জ্বল দৃশ্য এই লেকে
করেছিল উৎসাহিত বুক।

সমকালকে অনেকাংশে সত্যেন্দ্রীয় মানসিকতায় কিন্তু আধুনিক মননে ও মর্মবেদনায় গ্রহণ করতে সুকান্ত যে কত বলিষ্ঠ কবি, এখানে তারই বিম্বন।

কেরানী, বেকার, ছাত্র, অধ্যাপক, শিল্পী ও ডাক্তার
সকলের কাছে ছিল অবারিত দ্বার,
কাজের গহ্বর থেকে পাখিদের মতো এরা নীড়
সন্ধানে, সন্ধ্যায় ডেকে এনেছিল এইখানে ভিড়।
রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সিনেমার কথা ;
এদের রচনা থেকে প্রত্যহ স্খলিত হত অলক্ষ্যে অযথা ;
মাঝে মাঝে অনর্থক উচ্ছ্বসিত হাসি,
বাতাসে ছড়াত নিত্য শব্দ রাশি রাশি।

সুকান্তের কবিমনে যেমন ছিল আবেগদীপ্তি, তেমনি ছিল ব্যঙ্গের প্রচ্ছন্ন স্বভাব। আর সে ব্যঙ্গ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দলিত মানুষের মনের মধ্যে লালিত শাসককুলের প্রতিই খড়্গের মত ছিল উদ্যত।

তারপর অকস্মাৎ ভেঙে গেল রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা,
সহসা চৈতন্যোদয় ; প্রত্যেকের বুকে ফোটে ক্ষুব্ধ রক্তজবা ;
সমস্ত গানের শেষ যেন ভেসে গেল এক গানের আসর,
যেমন রাত্রির শেষ নিঃশেষে কাঙাল হয় বিবাহ বাসর।

'জীবন রক্ষক' এই সমাজের দারুণ অভাবে,
এদের 'জীবন রক্ষা' হয়তো কঠিন হবে,
হয়তো অনেক প্রাণ যাবে।

এই কবিতাটি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বগত' কবিতার প্যারডি-বিশেষ। রবীন্দ্র-প্রভাবিত পংক্তি দিয়েই কবিতাটির শুরু। যথার্থ প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজরূপের, সমাজপ্রাণের বিম্বন অর্থে সমকাল চেতনায় দীপ্ত এ কবিতা নয়, তবু সুকান্ত যে একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাময়িক অবলুপ্তিতে কবিহৃদয়ে গভীর ব্যথা বোধ করেছে, তার পরিচয় স্পষ্ট। এক কিশোর কবিকে তুচ্ছ ঘটনা তুচ্ছ বিষয়ও যে মহৎ কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করত সহজেই, এইরকম সব কবিতায় তার সাক্ষ্য মেলে। এখানেই সত্যেন্দ্রীয় মানসিকতার পরিচয়।

প্রত্যক্ষভাবে কলকাতায় বোমাবর্ষণের আগে পর্যন্ত সুকান্তর মনের ছিল দুটি দিক—মৃত্যু-চিন্তা, রবীন্দ্রচিন্তা। এই দুই রোমান্টিক অনুভাবনায় কিশোর কবি তাড়িত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনের সেই শোভাযাত্রা আর প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের সামনে নির্দ্বিধায় দাঁড়ানো—এমন দুই ঘটনার পরেই সুকান্তর কবি-ভাবনা ঋদ্ধ হয়, বড় গভীরভাবে, আপনতায় বাস্তব জীবন, মানুষের কাছাকাছি চলে আসে।

এর সংগে যুক্ত হয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক-ভাবনা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ, 'জনযুদ্ধে'-র কিশোর সভার পরিচালনাভার গ্রহণ, মানুষে-মিছিলে, অভাবে-অভিযোগে নিজেকে অক্লান্ত কর্মী, সংগঠক, দরদী, মানবতার ঘোষক করে তোলার অকৃত্রিম বাসনা।

সুকান্তর এই সময়ের কবিতা অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গধ্বনিতে, অবিরল শব্দমালায় উচ্চারিত, উতরোল সমুদ্রজলে পরিশীলিত। এক নতুন সুকান্তর কাব্যরচনা যেন জাগপ্রদীপ সামনে রেখে নির্ঘুম নিশিপালন।

নবম অধ্যায়

রাজনীতি জনগণ কর্মী কবি সুকান্ত

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আর কলকাতার বুকে জাপানী সৈন্যের ইতস্তত নির্বিচার বোমাবর্ষণ।

এই দুটি ঘটনা সুকান্তকে দিল গভীর শিক্ষা। দুই শিক্ষাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোত।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে সুকান্ত ভেসে চলেছিল বিপুল জনতার স্রোতে। এক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কবির মহাপ্রয়াণে আর এক অনুজতম কবির হয়তবা অন্তর্লোকে ছিল নতুন কাব্য প্রেরণা ও রচনার শপথ গ্রহণ। সে শপথ স্বগতোক্তির মত।

অন্যদিকে বোমাবর্ষণের ভয়াবহতা আনে আর এক অসহায়তা। ব্ল্যাক-আউটের রাত, ভয়াল গা-ছমছম অন্ধকারে এ. আর. পি. আর মিলিটারির দ্রুত ব্যস্ততার ছবি, বোমার আতঙ্ক, সাইরেনের যান্ত্রিক একটানা চীৎকার—এ সমস্তই সুকান্তর কবিসত্তার গভীরে আর এক নতুন জীবনবোধের উপকরণ জমা করে দেয়।

এবার সেই রাণীদির মৃত্যুর বিহ্বল বিস্ময়ে নয়, মায়ের মৃত্যুর কারণে অসহায় উৎকেন্দ্রিক জীবনাচারের শিক্ষায় নয়, যেনবা রবীন্দ্র-মৃত্যুদিনের চলমান জনতার শরীরের বিপুল স্পর্শের, জনজীবনের স্বেদ-রক্ত-শ্রমের ঘ্রাণের সঙ্গে এক শক্ত মন সুকান্তকে ঠেলে দেয় জনগণের মধ্যে।

সুকান্ত চলে আসে রাজনীতির সীমানায়।

তখন কলকাতায় মিছিল, শোভাযাত্রা, মানুষ-মানুষ—শুধু নানান স্বভাব-অভাবের 'ক্রসকারেন্টে' শহরবাসীর তথা সারা বাংলাদেশের মানুষের জীবনচেতনা জটিল, বিভ্রান্ত, বিহ্বল, কেন্দ্রাতিগ হয়ে বুঝিবা ভাগ্য তথা দুর্ভাগ্যের অদৃশ্যচক্রে আবর্তিত।

সুকান্তর রাজনীতির হাতেখড়ি হয় এমনি পরিবেশে। সময় উনিশ শ বিয়াল্লিশের গোড়ার দিক। সুকান্তর বয়স উজ্জ্বল তারুণ্যের সবল উদ্ধত স্বভাবে ষোলোয় পা দিয়ে দাঁড়ানো।

সুকান্ত অনেক পরিশ্রম, নিষ্ঠা, সততার সঙ্গে আন্তরিক কর্মীর ভূমিকার শেষে পায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীরূপে সদস্যপদ লাভের সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা ছিল বিশেষ জটিল তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে, দ্বিধাগ্রস্ততায়, দলগত আন্তর নীতিতে অস্থিত।

ইতিপূর্বে অনেক বিবিধ, বিচিত্র ঘটনার বেগের মুখে নানান প্রতিবেগ, ভারতের তৎকালীন রাজনীতির আবর্তে একের পর এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস!

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ। কিন্তু কংগ্রেসে তখন গান্ধীজি ও সুভাষচন্দ্রে তীব্রতম মতভেদ! তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র, কিন্তু গান্ধীজির নেতৃত্বের প্রচণ্ড বিরোধিতায় করেন পদত্যাগ। সঙ্গে সঙ্গে গঠন করেন নির্দিষ্ট কর্মসূচীবিহীন নতুন দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক'।

এর ফল—সুভাষচন্দ্র দল থেকে তিন বছরের জন্য সাসপেণ্ডেড!

উনিশ শ একচল্লিশের আঠারোই জানুয়ারী। কনকনে শীতের কলকাতা। ইংরেজ পুলিশ ও ঝানু গোয়েন্দারা হতবাক, অপ্রস্তুত, অসহায়। সুভাষচন্দ্রের ভারতের মাটি থেকে গভীর রাতে ছদ্মবেশে সংগোপনে অন্তর্ধান! কাবুল ও মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু মার্চ মাসে আসেন বার্লিনে। কিছুকাল পরেই ঘোষণা—সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে। শেষে জাপানে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণে উৎসুক।

এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। ভারতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী যেমন কমিউনিস্ট পার্টিকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলতে শুরু করে, তেমনি 'সোভিয়েতের দালাল' 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেয় সুভাষপন্থী বামগোষ্ঠীও। কারণ কমিউনিস্ট

পার্টিই ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছিল সোভিয়েত রাশিয়ার হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী যুদ্ধকে। ভারতের শাসক ইংরেজ তখন ছিল সোভিয়েতের পক্ষে, হিটলার-সুহৃদ জাপানীদের বিরুদ্ধে।

ফল—উনিশ শ চৌত্রিশ সালে ঘোষিত বেআইনী পার্টি 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'কে আবার উনিশ শ বিয়াল্লিশ সালের বাইশে জুলাই আইনী ঘোষণা করা হয়।

সুকান্তর রাজনীতির জীবনের শুরু এমন পর্বে, এমন তীব্র কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার পরিবেশে, এমন জটিল জনগণের ও জনমতের প্রেক্ষিতে।

কিন্তু এতদিন বেআইনী থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টি দেশের মধ্যে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ করে যায় সুসংগঠিতভাবে। সংগঠিত হয় বিরাট বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, প্রগতি লেখক-শিল্পী আন্দোলন, ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। এসবের পুরোভাগে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু সহজপথে এমন সংগঠন হয়নি। সম্মুখীন হতে হয় তীব্র ঘৃণার, তথাকথিত 'বিশ্বাসঘাতক দল' —এমন সব অভিধার, কুৎসার, অত্যাচারের।

এরই স্রোতে কিশোর কবি সুকান্ত শোনে তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডের খবর।

উনিশ শ বিয়াল্লিশের আটই মার্চ। উত্তাল ঢাকা শহর। এখানে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সম্মেলনের বিশাল আয়োজন। সম্মেলনে শুধু পূর্ববঙ্গ নয়, সারা বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ উপস্থিত।

এমন সম্মেলনের উদ্দেশে ই. বি. রেলওয়ের শ্রমিকদের একটি মিছিলের পরিচালক ছিলেন তরুণ শ্রমিক নেতা ও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সোমেন চন্দ।

ফ্যাসীবাদী মতের সমর্থকরা আকস্মিকভাবে সোমেন চন্দের নিষ্ঠুর হত্যার রক্তে হাত কলঙ্কিত করে। আর সেদিনই ফ্যাসীবাদী জাপানের আক্রমণের কঠিন মুখে প'ড়ে রেঙ্গুনের অসহায় পতন।

রক্ত-কলঙ্কিত ফ্যাসীবাদের দুইরূপ—এক ব্যক্তি হত্যা, দুই, ছলে বলে, নীতিহীনভাবে রাজ্য জয়।

বিয়াল্লিশের আঠাশে মার্চ। কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল। গভীর বিষণ্ণতায় থমথমে। সোমেন চন্দের মৃত্যু উপলক্ষে সভা। সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। গড়া হয়—ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।

তরুণ শিল্পী-হত্যাকে স্মরণ করে সুকান্ত লিখল 'ছুরি' কবিতা।

বিগত শেষ সংশয় ; স্বপ্ন ক্রমে ছিন্ন,
আচ্ছাদন উন্মোচন করেছে যত ঘৃণ্য,
শংকাকুল শিল্পীপ্রাণ, শংকাকুল কৃষ্টি,
দুর্দিনের অন্ধকারে ক্রমশ খোলে দৃষ্টি।

শিল্পীদের অসহায় অবস্থায়, বিদেশী চরের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণায়, তাচ্ছিল্যে কবিকণ্ঠ হয় সোচ্চার—

হত্যা চলে শিল্পীদের, শিল্প আক্রান্ত
দেশকে যারা অস্ত্র হানে, তারা তো নয় ভ্রান্ত,
বিদেশী চর ছুরিকা তোলে দেশের হৃদ-বৃন্তে
সংস্কৃতির শত্রুদের পেরেছি তাই চিনতে।
শিল্পীদের রক্তস্রোতে এসেছে চৈতন্য
গুপ্তঘাতী শত্রুদের করি না আজ গণ্য।

ষোলো বছর বয়সের কবি তখন সবেমাত্র রাজনীতিকে চিনতে শিখছে। রাজনীতির শিক্ষা শুরুতেই সাম্যবাদের শিক্ষা। একমাত্র রাশিয়া তখন সারা বিশ্বে প্রকৃত অর্থে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাষ্ট্র। এই শিক্ষায় কিশোর কবি নবীন ছাত্রের মত। সোমেন চন্দের মৃত্যু-ভাবনা সুকান্তকে জনজাগরণের বৃহৎ কর্মদীক্ষায় প্রাণিত করে।

বাঁচার দেশ, আমার দেশ, হানবো প্রতিপক্ষ,
এ জনতার অন্ধচোখে আনবো দৃঢ় লক্ষ্য।

বাইরে নয় ঘরেও আজ মৃত্যু ঢালে বৈরী
এদেশে জন-বাহিনী তাই নিমেষে হয় তৈরী।

কলকাতায় সুকান্ত তখন জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের ফ্যাসী-বাদী শক্তির দোসর জাপান তখন বাংলাদেশ তথা কলকাতার উপান্তে ভয়ংকর উৎকট ভয়ের বেশে উপস্থিত।

এই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে একটি শ্লোগান ছিল—'জাপান এলে রুখতে হবে'। এই শ্লোগানের সূত্রেই সুকান্ত অক্লান্ত কর্মীরূপে যুক্ত হয়ে যায় কিছু বেসরকারী জনকল্যাণমূলক কাজে। একদিকে এ. আর. পি-র তৎপরতা, আর একদিকে বেসরকারী জনসেবার কর্মপ্রয়াস।

সুকান্ত হয় কর্মী—বেসরকারী জনসেবায় শুরু করে জনসংগঠনের কাজ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে কাজ। সুকান্ত এবার প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সক্রিয় কর্মী।

কর্মী সুকান্ত পরের পর্যায়ের মানুষ, আগে কবি। শিশুকাল থেকে বালক স্তর পেরিয়ে কিশোর পর্বে আসা পর্যন্ত সুকান্ত ছিল নিঃসঙ্গ মনে কবিই। কবিতা লেখা সে থামায়নি। মুখে মুখে ছড়া, দেওয়ালের অপটু হাতের অক্ষরের লিখনে কাঁচা হাতের কবিতা, খাতার পাতায় গোপনে লিখে রাখা কবিতা।

বয়স কাঁচা, বোধ-বুদ্ধি কাঁচা, অভিজ্ঞতাও কাঁচা বয়সের। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা গভীর গোপন কবিপ্রাণ সমস্ত কিছুতে ছিল অন্তঃশীল। সুকান্ত সঙ্গ নিঃসঙ্গ—দুই অবস্থাতেই কবিপ্রাণ নিয়ে সচল, সরব। সুকান্ত জীবনচর্যায় সব্যসাচী অর্জুন, স্বভাবে যুধিষ্ঠির, বিদ্রোহ-বিপ্লবে ভীম, কিন্তু কবি-স্বভাবে কর্ণ! সঙ্গে তার কবচকুণ্ডল। তার সব সময়ের চালক সেই মানবতাবোধ ব্রহ্মা সর্বকালীন, বিশ্বরক্ষক বিষ্ণুর আর এক রূপ কৃষ্ণের মত।

তাই রাজনীতিতে সুকান্ত আসে কবির বেশে সেই কবচকুণ্ডল নিয়ে! মৃত্যুর সময় সেই কবচকুণ্ডল দান করে যায় গোঁড়া, রূঢ় নিষ্ঠুর, অথচ সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতীক-প্রতিম সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধের হাতে, যে হাত পবিত্র ঈশ্বরের, সর্বকালিক মানব্যের! কবি হয় কর্মী, সংগঠক।

কিন্তু কর্ম ও সংগঠন তাকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরলেও সমস্ত কাজের মধ্যে, সমস্ত কাজের শেষে যখন সবাই বিশ্রামে বিলাসে নিমগ্ন, তখনো সেই কবি সুকান্ত অন্ধকার পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কি কারণে?

জনতার সঙ্গে কবিতাকে মেলাবার জন্যে?

শহর কলকাতার অন্ধকারের মধ্যে আলোর পিপাসাকে আকণ্ঠ করার জন্যে?

রুদ্ধশ্বাস, বোমাভয়ে ভীত, বিহ্বল আতঙ্কিত শহর ও গ্রামজীবনের মানুষের মানবিক হৃদয়ের সেইসব শব্দ, আর্তি শোনানোর জন্যে?

ঠিক তাই।

'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী, ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন।' এর পরেও সুকান্তর কাজ কবি সুকান্তর আত্মমগ্ন একক কাব্য চর্চা। পাকা ব্যবসাদারের মত গভীর রাতে গভীর নিবিষ্ট থেকে আত্মিক সমস্ত হিসেবনিকেশের!

সুকান্ত কর্মী, সংগঠক, কবিও। একা কবিতা রচনার মধ্যে, সে তার কবিতার মধ্যে জনগণের সমস্ত জাগতিক সুখ-দুঃখ চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলাতে মেলাতে কোন্ এক তূরীয়, অসীম, অনন্ত অলোক-পথে ভ্রমণ করত। সে ভ্রমণ কবির ভ্রমণ। সে ভ্রমণ সমস্ত প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের, পরিচিত-অপরিচিত সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে।

এখানেই সুকান্ত কবি। সমস্ত রকম দুঃখের, রাবণের চিতার মত জ্বলন্ত দুঃখের অবিরল অশ্রু বর্ষণের মধ্যেও শৈল্পিক আনন্দের কবি।

এ আনন্দ কলাকৈবল্যবাদীর আনন্দ নয়, সমস্ত জাগতিক অন্যায়-অবিচারের সংগে ওতপ্রোত থেকে, সমস্ত মানবিক সম্পর্কেই রক্ত মাংস মজ্জা থেকে প্রাণ আত্মায় সম্পৃক্ত করা কবির আনন্দ।

সুকান্ত তাই চিরকালের কবি, চিরকালের আনন্দের পথিক। সে রানার।

> রানার চলেছে, রানার।
> রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার।

দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।

এমন চিরকালের কবিসত্তা ছিল বলেই রাজনীতি তাকে গ্রহণ করলেও গ্রাস করতে পারে নি, তার কবিসত্তাকে আবৃত, আহত করেনি। রাজনীতি বরং উজ্জ্বল, নতুন এক অভিধায়, ক্ষমতায় চিহ্নিত করে রেখে গেছে তাকে। রাজনীতিই দিয়েছে তার কবি-জীবনের ও কাব্যের নতুন পথ, নব মূল্যায়ন। মানুষ, মানুষের জীবনের চতুর্দিক —এমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতায় সে ওতপ্রোত হয়েছে যে তার কবিতায়, তার মূল প্রেরণায় এই রাজনীতিই।

সুকান্তর অগ্রজ কবি, যিনি একদা সুকান্তর কবি-ক্ষমতার সর্বপ্রথম বাইরের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে আপন করেছিলেন, সেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি সুকান্ত ও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী সুকান্তর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন 'সুকান্ত সমগ্রে'র ভূমিকায়ঃ

'কিশোর বাহিনীর আন্দোলনে সুকান্তকে টেনে এনেছিল তখনকার ছাত্রনেতা এবং আমাদের বন্ধু অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য। রাজনীতিতে শুকনো ভাব তখন অনেকখানি কেটে গিয়ে নাচ গান নাটক আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বেশ একটা রসকষ এসেছে। কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের যেমন রাজনীতিতে ঢুকতে হয়েছিল, সুকান্তর বেলায় তা হয়নি। সুকান্তর সাহিত্যিক গুণগুলোকে আন্দোলনে কাজে লাগানোর ব্যাপারে অন্নদারও যথেষ্ট হাত যশ ছিল। সুকান্তর আগের যুগের লোক বলে আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে, আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সংগে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোন দ্বিধা ছিল না।······

'সুকান্ত মুখে যাই বলুক, আসলে সে শুধু পার্টির কর্মীদের জন্যেই লেখেনি। যে নতুন শক্তি সমাজে সেদিন মাথা তুলেছিল, সুকান্ত তার বুকে সাহস, চোখে অন্তর্দৃষ্টি আর কণ্ঠে ভাষা জুগিয়েছিল।···

'সুকান্তর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের তোলাতুলি বা কোলা

কুলির সম্পর্ক ছিল না—এটা না বোঝার জন্যেই একদল কবির মধ্যে এক সময় রাজনীতি থেকে আশাভঙ্গজনিত পালাও রব উঠেছিল।……

'ভুল হয়েছিল বুঝতে। সুকান্ত রাজনীতির কাঁধে চড়েনি। রাজনীতিকে নিজের করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও সুকান্তকে দিয়েছে তাই সানন্দ স্বীকৃতি। নিজেকে নিঃশর্তে জীবনের হাতে সঁপে দেওয়াতেই স্বতোৎসারিত হতে পেরেছিল সুকান্তর কবিতা।…

'সুকান্তর কবিতা সুকান্তকে ছাড়া আর কাউকেই মানাবে না।'

কবি ও রাজনৈতিক কর্মী সুকান্ত সম্পর্কে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এমন মূল্যায়ন অত্যন্ত মূল্যবান।

নিজের কবিতা সম্পর্কে সেই রাজনৈতিক কর্মী ও কিশোর কবির নিজের বক্তব্যই বা কি ?

'আমার কবিতা পড়ে পার্টির কর্মীরা যদি খুশি হয়, তা হলেই আমি খুশি—কেননা এই দলবলই তো বাড়তে বাড়তে একদিন এদেশের অধিকাংশ হবে।'

সুকান্ত তখনো অসুস্থ হয়ে পড়েনি। ওয়েলিংটন স্কয়ারে এক সভা। সুকান্ত চলেছে। সঙ্গে অগ্রজ কবি সমধর্মের রাজনৈতিক কর্মী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এককথায় তিনিও এক বর্ষীয়ান পার্টি-কর্মী তখন। নিজের কবিতা সম্পর্কে এমন উক্তিটি করে সুকান্ত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই এক প্রশ্নের উত্তরে। অগ্রজ কবির প্রশ্নে ছিল সুকান্তর কবিতা সম্পর্কে তাঁর সংশয়-সমন্বিত এক জিজ্ঞাসা।

সুকান্তর জীবন, সুকান্তর রাজনৈতিক দল, সুকান্তর কবিতা। এই তিনের এমন গভীর আত্মিক সম্পর্ক অন্য কোন খ্যাতনামা বাঙালী কবির কাব্যে আছে কিনা জানি না, তবে সুকান্ত এই অর্থে মহত্তম কবি।

সুকান্তর রাজনীতি গোড়া থেকেই সাম্যবাদী রাজনীতি। সাম্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা 'লেনিন'-কে কবি-কিশোর শ্রেয় ও প্রেয় করেছে রাজনীতির শুরু থেকেই। 'লেনিন' কবিতা রচনার প্রেরণা নিশ্চয়ই তার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও রাজনীতিজ্ঞানের গভীরতার দ্যোতক।

শুধু 'লেনিন' কবিতায় শুধুমাত্র কমরেড লেনিনই নেই, আছে লেনিন স্মরণে নিজ দেশ ভারতবর্ষের সমসময়বর্তী চিত্রপট এবং সুকান্তর সাম্যবাদ তথা তার উজ্জ্বলতম প্রতীক লেনিনের সঙ্গে অদ্ভুত একাত্মতার কাব্যিক স্বীকারোক্তি।

'লেনিন'-এর মত এমন একটি উজ্জ্বল কবিতা রচনার মানসপট কবির পক্ষে কি হতে পারে?

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পর সাম্যবাদী অভিজ্ঞতায় সুকান্ত তখন অনেকাংশে ঋদ্ধ। কলকাতা তথা সারা ভারতের ধনিক শ্রেণীর অন্ধকার রাতের বুকে শকুনি-গৃধিনীর তৎপরতা, সারা বিশ্বে তখন সোভিয়েট রাশিয়ার ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আক্রমণ প্রবল। প্রবলতর, প্রবলতম হয়ে উঠেছে শত্রুজয়ের জন্য দুর্বার গতি।

> বিদ্যুৎ ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
> ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,
> বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ,
> —আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

কলকাতা শুধু নিরন্নের নগরী নয়, দুর্ভিক্ষের নগরী নয়, প্রতিবাদী সোচ্চার-কণ্ঠ মিছিলে দীপ্ত, রক্তাক্ত নগরী। বিদ্রোহ, অসহযোগ তখন দিকে দিকে। একদিকে অসহায়, নিরন্ন জনতার পড়ে পড়ে মার খাওয়া, অন্নের জন্যে আত্মবিক্রয়, আর একদিকে পঙ্কে প্রস্ফুটিত উজ্জ্বল সূর্যমুখী পদ্মের মত জ্বলন্ত বিদ্রোহ, বিপ্লবের ধ্বনি।

> সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
> কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার চোখে মুখে চিহ্নিত মরণ।
> বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
> দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিত অগ্ন্যুৎপাত হানে।

লেনিন তো শুধুমাত্র সাম্যবাদী রাশিয়ার নয়, লেনিন কথার অর্থও যে অন্য হয়ে গেছে! লেনিন মানেই বিপ্লব, মানেই হাজার দলিত কণ্ঠের জনসমুদ্র! লেনিন মানেই সযত্ন মুখোশধারী ধনিক শ্রেণীর বিভীষিকা, তাদের সু-চিহ্নিত মরণ! আগ্নেয়গিরির মত অগ্নি আর

শক্তি নিয়ে লেনিন যে সর্বত্র! কবির আবেগ-স্পন্দিত কণ্ঠে তারই সর্বাবয়ব স্বীকৃতি—

দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা,
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।

সাল উনিশ শ একচল্লিশ থেকে উনিশ শ চুয়াল্লিশ। মুক্তিযুদ্ধের প্রবল জোয়ার সারা বিশ্বে। সুকান্ত তখন অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন। কাজে-কর্মে, মিছিলে-মিটিঙে সুকান্ত তার প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার। এই অবস্থায় লেখা কবিতায় তার পরিচয় থাকবেই। কলকাতা তথা ভারত তাই 'লেনিন' কবিতায় সচিত্র।

অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভৎর্সনাক্রান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন!

'লেনিন' কবিতার এই অংশের পর সিদ্ধান্ত অংশ কবির শিল্পী-আত্মার নিজস্ব। 'লেনিন' কবিতাটি লেখার পিছনে সে সময়ের কলকাতা, সারা ভারত তথা সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবেশ, যুদ্ধ, ভারতের মন্বন্তর, মহামারী, অজস্র মিছিল, বিপ্লব, ধর্মঘট সবই সক্রিয় থেকেছে। শেষে লেনিনের সঙ্গে কবি সুকান্তর একাত্মতা!

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে পালে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও রাজনৈতিক চেতনা থেকেই এমন একটি অ-রাজনৈতিক বলিষ্ঠ কবিতার জন্ম হয়েছে সুকান্তর লেখনীতে।

উনিশ শ চল্লিশ সাল। বহির্বিশ্বে যুদ্ধ চলেছে তীব্র বেগে। ভারত তথা কলকাতায় তার ঢেউ রেডিওর খবরে, দৈনিক কাগজের পাতায়, দেশীয় আন্দোলনে, মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মুখে মুখে তার পরিচয়। পরিচয় কলকাতা তথা বাংলাদেশের সমস্ত সন্ত্রাসগ্রস্ত মানুষের মুখাবয়বে। হিটলারী আক্রমণ ও আগ্রাসন ছিল নির্বিচারে অপরের দেশ জয় করা। এমন অ-মানবিক, নীতিহীন দেশজয়ের প্রামাণ্য দলিল ছিল সে সময়ের বিশ্বপটে সংঘটিত হওয়া একের পর এক ঘটনা।

সুকান্তর তখন বয়স কতই বা? চোদ্দ বছর। রাজনীতিতে তখনো সে আসেনি। শুধু সব কিছুর দ্রষ্টা এক মুগ্ধ কিশোর। এবং কবি সুকান্তর বিদেশের পরাধীন রাষ্ট্রগুলির কথা জানা, নাৎসী আক্রমণে বিধ্বস্ত স্বদেশীয় অধিকার-বঞ্চিত রাষ্ট্রগুলির জন্য সহজ দুঃখবোধ থেকে জাগে স্বদেশ-ভূমির জন্যে ভাবনা।

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।

পরাধীনতার অপমান, স্বদেশভূমির ক্ষোভ, অন্নহীনের অসহায়তা যে কোন দেশপ্রেমিকের মত সুকান্তর বিস্ময়-মুগ্ধ মনেও জাগায় ক্রোধ, আনে প্রতিবাদ। মৃত্যুর কথা এখানেও কবিকে ধরে রাখে—

অবাক পৃথিবী! অবাক যে বার বার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।

*   *   *

এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম তোমাকে সেলাম।

উনিশ শ ছেচল্লিশ সাল। তখন যুদ্ধ শেষ। পড়ে আছে বিধ্বস্ত মানবতার বহু তলানি। মানুষের পক্ষে যুদ্ধ যে 'জননীর গর্ভের লজ্জা'র

মত, তা বোধগম্য হওয়ার মত অবস্থা, পরিবেশ, সত্যরূপ এই সালেই কবির কাছে প্রকট।

উনত্রিশে জুলাই, উনিশ শ ছেচল্লিশ সাল। সারা ভারত ডাক-তার ধর্মঘট। সারা বাংলা বন্‌ধ্‌। এমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের শরিক ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস, গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তখনকার অল ইণ্ডিয়া রেডিও সেণ্টারেও শিল্পীরা করেন ধর্মঘট। এমন ধর্মঘট সুকান্তর কবিহৃদয় কাঁপিয়ে দেয়।

শুধু এমন ধর্মঘট নয়, এর আগে গণ আন্দোলনের অন্যতম অংশ-গ্রহণকারী শহীদ রামেশ্বর, আবদুস সালাম ইত্যাদির সমান্তরাল কলকাতার আন্দোলনে ছাত্রদের পথযুদ্ধে সামিল ছিল সুকান্ত। একের পর এক গণআন্দোলনে সুকান্ত প্রত্যক্ষকর্মী, সংগঠক। মিছিলের কান্না-ঘাম-রক্ত—সমস্ত কিছুর সংগে তার যোগ।

ব্যস্ত সুকান্ত বিশাল সমুদ্রের মত বিদ্রোহীর কলকণ্ঠ বুকের গভীরে লালন করতে করতে বলে উঠে,—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলরব?

এ প্রশ্ন কাকে করেছে সুকান্ত? নিজের হৃদয়ের দর্পণে দেখা কোটি কোটি সুকান্তকে।

সুকান্তর এই 'অনুভব' কবিতা বুঝি সমকালের উল্লেখযোগ্য দলিল।

নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;

সুকান্ত যথার্থ অর্থেই একজন কমিউনিস্ট। জনতার মধ্যে, জনতার পিছনে-সামনে, সমস্ত দিক থেকে তাদের সঙ্গে থাকার এক সাম্যবাদীর মানসিকতাকে কাব্যরূপ দিয়ে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত—

তাদেরি দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরি মধ্যে আমিও যে মরি বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে।

সুকান্ত কবিতায় বলেছে ধর্মঘট, বিদ্রোহ, বিপ্লবের কথা। এসব তার কেতাবী শিক্ষার শব্দ নয়, তার জীবনচর্যা থেকে উঠে-আসা শব্দ-ব্রহ্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর 'অনুভব', 'পয়লা মে'র কবিতা: ১৯৪৬', 'দিন বদলের পালা', 'বিক্ষোভ', 'প্রস্তুত'. 'ইউরোপের উদ্দেশে', 'খবর' ইত্যাদি কবিতা লেখা।

কি এমন রাজনৈতিক তৎপরতা যার থেকে রচিত হয় এমন সব বিখ্যাত কবিতা? দেখা দেয় এমন পরিণত কবিচেতনার সার্বিক উদ্ভাস?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান। ইয়ালটা সম্মেলনে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সর্বাবয়ব স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত। ফ্যাসিবাদের কবর রচনা। ধনতন্ত্রের ওপর তীব্রতম আঘাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজবাদ ও সাম্যবাদে প্রাণিত বিশ্বের রাষ্ট্র ও মানুষ। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশে তুমুল বিক্ষোভের জোয়ার।

বহির্বিশ্বের এমন পরিবেশ ভারতেও নবচেতনার জোয়ার আনে। হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামে স্বাধীনতা ঘোষণা, ইংলণ্ডের নির্বাচনে লেবার পার্টির জয় এবং সারা বিশ্বের অজস্র মানব্য-মুখীন আন্দোলন ভারতের মানুষকে দেয় শক্তি, আশা, সান্ত্বনা, সাহস।

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেশে প্রত্যাবর্তন ঘটে। কিন্তু তারা তখন ব্রিটিশের কাছে বিচারের সম্মুখীন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সারা ভারতে চরমরূপে চিহ্নিত।

নভেম্বরের শুরু। উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সাল।

সমস্ত স্তরের বন্দীমুক্তি ও নেতাজী-সৃষ্ট সৈন্যদের বিচারের বিরুদ্ধে উত্তাল ছাত্র জনতা। দিনের পর দিন প্রায় একটানা ছাত্র ধর্মঘট।

একুশে নভেম্বর, উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ।

ওয়েলিংটন স্কয়ারের কাছে পুলিশ বাধা দেয় ছাত্র-মিছিলকে। উত্তপ্ত তেলের কড়ায় জল। ফেটে পড়ে ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলি নির্বিচারে। ছাত্রনেতা রামেশ্বর হলো শহীদ। ছাত্ররা নির্ভীক। বাইশে নভেম্বরে তিন লক্ষ লোকের দৃপ্ত মিছিল। এই মিছিল শুধু মানুষের নয়, ধর্মঘটের, বিক্ষোভের। এর প্রবাহ এসে থামে ছেচল্লিশ সালের বিমানবাহিনীর ধর্মঘটে, পরে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহে, বাইশে ফেব্রুয়ারীর সাধারণ ধর্মঘটে। সে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। রাস্তায় মানুষ ও বৃটিশ সেনাদলে যুদ্ধ।

কলকাতার রাস্তাতেও এই চিত্র। প্রতিবাদ দিবসের মাধ্যমে নৌ-দিবস এবং রসিদ আলি দিবস পালন। সেদিনও আর এক শহীদের রক্তাক্ষরে নাম লেখা হয়—আবদুল সালাম। কলকাতার সমস্ত দিকে বৃটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে পথযুদ্ধে জড়িত হয়ে যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ, শ্রমিক।

এমন অগ্নিগর্ভ ঘটনাগুলির শুধু দ্রষ্টা ছিল না সুকান্ত, ছিল অন্যতম আত্মপ্রাণিত উদ্যোক্তাও। উদ্যোক্তাই হয়েছে স্রষ্টা। 'অনুভব' এবং আরও অন্যান্য কবিতায় যে বিদ্রোহের কথা, চিত্র আঁকা আছে, তার উৎস, প্রেরণা এমন প্রতিক্রিয়া থেকেই।

'রসিদ আলি দিবস' উপলক্ষে রচিত সুকান্তর 'একুশে নভেম্বর: ১৯৪৬'-কবিতাটির জন্মসময় ও প্রেরণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণে মোহিতমোহন আইচ্ লিখছেন,—'নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে সুকান্তর একটি বজ্র কঠিন প্রত্যয় ছিল। একটা ঘটনা। কবিতার জন্য ছুটে যেতাম সুকান্তর কাছে। কারণ ইতিমধ্যেই কবিতা আবৃত্তি করে নাম করেছি। সুকান্তর কানে পৌঁছে গিয়েছিল আমার এই সার্থক আবৃত্তির খবর। 'আমাকে দিয়ে রঙ্‌মহলে আবৃত্তি করানোর জন্য লেখা হল '২১শে

নভেম্বর' কবিতাটি। এই কবিতার ছন্দ নিয়েই তর্ক উঠেছিল···বুদ্ধদেব বসু আলোচ্য কবিতার শেষের ছ'টি চরণ scan করে ছন্দের সঠিকতা প্রমাণ করেন। কিন্তু আমি যেহেতু ওর অনুমতি না নিয়েই (সংশোধিত শেষের চরণ ছুটি সহ) আবৃত্তি করে এলাম, সুকান্ত তার জন্য ক্রোধে ফেটে পড়ল। বুঝতে দেরী হল না, সুকান্ত তার বিচরণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র হয়েই চলাফেরা করে।' কিন্তু এই কবিতার উৎসমুখ চিহ্নিত আছে কবির সেই অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহী আত্মার কেন্দ্রেই !

তাই সেই একই প্রতিক্রিয়ায় সুকান্ত 'একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬'-এ বলে ওঠে সরবে—

আবার এবার দুর্বার সেই একুশে নভেম্বর—
আকাশের কোণে বিদ্যুৎ হেনে তুলে দিয়ে গেল
মৃত্যু কাঁপানো ঝড়।
আবার এদেশে মাঠে, ময়দানে
সুদূর গ্রামেও জনতার প্রাণে
হাসানাবাদের ইঙ্গিত হানে
প্রত্যাঘাতের স্বপ্ন ভয়ংকর।
আবার এসেছে অবাধ্য এক একুশে নভেম্বর।

সমকালীন ইতিহাস, রাজনীতি-সচেতনা ও জাগ্রত যুবজনতার অন্যায়ের মোকাবিলার জঙ্গী মনোভাব—এসব থেকেই জন্ম নেয় কবির কাব্যময় প্রতিভাষণ !

পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল
ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম, উত্তাল :
বার বার জিতে, জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে—
বিদেশী ! তোদের যাত্ব দণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।
শোন্ রে বিদেশী, শোন্,
আবার এসেছে লড়াই জেতার চরম শুভক্ষণ !

কবি সুকান্ত নির্ভীক, সবসময়েই আপোষহীন ! কবিতায় তা-ই দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধে ফেটে প'ড়ে ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ—

আবার আসছে তেরোই ফেব্রুয়ারি,
দাঁত দাঁত চেপে
হাতে হাত চেপে
উদ্যত সারি সারি,
কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি ?

সুকান্ত তার অসুস্থ জীবনের মধ্যে বাঁচায় ছিল আগ্রহী, আশাবাদী, কবিতার বিষয়েও তা-ই। নৈরাশ্য তাকে ক্লান্ত করেনি, কোনভাবেই থামাতে পারেনি। এই মানসিকতার জন্যই কবির শেষ কথাটি—

পতাকায় পতাকায় ফের মিল আনবে ফেব্রুয়ারী।
এ নভেম্বরে সংকেত পাই তারি ॥

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা, সুকান্তর কবিতায় তাই হয়ে ওঠে নামাবলী। সুকান্তর কবিতা সমকালের ইতিহাস, চিরকালের ইতিহাস। সমকাল তার বাইরে আঁকা, ভিতরে মানবতার বাণী—চিরকালের। যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য যে মানবতার কথা বলেছেন তারই রক্তক্ষয়ী বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় সুকান্তর সমকালে বাংলাদেশে তথা কলকাতার বুকে। সুকান্ত তারই লোকমানত-কবি।

'দিনবদলের পালা' সুকান্ত লিখতে বসে যুদ্ধ-শেষের পরে। নিশ্চয়ই উনিশ শ ছেচল্লিশ সাল। এখানেও সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া প্রশ্নের চকিত শব্দে ধরা পড়ে—

আর এক যুদ্ধ শেষ,
পৃথিবীতে তবু কিছু জিজ্ঞাসা উন্মুখ।
উদ্দাম ঢাকের শব্দে
সে প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?

প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে কবি শুধুমাত্র প্রহর গণনায় স্থিত—

এখানে অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা-উৎকীর্ণ চারিদিক,
গঙ্গায় প্লাবন নেই, হিমালয় ধৈর্যের প্রতীক ;
এ সুযোগে খুলে দাও ক্রূর শাসনের প্রদর্শনী,
আমরা প্রহর শুধু গনি।

উত্তর তো সুকান্তর তৈরী। এক যুদ্ধ শেষ আর এক যুদ্ধ নতুন রূপে সামনে আগত। একটি যুদ্ধ রাজ্যজয়ের আর একটি যুদ্ধ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সর্বকালের মানুষের হৃদয়জয়ের অপেক্ষায়! এই অপেক্ষা শুধু দিন বদলের ক্ষণটির জন্যই—

পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের রক্ত ঢালা:
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য এ জয় মালা;
জানো না এখানে যুদ্ধ—শুধু দিনবদলের পালা॥

উনিশ শ ছেচল্লিশের এগারোই সেপ্টেম্বর। সময় সন্ধ্যা।

উত্তর কলকাতার 'উত্তরা' সিনেমা হলে তৎকালীন কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দী নায়কদের মুক্তি উপলক্ষে এক বিরাট অনুষ্ঠানের সূচনা। জুলাই মাসের প্রবল আন্দোলনের পর আন্দামানে বৃটিশ কারাবাসে বন্দী জীবন কাটিয়ে প্রায় সমস্ত বিপ্লবী এসেছেন কলকাতায়। যোগ দিয়েছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

সুকান্ত তখন হাসপাতালের শয্যায় দীর্ঘ রোগ-ভোগে শায়িত। সেদিনের এমন একটি উজ্জ্বল উদাত্ত দেশপ্রেমের উদ্বোধক-অনুষ্ঠানে অভিনন্দনপত্র পাঠের কোন ব্যবস্থা নেই।

আছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'মুক্তবীরদের প্রতি' কবিতাটি!

তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর। অবাক অভ্যুদয়।
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দেখ আজ রক্তে রক্তে সাড়া
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয় হারা।

সুকান্ত যেমন আত্মসচেতন, সেই সঙ্গে আবার সতীর্থ-সচেতনাও প্রবলতম তার। এই সচেতনা স্বতঃস্ফূর্ত মানবতারই অঙ্গীভূত।

আমরা এসেছি চারিদিক থেকে, ভুলতে কখনো পারি।
এক সূত্রে যে বাঁধা হয়ে গেছে কবে কোন্ যুগে নাড়ী।
আমরা যে বারে বারে
তোমাদের কথা পৌঁছে দিয়েছি এদেশের দ্বারে দ্বারে;

কলকাতার মানুষ সুকান্ত। বিপ্লবী, বীর, মুক্ত বন্দীদের সঙ্গে কলকাতার উত্থিত, উদ্ধত জীবনকে সমন্বিত করে কবির যেন শপথ—

মিছিলে মিছিলে সভায় সভায় উদাত্ত আহ্বানে,
তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছি জনতার উত্থানে।

সুকান্ত জানে, তার বিপ্লবী অনুভূতি দিয়েই বোঝে বিগত জুলাইয়ের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা। শুনেছে, সেই সব বীর আন্দামানের কারাবাসের জীবন থেকে মুক্ত হয়ে আসছেন কলকাতায়। তাকে খবর দেওয়া হয় এমন একটি অনুষ্ঠানের—যেখানে এই সব বীর দেশবন্ধুদের দেওয়া হবে উষ্ণ হার্দ্য অভিনন্দন।

সুকান্তকে নিমন্ত্রণের প্রশ্ন ওঠে না। পার্টি-কমরেড হিসেবে তার অনেক আগে থেকেই আসবার কথা। কিন্তু সে যে দীর্ঘ বাইশ দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালে!

অথচ বিপ্লবী বীরদের আন্তরিক বিপ্লবী অভিনন্দন জানাবার মত কবির শৈল্পিক দায়িত্ব অত্যন্ত প্রখর ছিল বলেই এগারোই সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানের কথা ভেবে, প্রায় অভিনন্দন পত্রের মতনই রচনা করে 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতাটি। কবির বার্তা অভিনন্দনের মর্যাদায় সেই অনুষ্ঠানে পড়া হয়।

এ অভিনন্দন গতানুগতিক নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের গল্পের গোলাপ কাঁটায় বিদ্ধ, যন্ত্রণাকাতর অথচ গোপন শপথে দীপ্ত সেই পাখির হৃদয়ের লাল রক্তের মত।

কবি কিন্তু অভিনন্দনের উত্তরে অব্যবহিত অতীত কলকাতাকে বিপ্লবী বীরদের যথাযথ স্মরণ করাতে বিস্মৃত হয়নি আদৌ।

গৃহ যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে
ডেকেছে এখানে কালো রক্তের বান;
সেদিনের কলকাতা এ আঘাতে ভেঙে চুরে খান্ খান্।
দিকে দিকে আজ বিদেশী প্রহরী, সঙ্গিন উদ্যত;
তোমরা এসেছ বীরের মতন, আমরা চোরের মতো।

আত্ম-সমালোচনা? বোধ হয় তাই! গৃহযুদ্ধের কলঙ্কে সমস্ত

মানবিক অনুভবের ওপর কালিমা লেপনে যে আমরা পাপী, নিদারুণ লজ্জায় পর্যুদস্ত, আত্ম-অপমানে গভীর বিমর্ষ, সুকান্তর বীরবরণের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা-উপহারে তা বুঝিবা অন্তরতম অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তে অন্তর্গূঢ়।

কিন্তু কবি ভেঙে পড়েনি। আবেগে বাসনাকে সোচ্চার করে বলে ওঠে,

> তোমরা এসেছ, ভেঙেছ অন্ধকার—
> তোমরা এসেছ, ভয় করি নাকো আর

কবিতাটিতে পৌরাণিক বীর কর্ণের মত কবির বীরোচিত কম্বুকণ্ঠের সিদ্ধান্ত,

> তোমাদের পথ যদিও কুয়াশাময়,
> উদ্দাম জয়যাত্রার পথে জেনো ও কিছুই
> তোমরা রয়েছ, আমরা রয়েছি, দুর্জয় দুর্বার,
> পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার।

কবিতার শেষে কবির প্রত্যয়ের অন্তঃশীল ধূমার মত, রক্তকণিকার মত অবধারিত শপথের কণ্ঠ—

> আবার জ্বালাব বাতি,
> হাজার সেলাম তাই নাও আজ শেষ যুদ্ধের সাথী॥

এই হল কবির দূর থেকে বিপ্লবী বীরদের উদ্দেশে সানন্দ বিপ্লবী অভিনন্দন জ্ঞাপনের রীতি। কিন্তু এই সব বিপ্লবীদের সেদিনই সন্ধেয় কাছে পেয়ে কি প্রতিক্রিয়ায় কাটিয়েছিল সুকান্ত? তার চিঠির একটি অংশই এমন এক বিষয়ের উজ্জ্বল আলোক-সন্ধানী নির্দেশিকা।

সুকান্তর মাসতুতো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা সেই বারই সেপ্টেম্বরের পত্রাংশ—

'...তবে কাল আমার জীবনে সব থেকে স্মরণীয় দিন গেছে। মুক্ত বিপ্লবীরা সদলবলে (অনন্ত সিং বাদে) সবাই আমাদের এখানে এসেছিলেন। অনুষ্ঠানের পর তাঁরা আমাদের কাছে এলেন আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জ্জী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আর একজন বিপ্লবী তাঁর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন আমায়। গণেশ ঘোষ বললেন—'আমি আপনাকে ভীষণভাবে চিনি।' অম্বিকা চক্রবর্তী ও অন্যান্য বন্দীরা সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন—আমি তো আনন্দে মুহ্যমান প্রায়। সত্যি কথা বলতে কি এতখানি গর্বিত কোনদিনই নিজেকে মনে করিনি। ফ্রান্সে আর আমেরিকায় আমার জীবনী বেরুবে যেদিন শুনলাম সেদিনও এত সার্থক মনে হয়নি আমার এই রোগজীর্ণ অশিক্ষিত জীবনকে। কাল সন্ধ্যার একটি ঘণ্টা পরিপূর্ণতায় উপচে পড়েছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর এই সন্ধ্যা আমার কাছে অবিস্মরণীয়।'

বিপ্লবী বীরদের সঙ্গে এমন একাত্মতা, আপ্লুত আবেগের সম্পর্ক সুকান্ত বুঝিবা চিরকালের রোমান্টিক কবি-মনে এই প্রত্যক্ষ ঘটনার আগেই পাতিয়েছে তার 'মুক্ত বীরদের প্রতি' কবিতায়। কবিতাটি রচনার প্রতিক্রিয়া সুকান্তর দেশপ্রেমিক বীর ও উদাত্ত দেশপ্রেমের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণেই।

রাজনীতিতে আসার পর সুকান্তর উৎসাহ, উদ্যোগ, কর্মব্যস্ততা যেমন বাইরের দিক থেকে অসীম, অন্তরের গোপন অস্তিত্বেও তেমনি। সুকান্ত এত কাজ করে গেছে অক্লান্ত পরিশ্রমে, সেই সঙ্গে সমান্তরাল রেখেছে তার কবিতা রচনার অপ্রতিহত বেগ ও ধারা।

তখন উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের সেই সব রক্তাক্ত দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে এসেছে ডিসেম্বর মাস। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির 'ছাত্র ফেডারেশান' শাখা সে সময়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ সংগঠন। সাপ্তাহিক 'জনযুদ্ধ' পার্টির একমাত্র বাংলা মুখপত্রটি কলকাতা থেকেই হয় প্রকাশিত। এই পত্রিকাকে অনেকদিন থেকে স্বতন্ত্র নামে দৈনিক হিসেবে প্রকাশ করবার তোড়জোড় চলে। পঁচিশে ডিসেম্বর তা-ও সম্ভব হয় 'স্বাধীনতা' নামে পত্রিকার নবপ্রকাশে।

ডিসেম্বরেই প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশানের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামে। উত্তাল, উত্তপ্ত কলকাতা থেকে এক বিরাট ছাত্রদল, প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম যাত্রা করে। সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রনেতা সত্যপাল

ডাঙ্গ আর প্রথিতযশা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যাত্রায় গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে জাহাজে করে যাবার সময় সুকান্ত জাহাজে বসেই কিছু কবিতা লেখে সম্মেলনের জন্যে।

বাস্তবিকই কিশোর কবির মধ্যে যে তীব্র আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ছিল তা তাকে কোনদিনই কবিতা লেখায় থামতে দেয়নি।

প্রসঙ্গত কবি বিষ্ণু দের একটি কবিতার চারটি চরণ মনে পড়ে যায় —'চাইনা তুমি বিনা শান্তি ও / তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই। / কৃষ্ণচূড়া রাঙে সে-ও তো হাহাকার / আমারি হৃদয়ের কান্তি ও।' এখানে 'তুমি'-কে যদি বলি সুকান্তর কাঙ্ক্ষিত 'কবিতা', তবে সত্যিই কবিতার ব্যাপারে সুকান্ত কোনদিনই ক্ষান্ত হয়নি, কবিতাকে করেছে 'হৃদয়ের কান্তি'।

প্রখ্যাত বামপন্থী শ্রমিক নেতা ও সে সময়ের সুকান্তর ঘনিষ্ঠ পরিচিত কে. জি, বসুর স্মৃতিচারণ অত্যন্ত আন্তরিক ও কবিকে বোঝার পক্ষে মূল্যবান তমসুকের মতই :

'থেমে যায়নি সুকান্ত। কবিতা আর কাজ সমানে চালিয়ে চলেছিল সে। একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে বললে, কেষ্টদা, একটা গরমের প্যাণ্ট আছে, দেবেন আমাকে ?

বললাম, কেন, প্যাণ্ট তোমার কি হবে ?

সুকান্ত খুব উৎসাহের সংগে জবাব দিলো, চট্টগ্রামে যাবো ষ্টুডেণ্টস্ কনফারেন্সে, অবন্তীদা (কবি অবন্তী কুমার সান্ন্যাল) বলেছেন আমাকে নিয়ে যাবেন। একটা গরমের প্যাণ্ট থাকে তো দিন।

তখন শীতের সুরু।

আমি বললাম, কিন্তু বাড়তি গরমের প্যাণ্ট তো আমার নেই সুকান্ত।

ওতেও কিন্তু নিরুৎসাহ নয় সুকান্ত। বললে, ও, নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি আর কোথায় পাওয়া যায় কিনা ?

চলে গেলো ও।

কিন্তু প্যাণ্ট একটা শেষ পর্যন্ত পেলো সে। কোমর বড়, ঢলঢলে,

জীর্ণ, হাঁটুর কাছে এতোখানি গোল কালির দাগ লাগা প্যাণ্ট। তাই পরে সুকান্ত কোমরে একটা চওড়া চামড়ার বেল্ট লাগিয়ে নিলো। ঢলঢলে প্যাণ্টের কোমর বেল্টের বাঁধনে কুঁচকে গেলো, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই সুকান্তর। তাই পরে সে অবন্তীর সঙ্গে চললো চট্টগ্রামে।

কনফারেন্স শেষে ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, সুকান্ত, চট্টগ্রামে গিয়ে কি রকম কনফারেন্স করলে—বলো তো শুনি।

সুকান্ত প্রথমেই খানিকটা হেসে নিলো। তারপর আমার হাতটা ধরে বললে, জানেন কেষ্টদা, ভীষণ এক মজা হয়েছে ওখানে গিয়ে—বলেই আবার ওর সেই হাসির দমক—

বললাম, মজাটা কি তাই বলোনা।

জানেন—সুকান্ত বলতে শুরু করলো, চট্টগ্রামে তো গেলাম। ওখানে আগেই কে খবর দিয়েছিলো সুকান্ত আসছে। তা আমরা পৌঁছতে ছাত্ররা অবন্তীদাকে চেপে ধরলো, সুকান্ত কই,—আমি অবন্তীদার পাশেই ছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে না দেখিয়ে মজা করে বললেন, তোমাদের কবি সুকান্তকে তোমরাই খুঁজে নাও না, সে এখানে, এই আমাদের মধ্যেই আছে। ব্যস, আর যায় কোথায়, ছেলেরা তখন এই বাবরি চুলওলা পাঞ্জাবী পরা কবি সুকান্তকে খুঁজতে লেগে গেছে। কিন্তু কোথায় কি? শেষে নিরাশ হয়ে তারা অবন্তীদাকেই চেপে ধরল আবার—কোথায় সুকান্ত, আমরা তো খুঁজে পাচ্ছি না, আপনিই দেখিয়ে দিন। উনি হাসতে হাসতে বললেন, পারলে না তো? ওই ছাখো তোমাদের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বসে আছে। ঢোলা প্যাণ্ট আর ছিটের শার্ট গায়ে এই কালো রোগা সুকান্তকে দেখে ওরা তো প্রথমে ভারী অবাক। তারপর কজনে এগিয়ে এলো আমার কাছে। ছোটো খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, একটা কবিতা লিখে দিন। কি কবিতা লিখব ভাবছি, এর মধ্যে একজন আবার জিজ্ঞেস করে বসলো—আপনার ঠিকানাটা কি—একটু বলবেন?—

অমনি জানেন কেষ্টদা, আমার মাথায় এসে গেলো:

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাওনি ? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান ?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে,
কখনো পর্ণ কুটীর গড়ি ।

ওদের খাতার পাতায় লিখে দিলাম ওই কবিতা ।

বলে সে আবার হাসতে লাগলো ।

চট্টগ্রামের কনফারেন্সেও সুকান্তর ওই 'ঠিকানা' কবিতাটিই পড়া হয়েছিল সেবার ।'...

এই হল সুকান্তর বিখ্যাত 'ঠিকানা' কবিতাটির জন্ম-ইতিহাস। জন্ম-মুহূর্তে কবি সুকান্তর মনে 'ঠিকানা' শব্দ ও অর্থের অন্তঃভূমি থেকে আসে দার্শনিক ভাবনা। কিন্তু নিছক দার্শনিকতায় কবি সুকান্ত থেমে থাকার মানুষ নয়। সুকান্ত প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে। তার আত্মার অধিগত সমস্ত অন্তর্লীন আবেগ রাজনীতির উত্তাল, মত্ত, সরব আবর্তে সদা-আন্দোলিত তখন। ঠিকানার সংগে যুক্ত হল আন্তর্জাতিক নব-উদ্ভূত রাজনীতির চিন্তা—

ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে,,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে ।

রাজনীতির ভাবনাসূত্র থেকে সুকান্ত ক্রমশ জীবন-দর্শনের গূঢ় ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে বলে ওঠে—

আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্বন্তর থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে
মুক্তির পথে বেঁকে ।

সুকান্ত রাজনীতি করেছে, কিন্তু রক্ত-মাংস-মজ্জার সম্মিলিত রূপেই

যেমন মানুষের সুন্দর শরীর, শরীরের লাবণ্য, শরীরের পূর্ণতা, তার অভ্যন্তরে প্রাণ, আত্মা, ঠিক তেমনি রাজনীতি, সংগঠন, সাম্যবাদ, 'স্বাধীনতা'র কিশোর-সভা পরিচালনা, দেয়ালে পোস্টার লেখা, পোস্টার মারার মত কর্মতৎপরতা—সব কিছুর সম্মিলিত রূপের গভীরে অন্তঃশীল একাত্ম ছিল কাব্যিক স্ফূর্তির সেই মহৎ রূপ। দেশপ্রেমের সঙ্গে, স্বদেশ-মুক্তির সঙ্গে তার 'ঠিকানা' কবিতার দর্শনায়ন নির্দিষ্ট থেকে গেছে। এ বোধ, এ সিদ্ধান্ত সেকালের রাজনীতির চরম লক্ষ্য, পরম পাওয়া। আবার মুক্তিও।

আর কতদিন চুচক্ষু কচলাবে,
জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
সে পথে আমাকে পাবে,
জালালীবাদের পথ ধরে ভাই
ধর্মতলার পরে,
দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
ক্ষুব্ধ এদেশে রক্তের অক্ষরে।

সুযোগ পেলেই সুকান্তর লেখনী-অগ্রে দেখা দেয় মুক্ত স্বদেশের ভাবনা, বোধ, চিত্র। সে মুক্ত স্বদেশ কি রকম হবে তার যথাযথ চিত্ররূপ দান পরের কথা, আগে সকলকে জানানো দরকার, কবি মুক্ত স্বদেশের জন্যই চিরকাল আর্তকণ্ঠ, অস্থির, চিরকাল উদ্যমী, পরিশ্রমী।

বন্ধু, আজকে বিদায়।
দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
ঠিকানা রইল,
এবার মুক্ত স্বদেশেই দেখা করো॥

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালে সুকান্ত তার মেজবৌদিকে একটি চিঠিতে লেখে:

'আমি কবি বলে নির্জনতাপ্রিয় হবো, আমি কি সেই ধরণের কবি? আমি যে জনতার কবি হতে চাই, জনতা বাদ দিলে আমার

চলবে কি করে, তাছাড়া কবির চেয়ে বড় কথা আমি কমিউনিস্ট, কমিউনিস্টদের কাজ কারবার সব জনতা নিয়েই।'

এমন স্পষ্টভাষণ তার কবিতার মতই। অথচ সুকান্তর কবিতার সব চেয়ে উজ্জ্বলতম দিক, বোধ হয় তা কবিতার মূল প্রেরণা, আত্মার অধিকারও হয়ত—'কবির চেয়ে বড় কথা আমি যে কমিউনিস্ট।' এমন জনগণ-সচেতনা থেকেই সুকান্ত লেখে 'ফসলের ডাক : ১৩৫১' কবিতা।

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

* * *

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

আবার সেই শপথভাষণ, সেই কৃষক হওয়ার প্রতীকী চিন্তায় 'বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে'-র সামিল হওয়ার জন্য উদগ্র কাব্যিক বাসনা-কামনা—

নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধায় যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত :
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে ॥

খাঁটি কমিউনিস্ট হয়ে জনতার আকর্ষণেই লেখে 'কৃষকের গান', 'এই নবান্নে,' 'চিরদিনের', 'হে মহাজীবন', 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা।

'হে মহাজীবন' কবিতায় কবি জনতার পক্ষে দাঁড়িয়েই বলে ওঠে—

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।

শেষে বাস্তবতার চরম ও পরম পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তমূলক চরণটি লিখে ফেলে সুকান্ত—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ।।

'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি রচনার প্রেরণা ব্যক্তির অনুভূতি থেকে বহুজনের ভাবনায় গেছে মিশে—

আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

কবি সুকান্তর রক্তোন্মাদনা তো বিপ্লবী চেতনার নামান্তর মাত্র। আঠারো বছর তো শুধু সংখ্যা নয়! এ যে কবির জীবন ও মনের অভিজ্ঞতা ও জ্বালা দিয়ে গাঁথা, অনুভূতি ও শপথের ফুল দিয়ে কারুকার্য করা আঠারো বছরের এক বিপ্লবী কিশোর-যুবকের শক্ত ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত প্রাণশক্তি। তাই তো কবির জীবনের শক্তভিত্তিতে লালিত মনটি চীৎকার করে ওঠে—

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

সুকান্ত রাজনীতির সংগে যুক্ত হয় একচল্লিশ সালের শেষে, বন্ধু অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের গভীর সাহচর্যে দিনগুলি রাতগুলি কাটাবার সময়। সুকান্তকে কবি এবং কর্মী ও সংগঠক সুকান্ত করার প্রয়াসে ঐ সদা-হাস্যময় ছোট-খাটো মানুষটির হাত সব চেয়ে বেশী ছিল মনে হয়। অন্তত নানান সুকান্ত-অন্তরঙ্গের স্মৃতিচারণে তা-ই ধরা পড়ে।

কবিতা তার একটি নির্দিষ্ট পথে বাঁক নেবার মুখে এসে দাঁড়ায়।

বিয়াল্লিশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়, তেতাল্লিশের মম্বন্তর, মহামারী, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিবেশ থেকে সরে সুকান্ত যখন চুয়াল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ,

ছেচল্লিশ সালগুলি পরিক্রমা করে, তখন সে রক্তের কণিকায় সাম্যবাদী, হৃদয়ের শব্দে সাম্যবাদী, আহারে-আচরণে সাম্যবাদী, নিদ্রায়-জাগরণে সাম্যবাদী, সেকালের একজন কট্টর সাম্যবাদীর জীবন্ত প্রতীক সে। অর্থাৎ রাজনীতি তার সব, তার জীবন, তার মৃত্যুও। শ্বাসপ্রশ্বাসের মত রাজনীতিকে আপন করায়, সুকান্তর চেতনায় রাজনীতি অর্থে জনতাই সব হয়ে ওঠায় এ সময়ের সমস্ত কবিতা রচনার প্রেরণা এসেছে, পরিবেশ তৈরী করেছে জীবন্ত জনতা। খাঁটি কট্টর কমিউনিস্টের দৃষ্টিতে জনতা।

এমন জনতা সুকান্তর বহু বিখ্যাত কবিতারই জনক।

জনতার যন্ত্রণা কবির কাব্যসৃষ্টির যন্ত্রণা।

জনগণই কবি সুকান্তর রক্তের রঙ, রক্তের কণিকা, রক্তের বিরতিহীন প্রবাহ, রক্তের শব্দহীন অবিরাম উল্লাস।

দশম অধ্যায়

সুকান্তর ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও স্বদেশ-ভাবনা

ফ্যাসিবাদ বনাম সমাজবাদ। চণ্ডনীতি বনাম ধর্মনীতি। অধর্মের যুদ্ধ বনাম ধর্মযুদ্ধ, জনযুদ্ধ।

এই ছিল উনিশ শ একচল্লিশ সালের নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের স্বরূপ, অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। সমস্ত পূর্বচুক্তি আকস্মিকভাবে দলিত মথিত করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণ। যুদ্ধের দাবা খেলায় এক সর্ববিধ্বংসী চাল। সে সময়টা একচল্লিশ সালের শেষের দিক।

রাজনীতির অন্যতম অঙ্গ তখনকার দিনের বিকটমূর্তি ফ্যাসিবাদ, তার প্রতিস্পর্ধী মঙ্গলময় রুদ্রের বেশে দেখা দিয়েছে রাজনীতির আর এক রক্তিম সূর্য—আদর্শ সমাজবাদ, সাম্যবাদ। বিশ্বের সমস্ত জায়গায় রাষ্ট্রচেতনার মত ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ তথা কলকাতায় এমন রাজনীতির প্রবল জোয়ার।

উনিশ শ বিয়াল্লিশে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক, সেই সঙ্গে 'জাপানকে রুখতে হবে' এই শ্লোগান। সুকান্ত তখন বোমা-ভয়ে ভীত যেমন, তেমনি সেই ভীতি, সংশয়, আড়ষ্টতা থেকে, রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে উন্মুখ, অস্থির।

সুকান্ত তখন ষোলো বছর বয়সের কিশোর। এমন বয়সেই তার যোগ ঘটে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

নতুন কাব্যবাণী নিয়ে কবির 'পদাতিক' গ্রন্থটির তার আগেই প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন তখন কলকাতা, ঢাকা—ভারতের সমস্ত বুদ্ধিজীবী-নির্ভর শহর সমূহের স্নায়ুকেন্দ্রে উত্তেজনার জোয়ার আনে। তরুণ, যুবক, ছাত্র—শিক্ষিত মহলের সর্বস্তরে জোর তৎপরতা। এরই মধ্যে ঢাকায় ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে নিহত তরুণ উদীয়মান লেখক সোমেন চন্দ।

এই সমস্ত ঘটনা ক্রমশ সাংস্কৃতিক জীবনের গভীরে প্রোথিত হতে থাকে—মাটির অন্ধকার থেকে গাছের প্রাণশক্তি গ্রহণ করার লক্ষ্যের মত। বাইরের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, মিছিল, শ্লোগান, অসহযোগ সেই ফ্যাসিবিরোধী চিন্তার পক্ষে সূর্যের আলো-উত্তাপের মত—যা গাছের বৃদ্ধির একমাত্র সহায়ক। আর সমস্ত মানুষের চেতনার দীপ্ত, উচ্চকিত অন্ধকারে সঞ্জীবনী প্রাণরস জমা হতে থাকে—যা গাছের শরীরে অলৌকিক আত্মার বৃদ্ধির মত বয়ে যায় অবিরল নিরাকারে, নিঃশব্দে, পুলকিত শিহরণে।

এভাবেই ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে সারা বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সচেতন বুদ্ধিজীবীমহলে।

সুকান্ত তখন সত্যিকারের কিশোর—দুঃসহ আঠারো বছর বয়স নয়, ষোলো বছর—যে বয়সে শুধুই রোমাঞ্চ, শুধুই বিস্ময়চকিত শিহরণ থেকে যায় শরীরে, মনে।

সুকান্তর বৌদি সরযূদেবীর ভাষায়—'সুকান্ত কোনো নিয়ম মেনে চলে না. পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছে একরকম—বাড়িতে কারো সঙ্গে কথাও বলে না বিশেষ।'

এমন কথা বলে সরযূ দেবী যখন সুকান্তর স্বভাবের একটা দিক নির্দিষ্ট করেন, তার আগেই সুকান্তর প্রচ্ছন্ন বা কতকাংশে প্রত্যক্ষ রাজনীতি-শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। সমকালের আর এক কমরেড সুধী প্রধানের স্মৃতিচারণ সূত্রে যে খবর পাই, তা হল উনিশ শ একচল্লিশের কোন এক সময়ে 'অরণি' পত্রিকা প্রকাশের পর সুকান্তর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তারপরেই ক্রমশ নিজ অন্তঃশীল স্বভাবধর্মে সুকান্ত জনতার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে ময়দানে চলে আসে।

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণে লিখছেন, 'সৃষ্টির বেদনায় অস্থিরতার লক্ষণ ও প্রকাশ তখন সুকান্ততে সুস্পষ্ট। তাছাড়া তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্ক্সবাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেন্ট ও অপরদিকে গান, নাটক এবং

কবিতাপাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র ফেডারেশান গণনাট্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের পূর্বসূরী।

'...কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সুর ও ছন্দের কবিতা তখনকার আন্দোলনে প্রভুত উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়। এই পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতী মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নতুন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।'

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে প্রথম সুকান্ত যখন যুক্ত হয়, তখনই তার আবার রাজনীতি শিক্ষার বোধনকাল। আধুনিক কবিতার সঙ্গে তার আত্মিক পরিচয়ও এমনি সময়ে। এক মুগ্ধ কিশোর একই সঙ্গে এত জোয়ারের ঢেউ-এ কিন্তু স্থিত থেকেছে কবিভাবনায়, তৈরী করেছে নিজেকে। কোন সচেতন প্রস্তুতি নয়, অবচেতনলোকে অলৌকিক সমন্বয়। বুঝিবা এর নাম প্রতিভা—'অপূর্ববস্তু নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা'।

অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের স্মৃতিচারণে ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই সময়ের বিশ্লেষণ অত্যন্ত মূল্যবান এক কবি-রানারের চলমান মানস-স্বরূপ নির্দ্ধারণে:

'নতেদা ছিল তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার নিয়মিত পাঠক। তার কাছে সুকান্ত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেত। তাছাড়া আরও নানারকম কবিতার বই ও পত্র পত্রিকা সুকান্ত নতেদার কাছে নিয়মিত দেখবার সুযোগ পেয়েছে ও পড়েছে। ছোড়দার বিয়েতে পাওয়া একটি উপহারের বই নতেদার নজরে আসে। এটি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আবু সৈয়দ আইয়ুব সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন। নতেদা এই সংকলনটি পড়ে মুগ্ধ

হয় এবং সুকান্তকে এটি পড়তে বলে। সুকান্ত এ বইটি অতি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয় ; এই পুস্তকে প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পদাতিক', 'মে দিবসের কবিতা' 'আবিষ্কার' ইত্যাদি কবিতাগুলি সুকান্তর খুব ভাল লাগে। এ ছাড়া অন্যান্য কবি যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জীবনানন্দ দাস প্রভৃতির লেখার ধরণ এবং তাদের রচনার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে সুকান্ত মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয় তৎকালীন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি। সে যেন নতুন পথের সন্ধান পায়। এই সংকলনের মাধ্যমেই সে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার কবিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। যাই হোক, এই ঘটনা সুকান্তর কাব্যজীবনে আনল এক প্রচণ্ড আলোড়ন।

'নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হল সুকান্ত। নতুন সিদ্ধান্ত খুলে গেল তার সামনে।'

ঠিক এমনি মানসিকতার মধ্যেই মুগ্ধ বিস্ময়ে সুকান্তর পরিচয় হয়ে যায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

প্রথম পরিচয়ের মাধ্যম সুকান্তর সেই নতেদা— জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য।

'পদাতিক'-এর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন স্কটিশ চার্চ কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। নবপ্রাণিত ছাত্র আন্দোলনে গভীর-নিবিষ্ট। মনোজ ভট্টাচার্য ওই কলেজেরই তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

বিডন স্ট্রীটের একটি রেস্তোরাঁ। ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে বা ক্লাশের অবসরে এইসব ছাত্রবন্ধু তখন সেই রেস্তোরাঁয় নিয়মিত সমবেত আড্ডায় গভীর মশগুল। মনোজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এল সুকান্ত—একটি লাজুক, ভীরু, বছর চোদ্দ-পনেরোর কিশোর। সে মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত। সামনে তার অতি প্রিয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

পরিচয় হল সুকান্তর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের।

এক কিশোর সুকান্তকে প্রথম প্রত্যক্ষ করার স্মৃতিচারণে কবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা সঠিক, স্পষ্ট, যেনবা সার্থক শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি জীবন্ত চিত্র।

'শরীরে যত্ন নেই। রোগা সরল চেহারা। মোটা ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটা সলজ্জ হাসি। মুখচোরা হলে কি হয় তার চোখ দুটো যেন সমস্তক্ষণ ডেকে ডেকে কথা বলছে।

'যে তার চোখের দিকে তাকাবে সেই বুঝবে এমন কিছু সে দেখতে পাচ্ছে যা আর কারো চোখে পড়ে না।

'তাকে দেখলে ভালো না বেসে পারা যায় না।

আমরা তাই সুকান্তকে সেই দিনই ভালোবেসে ফেললাম।'

মনোজ ভট্টাচার্য অনুজ ভাইয়ের একটি কবিতা লেখার খাতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়েছিলেন পড়তে।

কবিতা পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মুগ্ধ, বিস্মিত এবং চমকিত। পরিচয় হতেই কিশোর কবিকে বার বার অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে দেখলেন: 'সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয় কেউ যদি আমাকে জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারব না।' এ হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুজ সতীর্থ কবি সম্বন্ধে অকপট, আন্তরিক স্বীকৃতি।

সুকান্তর কবিতার খাতাখানি পড়ার পর এই অগ্রজ কবির কিরকম প্রতিক্রিয়া?

'পড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন, আমার অন্যান্য বন্ধুরাও। এমন কি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা পড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।...তাতে কি এমন ছিল যে, পড়ে সেদিন আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না কারণ, বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি বয়ে এসেছে। কোনো কিশোরের পক্ষে ঐ বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের এমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত। হালে সে জিনিস প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

সেই খাতা সে সময়ের কবি দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুরও চোখে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৎপরতায়।

দেখার মত বিষয় হল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন 'কবিতাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে…রাজনীতির আসরে' ঢুকেছেন। 'সুকান্তর আগের লোক বলে' পার্টিতে এসেছিলেন 'কবিতা ছেড়ে দিয়ে'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমধর্মী বন্ধুদের মাঝখানে সুকান্তর এসে দাঁড়ানো একই সঙ্গে রাজনীতি আর কবিতার হাত শক্ত হয়ে ওঠা। সমকালের সাংস্কৃতিক ধারক-বাহকরা তখন রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। সেই পরিমণ্ডলে সুকান্ত।

সুকান্তর সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই বিডন ষ্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় প্রথম সাক্ষাতের পর সুকান্ত বিশেষ পরিচিত হয়ে যায় অগ্রজ কবিদের দলে। সুকান্তর জীবন তখন সম্পূর্ণ পরিবারকেন্দ্রিক নয়, কিছুটা উৎকেন্দ্রিক। বাইরের জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার শুরু ইতস্তত ছড়ানো তার আত্মীয়দলের সঙ্গে যোগাযোগে। অগ্রজ কবিদলের সূত্রে তার উৎকেন্দ্রিক জীবন-যাপন একটা বিশেষ দিকের সূত্র ধরিয়ে দেয়। একটা বিশেষ দিকে পা ফেলতে উৎসুক তখন কবি সুকান্ত।

কিন্তু সুকান্তর এমন বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের কাল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর থাকার কথা নয়। সারা বিশ্বের যুদ্ধ তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন। এই বিশেষ সময়ের কথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি সুকান্ত সম্পর্কে জানাচ্ছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণে :

'তখন সময়টা ছিল অন্য রকমের। সবে লড়াই বেধেছে। হাতের শিকল ভাঙবার জন্যে সারা দেশ তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় তখন রোজই প্রায় ছাত্রদের মিছিল আর কথায় কথায় ব্যারিকেড্। ঘরের কোণে বসে থাকার সময় নেই।

আমরা ঘর ছেড়ে কেবলি রাস্তায় ঘুরি।'

সুকান্তর কিশোর মনের উৎকেন্দ্রিক জীবনের সামনে আসে এরকম একটি দল, একটি রাজনৈতিক কর্মী ও কবিগোষ্ঠী—যারা 'ঘর ছেড়ে

কেবলি রাস্তায়' ঘোরে। তারা তো সুকান্তর মনের মানুষ। বোহে-মিয়ান, বাউল সুকান্তর এই তো আশা, আশ্রয়, এই সবই তো তার পথের পাথেয়, আত্মার আত্মীয়। এসবের মধ্যেই আছে সেই অমোঘ চুম্বক—যা পৃথিবীকে সূর্যের নিজের বলয়ে আটকে রেখেছে অনন্তকাল অসীম পৌরুষে।

কিশোর রক্তমাংসের সুকান্তর জীবনে কেন্দ্রাতিগ শক্তির চাপ, কবি সুকান্তর হাতে কবিতার খাতা—যার মধ্যে কবি-মনের আত্মগুপ্তির মন্ত্র।

একদিকে রাজনীতির উন্মাদনা, আবেগ, প্রত্যক্ষতা, আর একদিকে কবি-প্রাণের রোমান্টিক মুগ্ধতা, সৃষ্টির জন্য উন্মুখ কবিমন। এই দু'য়ের মেলবন্ধন ছিল সুকান্তর জীবনে, কাব্যেও। এমন 'তাগিদটা বাইরে থেকে আসে নি ; এসেছিল তার নিজের ভেতর থেকে। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আসলে নিজেকেই সে কবিতায় ঢেলে দিয়েছিল।'

অগ্রজ কবি ও রাজনৈতিক ছাত্রকর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় একদিকে, আর একদিকে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুকান্তর কবিতার প্রকাশ। একদিকে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে উচ্চকিত সংযোগ, আর একদিকে কবি-ভাবনার সর্বব্যাপক স্বীকরণের ভূমিকা বিস্তার।

'অরণি', 'জনযুদ্ধ', 'পরিচয়'—তখন এমন সব পত্রিকার অন্যতম কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

এমন মানসিকতা, এমন পরিচিতি, এমন প্রয়াসের মধ্য দিয়েই সুকান্তর ঘটে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীদের উষ্ণ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য।

কবিতার বিষয়ে ঘটে পরিবর্তন। সুকান্ত হয়ে ওঠে জনতার কবি।

'জনযুদ্ধের গান' তেমনি একটি বিষয়ে প্রাণিত কবিতা।

বিয়াল্লিশ সালের একটি কাব্য সংকলন প্রয়াসের প্রসঙ্গ আসে। সম্পাদক কবি গোলাম কুদ্দুস। সংকলনে আছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, অন্নদাশংকর রায়, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সময় সেনের মত সে সময়ের শক্তিমান তরুণ কবি-

সম্প্রদায়। সংখ্যায় পঞ্চান্ন জনের মত। তার মধ্যে এক কিশোর কবির অভাবনীয় কাব্যস্বীকৃতি—সুকান্তর কবিতা 'জনযুদ্ধের গান'!

জনগণ হও আজ উদ্বুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ,

সুকান্ত কি বুঝেছিল, কমিউনিজ্‌ম্‌ ছাড়া ভারতের মুক্তি সম্ভব নয়? সুকান্ত কি বুঝেছিল, একদা সাম্যবাদীদের রোষেই বদ্ধ মানবপ্রাণ মুক্তি পাবে? লেনিন তো তাই করে গেছেন রাশিয়ায়! সুকান্তও সেই কমিউনিস্টদের হয়েই বলে উঠেছে—

সাম্যবাদীরা আজ মহাক্রুদ্ধ
শুরু করো প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।
জনগণ শক্তির ক্ষয় নেই,
ভয় নেই আমাদের ভয় নেই।

কবির আত্মউদ্বোধন ঘটেছে কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে যে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য আকুল অথচ দৃঢ়চিত্ত আহ্বান, তা একজন কমিউনিস্ট কবির যথাযথ কমরেডদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দানের মত আহ্বান—

নিষ্ক্রিয়তায় তবে কেন মন মগ্ন
কেড়ে নাও হাতিয়ার, শুভলগ্ন।
করো জাপানের আজ গতিরুদ্ধ ;
শুরু করো, প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ।

ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের জাগতিক পরিবেশ, প্রত্যক্ষভাবে কলকাতায় জাপানী বোমারুর প্রবল আক্রমণ, সাম্যবাদে দীক্ষা, জনতার মিছিল আর মিটিং—এমন উতরোল পরিবেশে সচেতন কবির মানসিকতা তো এমনি হওয়াই স্বাভাবিক! এ গান স্বতঃস্ফূর্ত!

কিশোর কবি যে জনগণের একাত্ম হতে চায়, জনগণের প্রতি এমন আহ্বানের এই গানে তার প্রমাণ।

'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র সদস্য হতে সুকান্তর পক্ষে বিলম্ব ঘটেনি। এই সদস্যপদ লাভের আগে-পরেও সুকান্তর

প্রায় সমস্ত কবিতার মধ্যেই ফ্যাসিবিরোধী মনোভঙ্গির প্রকাশ প্রবল।

এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যক্ষ রাজনীতির শুরুতে সুকান্ত আসে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্যে। সেই সংসর্গের শিক্ষা রাজনীতির সঙ্গে সংলগ্ন থেকে হয়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী মনোভঙ্গি গঠনের সহায়ক।

তিরিশের দশকে প্রথম রবীন্দ্রনাথ, সরোজিনী নাইডু প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতে ফ্যাসিবাদবিরোধী এক সংস্থা গড়ে ওঠে। তার দশ বছর পরে এই দেশের পটভূমি বিশ্ব-পরিস্থিতির মতই অন্যরূপ নেয়। প্রত্যক্ষ ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ভারতের সীমান্তে তখন।

তাই ফ্যাসিবাদের তীব্র প্রতিরোধ-ভাবনা থেকে দেখা দেয় 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।' উনিশ শ একচল্লিশ সালের বাইশে জুনের পর যে হিটলারী যুদ্ধ যথার্থ অর্থে ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের রূপ নেয়, যে যুদ্ধের বিরোধী রূপ দেখা দেয় মানবমুক্তির যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ—তার নেতৃত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার এবং সেই সূত্রে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সামিল হয় আন্দোলনের তীব্রতা নিয়ে মাঠে-ময়দানে-মিছিলে, জনতার কলরোলে।

নবগঠিত শিল্পীসংঘ মূলত তারই আর এক হাতিয়ার। সুকান্ত এই সংঘের সদস্য হিসেবে যেমন কবিতা লিখতে শুরু করে, তেমনি সদ্যপ্রাপ্ত রাজনীতি-চেতনায় ফ্যাসিবাদকেই তার কবিতার আক্রমণের প্রধানতম বিষয় করে তোলে। 'মধ্যবিত্ত '৪২' কবিতায় কবি লেখে,

> পৃথিবীময় যে সংক্রামক রোগে,
> আজকে সকলে ভুগছে এক যোগে,
> এখানে খানিক তারই পূর্বাভাস
> পাচ্ছি, এখন বইছে পূব-বাতাস।
> উপায় নেই যে সামলে ধরব হাল,
> হিংস্র বাতাসে ছিঁড়ল আজকে পাল।

সমকালের পরিবেশ চেতনায় সুকান্ত সতর্ক এবং সমগ্র কবিতায় এমন পরিবেশের থমথমে প্রকৃতি বর্ণনার শেষে স্পষ্ট করে বলে—

এদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তরে
আবার বোমারু রক্ত পান করে,
ক্ষুব্ধ জনতা আসামে, চাটগাঁয়ে,
শাণিত দৈত নগ্ন অন্যায়ে ;
তাদের স্বার্থে আমার স্বার্থকে,
দেখছে চেতনা আজকে এক চোখে।

সুকান্তর কবিতা চিনিয়ে দেয় কারা শত্রু, কারা মিত্র, কারা উৎপীড়ক কারা উৎপীড়িত। যারা অত্যাচারী, দিবাস্বপ্নে বিভোর, যারা পিছনের দরজা দিয়ে নিঃসাড়ে নিভৃতে সমবেত হয় মানবতা ধ্বংস করতে, তাদের সম্পর্কে 'জাগবার দিন আজ' কবিতায় প্রথমেই সতর্ক বাণী,—

জাগবার দিন আজ, দুর্দিন চুপিচুপি আসছে ;
যাদের চোখেতে আজো স্বপ্নের ছায়া ছবি ভাসছে—
তাদেরি যে দুর্দিন পরিণামে আরো বেশী জানবে,
মৃত্যুর সঙ্গীন তাদেরই বুকেতে শেল হানবে।

এমন অবস্থা সুকান্ত বিলাসের মধ্যে সমর্থন করে না। শুধু কলাকৈবল্যবাদ নিয়ে বসে থেকে শিল্পের চর্চায় সুকান্তর আসক্তি নেই, ছিল না কোনদিনই। ফ্যাসিবাদ কবির পক্ষে কাব্য দিয়েই রুখতে হবে! কিন্তু সে কাব্য কেবল-কাব্য নয়, জীবন-কাব্যই। মানবতার কাব্য সে। তাই—

'আজকের দিন নয় কাব্যের—
আজকের সব কথা পরিণাম আর সম্ভাব্যের ;
*   *   *
আকাশের প্রান্তে যে মৃত্যুর কালো পাখা বিস্তার—
মৃত্যু ঘরের কোণে, আজ আর নেই কোনো চিন্তার ;

ফ্যাসিবাদ তো সুস্থ সবল, মানবিক রাজনীতির বুকের ওপরে দৈত্যের অত্যাচার! ফ্যাসিবাদ সুস্থ সবল রাজনীতির সংহারক যে! একথা মনে হতেই সুকান্তর বলিষ্ঠ কণ্ঠ সোচ্চার হয় সম্ভাব্য তিমির হননের শপথ গ্রহণে—

পণ করো, দৈত্যের অঙ্গে

হানবো বজ্রাঘাত, মিলবো সবাই এক সঙ্গে,

সংগ্রাম শুরু করো মুক্তির,

দিন নেই তর্ক ও যুক্তির।

আজকে শপথ করো সকলে—

বাঁচাব আমার দেশ যাবে না তো শত্রুর দখলে;

কবি সুকান্ত সবশেষে শুনিয়েছে সমস্ত সচেতন শিক্ষিত মানুষের একতাবদ্ধ হওয়ার কথা।

এ হল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী-আত্মার সবল সিদ্ধান্ত।

'রোম : ১৯৪৩' কবিতায় রোমের মুক্তির কথা ভেবে কবির উল্লাস—

ভেঙে পড়ে দস্যুতার, পশুতার প্রথম প্রাসাদ

বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুৎপাতে উচ্চারিত শোষকের বিরুদ্ধে জেহাদ।

*　　*　　*

এদিকে ত্বরিত সূর্য রোমের আকাশে

যদিও কুয়াশা ঢাকা আকশের নীল,

তবুও বিপ্লবী জানে, সোবিয়েত পাশে।

'১৯৪১ সাল' কবিতাটি কবির ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভঙ্গির আর এক স্পষ্ট চিত্র—

তাই রক্তাক্ত পৃথিবীর ডাকঘর থেকে

ডাক এল—

সভ্যতার ডাক।

নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত পরোয়ানা

আমাকে চিহ্নিত করে গেল।

আমার একক পৃথিবী

ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে;

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে কবি সুকান্ত কখনই একা নয়। একক মনের নিঃসঙ্গ বিলাস থেকে সে আঘাতের শক্তি দেখা দেয়নি। উনিশ শ একচল্লিশ সাল থেকে উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের যে যুদ্ধের দুর্বার দুর্মদ রথচক্রধ্বনি, তা সুকান্তকে একক জীবনে নিক্ষেপ

করেনি, টেনে আনে সর্বমানুষের মধ্যে। তার রাজনীতির সাম্যবাদের শিক্ষা তা-ই। জনতাই যে সব, একথা সুকান্ত বিভিন্ন কবিতায়, চিঠিতে নানাভাবে বলেছে। সাধারণ কথোপকথনেও সে সময়ের রাজনীতি সচেতন জনতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছে।

'জবাব' কবিতায় সেই জনতার স্বভাব চিত্রিত, বুঝি আমন্ত্রিত এবং অভিনন্দিতও!

আশংকা নয় আসন্ন রাত্রিকে
মুক্তি-মগ্ন প্রতিজ্ঞা চারিদিকে
হানবে এবার অজস্র মৃত্যুকে ;
জঙ্গী-জনতা ক্রমাগত সম্মুখে।

এমন জনতার কথা বলেই যেনবা সুকান্ত জনতার একেবারে সামনেই এসে পতাকা ধরে দাঁড়ায়। উত্তেজিত প্রতিবাদী কণ্ঠে মুখর সুকান্ত। রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণের পর সুকান্তর সমস্ত কবিতায় এমনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা—

ক্ষিপ্ত হোক, দৃপ্ত হোক তুচ্ছ প্রাণ
কাস্তে ধরো, মুঠিতে এক গুচ্ছ ধান
মর্ম আজ ধর্ম সাজ আচ্ছাদন
করুক : চাই এদেশে বীর উৎপাদন।

কমিউনিস্ট কবির লেখনীতেই তো থাকে শ্রমিক-কৃষক, থাকে তাদের দিয়ে গোটা দেশকে একতাবদ্ধ করার সাংগঠনিক চাতুর্য, কৌশল। কবিতায় সেই শ্রমিক-কৃষকদের কথা বলে কবি একতাবদ্ধ প্রতিরোধের ভাষা শুনিয়েছে—

শ্রমিক দৃঢ় কারখানায়, কৃষক দৃঢ় মাঠে,
তাই প্রতীক্ষা, ঘনায় দিন স্বপ্নহীন হাটে।
তীব্রতর আগুন চোখে, চরণপাত নিবিড়
পতেঙ্গার জবাব দেবে এদেশে জনশিবির।

সুকান্তর কবিতার রাজনীতি—সে তো ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনীতি। মূলত তা মানবতার জয় ঘোষণাই। ফ্যাসিবাদকে সুকান্ত কবিতায় নানাভাবে সামনে রেখে তার ক্রোধ, ঘৃণা, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য,

অপমান, অভিমান—সব নিক্ষেপ করে গেছে, ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষের ওপর অগণন জনতার অবিরল নিষ্ঠীবন নিক্ষেপের মত! লেনিন বন্দনায় সুকান্ত তাই আবেগের দীপ্তিতে শুধু নয়, গভীর উপলব্ধিতে, একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসেবে রক্তের আত্মীয়তায় বলতে পেরেছে—'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।'

এমন উক্তি ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার জন্য যে নিখুঁত প্রাণশক্তির প্রয়োজন,—তারই একমাত্র কাব্যময় নির্যাস।

'চট্টগ্রাম : ১৯৪৩', 'জবাব', 'উদ্যোগ' কবিতা রচনার প্রেরণাও সেই ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা। উনিশ শ বিয়াল্লিশের উনিশ-কুড়ি তারিখে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে গর্জে ওঠেন সেকালের বিশাল বাংলা-দেশের লেখক শিল্পীরা। সুকান্ত তার দ্রষ্টা। তার কণ্ঠে সেই গর্জনের ভাষা যে ধ্বনিত হয়েছিল, প্রমাণ তার সমকালে রচিত একাধিক কবিতা।

মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে করো ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।

সুকান্তর কবিতায় আছে সমকালের ইতিহাস—আন্দোলনের, বিপ্লবের, বিদ্রোহের। 'উদ্যোগ' কবিতায় ফেনী, আসাম, চট্টগ্রামের ক্ষিপ্ত জনগর্জনের স্বীকৃতি আছে, আছে চট্টগ্রামের অতীত বীরদের কথা স্মরণে সমকালের বিশ্বযুদ্ধে স্তালিনগ্রাদে জাপ আক্রমণের প্রবল প্রতিরোধের কথা, আছে 'জবাব' কবিতায় পতেঙ্গা বিমান বন্দরে যুদ্ধের প্রবল স্রোতের কথা।

সুকান্তর এ সময়ের কবিতাগুলির প্রেরণা, বস্তুত সমকালীন রাজনীতি, সাম্যবাদ, আন্দোলন—এমন সব বিষয়। সারা কলকাতা শহর বোমার আতঙ্কে বিপন্ন, বিমূঢ়, তার ওপর ঝড়, মন্বন্তর, মহামারী, সামাজিক অবক্ষয়ের নোংরা, দুর্গন্ধময় ছেঁড়া কাপড় জড়ানো। এ সবের মধ্যে কিশোর কবির কাছে সর্বপ্রথম এসেছে রাজনীতির শপথ, সাম্য-বাদের শিক্ষা। তাই দিয়েই বাইরের কর্মময় জীবনে সব কিছুর মোকা-বিলা করতে সচেষ্ট হয়েছে সুকান্ত।

কিন্তু কবি সুকান্ত? একের পর এক রাজনীতি-আশ্রিত কবিতা রচনার প্রেরণা পেয়েছে দিনের পর দিন। রাজনীতি, ফ্যাসিবাদ, মানবতা—এমনি সব সংকটজনক অস্তিত্বের ঘোষণাকারী শব্দ তখন সুকান্তর কবি-মনে অবয়ব নিতে উৎসুক। কিশোর মন, রোমান্টিক মন, সম্ভলব্ধ অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ কর্মের জগত, জনতার অবিরাম আহ্বান—এসব থেকে যে কবিতার জন্ম, তা তো রাজনীতি-বিবিক্ত হতেই পারে না।

উনিশ শ একচল্লিশ থেকে উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ সাল পর্যন্ত সময় সুকান্তর কবিজীবনে একই সংগে যৌবন প্রৌঢ়তা প্রাজ্ঞতা প্রাপ্তির কাল। এই কালে কিশোর কবি সারা কলকাতার মতই বিভ্রান্ত, বিহ্বল, ভীত-সন্ত্রস্ত হলেও শপথে ধীর স্থির যে তার কবিমনে।

কিন্তু শুধু ফ্যাসিবাদী অত্যাচার কবিকে কাব্য রচনায় প্রেরণা দেয়নি, দেয়নি বিপুল রসদের সম্ভার। পাশাপাশি ছিল দেশজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়, মন্বন্তর, মহামারী, চতুর্দিকের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র। এসবও এক কবির মনোলোকে রসদের ভাণ্ডারকে স্ফীত, উদ্বেলিত, আন্দোলিত করেছে।

স্বল্পজীবী সুকান্ত। উল্কার মত তার কাব্য ও রাজনীতি—উভয় জীবনে আগমন, ত্বরিত আবির্ভাব, পদক্ষেপ, ভ্রমণ। আবার পৃথিবীর নিরবধি কালের তুলনায় বৃহত্তম বেগে তার অন্তর্ধান।

তাই একদিকে রাজনীতি চেতনা, আর একদিকে দেশজ নানান বৈষম্যের ভাবনা।

কবির দুই রক্তচক্ষু। এক চক্ষু বিশ্বজনীন সমস্যার দিকে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় শাসনে বক্র, রক্তিম, আর এক চক্ষু বুকের কাছাকাছি ঘুরে-বেড়ানো দেশের ভাই-বোনদের অসহায় রূপে বিষণ্ণ, বিপন্ন, বিহ্বল!

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারীর শিক্ষা কবি সুকান্তর আর এক শিক্ষা। তার অন্তঃশীল প্রেরণা সুকান্তর একাধিক উজ্জ্বল কবিতার জনক।

এমন সুকান্ত এবং এমন সুকান্তর জনকত্ব—সম্মিলিত অভিনব ব্যক্তিত্বেরই প্রতিরূপ।

একাদশ অধ্যায়

শহর কলকাতা মহামন্বন্তর কবি সুকান্ত

উনিশ শ উনচল্লিশ থেকে উনিশ শ সাতচল্লিশ সাল।

তেরো বছর বয়সের সদ্য-কিশোর সুকান্ত থেকে একুশ বছরের সুকান্তর চিহ্নিত মৃত্যুর সময়কাল।

এই সময়-পরিধিতে বাংলাদেশ তথা এই শহর কলকাতা কি রকম? কেমন তার প্রেক্ষিত?

কলকাতা যেন একটা সর্বরোগে আক্রান্ত মানুষের শরীর।

উনিশ শ উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বরে সেই শরীরের অতি অভ্যন্তরে রোগের হাতছানি। বিশ্ব-সংক্রামক ব্যাধি যুদ্ধের রক্তিম চোখ তখন পশ্চিম ইউরোপে।

উনিশ শ একচল্লিশের শেষ থেকে কলকাতায় প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আতঙ্ক, বোমাবর্ষণ, বিয়াল্লিশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়, তেতাল্লিশ সালে চরম মন্বন্তর, মহামারীর আবির্ভাব। শহর ও শহরতলীতে নতুন রূপে, নতুন সাজে গণিকাবৃত্তির উদ্ভব। দালাল, মুনাফাখোর, মজুতদারদের সৃষ্টি, ব্ল্যাকমার্কেটিং, নিষ্প্রদীপ অবস্থা, গ্রাম থেকে নিরন্ন ভিখিরিদের দলে দলে শহরের ফুটপাথে আশ্রয় গ্রহণ, আমেরিকান সৈন্যের যথেচ্ছাচার—এসবের স্রোত পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত। ছেচল্লিশ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কালো কঠিন পাথরের ওপর অশ্রুর প্রলেপ দেওয়া অধোমুখ লজ্জা।

এসবই হল সেই কলকাতা নামে প্রতীক-প্রতিম এক মানব শরীরে বিচিত্র সব দুষ্ট ক্ষত, দগদগে ঘা।

তবু বিকৃত কলকাতার তথা সারা বাংলাদেশের এই রোগ সারাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল সর্বরোগহর মানবতার ওষুধ দেওয়ার চেষ্টায়। সে প্রয়াস ছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'

আন্দোলনে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অক্লান্ত উদ্যমে—সংগঠনে, সমাজসেবায়, ময়দানের মিছিলে মিটিংএ। এসবের মূলে ছিল মানবতাবাদের প্রত্যাশা, প্রতিষ্ঠা।

কলকাতা যেন সেই কলার মান্দাসে ভাসমান লখিন্দরের গলিত শব! তার বুকে সমস্ত সুস্থ, সপ্রাণ গণ আন্দোলন, বিদ্রোহ-বিপ্লব, সমাজসেবার সামগ্রিক রূপ হল সেই বেহুলা! আর সেই স্বর্গরাজ্য হল মানবতা—যেখানে লখিন্দরের মতই কলকাতার বুকে মানবতার ঘোষণায় আসে কতকাংশে বিদেশীশোষণ-মুক্তির স্বাধীনতা-আর্তি।

এমন পচনশীল সর্বরোগে গলিত-দেহ কলকাতাকে তথা সারা বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করে কিশোর সুকান্ত। পনেরো বছর থেকে আমৃত্যু সে ছিল তার এই প্রিয় কলকাতার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, কবি-দ্রষ্টা!

সুকান্তর কাব্যে এর মধ্যেকার মন্বন্তর ও মহামারীর চিত্র ভয়ংকর এক বিপ্লবীর কণ্ঠে চিত্রিত। সুকান্তর কবিতার মোড়-ফেরানো সার্থকতার যথার্থ রূপ এই সময়েই!

আমাদের বালক বয়সের ক্ষীণ স্মৃতিতে সে সময়ে কৌতুক গানের কণ্ঠশিল্পী যশোদাদুলাল মণ্ডলের রেকর্ড করা একটি কৌতুক-নক্সা জাতীয় গানের বেশ কিছু পংক্তি মনে পড়ে যায়। এখনো সেই সে সময়েব গ্রামোফোন রেকর্ড আমাদের আছে। মনে পড়ে, মজা করে অপটু শব্দে ও স্বরে কেবল ছন্দের ও কথার মাদকতায় আমরা গানটি প্রতিনিয়তই খেলার ছলে বাড়িতে গাইতাম। তেতাল্লিশ সালের কলকাতার চিত্র—যা তার অব্যবহিত পূর্ব ও উত্তর কালের মধ্যবর্তী সময় থেকে দীর্ঘ আট বছরের কালের ক্লাইম্যাক্সকে চিহ্নিত করে—এই গানে চমৎকার উপস্থাপিত।

> ক্যালকাটা নাইনটিন্ ফরটি থ্রি অক্টোবর।
> এ. আর. পি., মিলিটারি, পথে পথে ভিখিরি,
> এ্যাকসিডেন্ট এ্যাণ্ড ক্রাউড, কণ্ট্রোল, পারমিট, ব্ল্যাক আউট,
> সব জিনিসের বাড়লো দর।
> ক্যালকাটা নাইনটিন্ ফরটি থ্রি অক্টোবর।

খানিকটা নীল আর খানিকটা ছাই চলে এ. আর. পি.।
খাঁকি হাট-প্যাণ্ট কোট-নেকটাই ছোটে মিলিটারি।
লাখে লাখে লোক জমেছে কলিকাতায়।
ভিখিরিরা নোংরা করে রাস্তা চলা দায়।
একটি পয়সা দাও গো বাবু যখন তারা বলে,
বাবুরা দেয় মুখ ঝামটা।
পঁক পঁক পঁক মোটর গাড়ি যখন জোরে চলে
কত লোকই হল ব্যাঙ চ্যাপটা।
চারিদিকে সব যেন, ঐ গেল ঐ ধর, ঐ গেল ঐ ধর।
ক্যালকাটা নাইনটিন্ ফরটি থ্রি অক্টোবর।

চাল, ডাল, তেল, আটা-ময়দা
কণ্ট্রোল হয়েছে
বাড়ির বউরা রান্না ছেড়ে লাইন দিয়েছে।

*　　　*　　　*

বাইরে ব্ল্যাক আউট, ভিতরে ব্ল্যাক ইন
ব্ল্যাক মার্কেট চলছে তবু রোজ
মেলে না কয়লা কেরোসিন।
অন্ধকারে ধাক্কা লাগে বাফ্‌ল্‌ওয়ালের গায়
ভিতর থেকে কারা দুজন ছুটে বাহির যায়।
চুপি চুপি নিলাম পিছু, দেখি একটি নারী ও একটি নর
স্বামী স্ত্রী কিংবা আর কিছু ভাবটি ভয়ংকর।

সে সময়ের কৌতুকগানের এই চিত্রে কলকাতার জীবন্ত রূপ! এই সময় কলকাতার প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির দরজায় অসহায় কান্না-ক্লান্ত কণ্ঠ, অনাহার-ক্লিষ্ট নরনারী ও শিশুদের সমবেত দৃশ্য থেকে শোনা যেত—'মাগো, একটু ফ্যান দাও।'

সুকান্ত-স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সুকান্ত ও সুকান্ত-পরিবারের অতি অন্তরঙ্গ মোহিতমোহন আইচ এমন বর্ণনায় বলেছেন, '১৯৪২-৪৩ সালের কথা। কলকাতার পথে পথে মৃত মানুষের স্তূপ। ডাস্টবিনের আনাচে-কানাচে

কুকুর বেড়ালের সঙ্গে লড়াই করে মানুষগুলোর বিজয়গর্বে স্ফীতকায় জীর্ণ হাড়ের খাঁচায় দ্রুত নিঃশ্বাসের গর্বিত স্পন্দন কিন্তু বেশ বোঝা যায়, রোজ পথ চলতে দুটো একটা মৃত্যু চোখে পড়েই।'

সারা ভারতবর্ষে তখন বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত।

অথচ 'মিলিটারি কণ্ট্রাক্টারদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত!' 'এরাও মজুতদারী, মুনাফাবাজির দিকে!' 'সরকারি অক্ষমতা, হৃদয়-হীনতা, দুর্নীতি ও অপরিমিত লোভের' কারসাজির জন্য পঞ্চাশের মন্বন্তর এত ব্যাপক ও ভয়াবহ।

কবি সুকান্ত এসবের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। ব্যথিত বিদ্রোহী, সহমর্মিতায় কাতর এক সচেতন কিশোর। সাম্যবাদের রাজনৈতিক শিক্ষা তার সম্পূর্ণ হয়ে কবিতায় শিল্প চেতনায় প্রত্যক্ষ প্রয়োগে দীপ্ত।

সুকান্ত দীপ্ত প্রাণে তখন এক সাচ্চা কমিউনিস্ট এবং পার্টি সদস্য। কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় জটিল এক অস্তিত্ব-ব্যাখ্যার সম্মুখীন। কিন্তু সুকান্ত নির্ভীক। তার বিশ্বাস এই জটিলতার একেবারে উর্ধ্বে। সে বিশ্বাস মানবতার। সে শিক্ষাও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের সূত্রে আন্তর্জাতিক মানব্যের। সুকান্ত তখন জনগণের কবি, বিশ্ব-জনতার কেন্দ্রীয় সদস্য বুঝিবা।

এমন পরিবেশ, প্রতিক্রিয়ায় লেখে 'বোধন' কবিতা।

সুকান্ত স্পষ্ট চিত্র দিয়েছে কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে। তার মধ্যে চোলাই মদের মত বিদ্রোহী কবিসত্তার আগুনের আকাঙ্ক্ষা, মত্ততা যেন চোলাই হয়ে আছে শব্দচিত্রের গভীর ব্যঞ্জনায়।

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবাব চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,

এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটাতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

এখানে 'শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো' শব্দ সমষ্টির চিত্রে তারই প্রোজ্জ্বল প্রতিভাস!

বস্তুত এই সমস্ত চরণে যে চিত্র তা সমসময়বর্তী গ্রাম বাংলার, কলকাতার। এক কিশোর এসব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করলে, অনুভূতি-প্রাণ কবি-হৃদয় দিয়ে এসব গভীর স্পর্শে রক্তিম করে না দিলে এমন কবিভাষা আসে কি করে?

'বোধন' কবিতাটি বুঝি এক অতি ক্ষুদ্র সংযত গভীর গম্ভীর উদাত্ত-তার মহাকাব্য—বিষয়ের দিক থেকে! উনিশ শ তেতাল্লিশ সাল যুদ্ধ-সমকালীন কলকাতা তথা বাংলাদেশে এক ক্লাইম্যাক্সের কাল! 'বোধন' কবিতাটিও যেন এই সময়ে লেখা সুকান্ত কাব্যধারায় এই ক্লাইম্যাক্স-চিহ্নিত কবিতা।

'বোধন' কবিতা লেখার সময় সুকান্ত এক নিষ্ঠাবান সমাজ সেবক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন জনগণের সেবার জন্য গঠন করেছে জন-রক্ষা সমিতি। এই সমিতির সভ্য হয়ে, সুকান্ত তখন উদয়াস্ত পরিশ্রমের এক শ্রমিক। মানবতা বিধ্বংসী, মানবতার অপমানকারী এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মজুতদারি, কালোবাজারি, অসহায় বুভুক্ষু মানুষের ভাতের ফ্যান ভিক্ষা—এসবের আকুল ভিড়ে সুকান্ত ওর চারপাশে দেখে হাজার হাজার শীর্ণ, সহায়হীন, আর্ত-আকুল হাত। এদের দিকে তাকিয়ে গোপন কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার:
কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?

কবির এমন সম্বোধন বলিষ্ঠ, বিদ্রোহী সত্তার উদ্বোধকও। এমন পংক্তির মধ্যে কবিকণ্ঠ সজাগ, সতর্ক অথচ ঋজু। শক্ত লাঠির মত তার স্বভাব আর উদ্যত ভাব। 'এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?' চরণে যেন সেই লাঠির ছবি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল্যবান 'বাই প্রোডাক্ট্' হল মজুতদার, মুনাফা-খোর, কালোবাজারি, দালালদের দল। কালো রাতের অন্ধকারেই এদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা! সুকান্ত এত খবর জেনেছিল শুধুমাত্র খবরের কাগজ পড়ে নয়। নিজে ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে, বোমা বর্ষণের আতঙ্কে আতঙ্কিত আড়ষ্ট পরিবেশে, গভীর রাতেও পার্টির কাজে বা কাজ শেষে একা একা বাড়ি ফেরার রাতে দেখেছিল এইসব ঘৃণ্য নবজাত বন্য পশুদের—যারা রক্তচোষা জীব। মানবতার, ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের তাজা রক্ত যারা চোষে—এরা তারা! এরা কর্কট রোগের সেই বীজাণু—যারা সে সময়ের কলকাতা-রূপ মানবশরীরে কর্কট রোগের অসহায় দুরারোগ্য জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল!

সুকান্ত এদের একেবারে কাছে থেকে দেখে, এদের ছায়ার পাশা-পাশি থেকে এদের চিনে নেয়। তাই 'বোধন' কবিতায় এদের সম্বোধন সেই ভয়ংকর রক্তচক্ষুর শাসানিই—

> শোন্‌রে মালিক, শোন রে মজুতদার!
> তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
> হিসাব কি দিবি তার?

সুকান্তর দর্পিত বলদৃপ্ত, আত্ম-অভিমানের কঠিন চিত্ত-ভিত্তি থেকে ঘোষণা—

> প্রিয়ারে আমার কেড়েছিস তোরা,
> ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
> সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
> কখনো ভুলিতে পারি?

আবার সেই মানবতার কথা! আদিম মানব্য! সে যেমন হিংস্র, তেমনি পবিত্র, সৎ, শাশ্বত সত্যের মত জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্গময়। সুকান্তর কণ্ঠে তারই আহ্বান, জয়ধ্বনি এবং সবল অভিনন্দনও!

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্‌রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।

সুকান্ত প্রত্যক্ষ করে মজুতদারের নির্লজ্জ আচরণ। তার কারণ পাশাপাশি দেখেছে নিরন্নদের, গ্রাম থেকে আসা অসহায় চাষীদের। এসময়ে সুকান্তয় তৎপরতা, শ্রম, সক্রিয়তা কি রকমের, ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'অন্তরঙ্গ সুকান্ত' গ্রন্থে এঁকেছেন তারই একটি চমৎকার জীবন-চিত্র।

'…সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলো কি করে এই অসহায় মানুষগুলোকে একটু সাহায্য করবে। তাই দুর্ভিক্ষ পীড়িত এই মানুষগুলোর মাঝে এসে কাজে নেমে পড়লো। একদিকে যেমন নিরন্নের জন্য চেষ্টা করল অন্ন বিতরণের, তেমনই পাড়ার ছেলেদের এবং সংগঠনের সাহচর্যে বিপদগ্রস্ত শহরের মানুষের জন্য চেষ্টা চলল কেমন করে তারা চাল, চিনি, কেরোসিন কয়লা এ সবের যোগান পাবে। এতে তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হতো। শরীরে না কুলোলেও মনের জোরে তার এই অমানুষিক পরিশ্রম করা সম্ভব হল।

চাষী সমাজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে সুকান্ত যেন তাদের মূক মুখের ভাষা বুঝতে পারলো—অনুভব করতে পারলো তাদের অপমান, অসম্মান ও অন্তরের বেদনা। যারা দেশকে যোগায় অন্ন তারা শহরে এসে যেন দেখলো শহরের মানুষের হৃদয়হীনতা, স্বার্থপরতা এবং চরম আত্মকেন্দ্রিকতা। এ অবহেলা এ বেদনা সুকান্তকে ব্যথিত করে তুললো।'

মর্মের এমন ব্যথা-বেদনা আনে কর্মের জোয়ার। সুকান্তর প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতায় রচিত হয় রক্তিম জীবন শপথ!

হে জীবন, হে যুগ সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,

প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।
টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।

এর পরেই কবি স্মরণ করেছে সেই একতার, সংহত হওয়ার কথা—

শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।
তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাসুক ঘর ;
তা যদি না হয়, বুঝব তুমি তো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।

'বোধন' কবিতা প্রত্যক্ষভাবে মারী-মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া ও শিক্ষায় লেখা সুকান্তর মানব্যবোধের সেকাল একাল ও চিরকালের এক মহাকাব্য!

সুকান্তর তখন ষোলো-সতেরো বছর বয়স। কিশোর কবি তখনি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সক্রিয় সদস্য। এই সংঘের উদ্যোগে একটি কবিতা সংকলনের প্রকাশ-আয়োজনে সুকান্ত হল সম্পাদক। সংকলন গ্রন্থের নাম 'আকাল'। এ গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই তেরশ পঞ্চাশে লেখা। এই গ্রন্থের 'কথামুখ' অংশে সম্পাদক সুকান্তর বক্তব্য—'তেরো শ পঞ্চাশ সম্বন্ধে কোন বাঙালীকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কি হতে পারে, কেননা তেরশ পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটি সাল নয়, নিজেই একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।'

'আকাল' সংকলনের কবি ছিলেন বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, ফারুক আহমদ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, অমিয় চক্রবর্তী,

সমর সেন, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ আঠারো জন কবি। কবিতাগুলির নামেই গ্রন্থের নাম এবং কবিদের মনোভঙ্গি ও কাব্যবক্তব্য স্পষ্ট—চালের কাতারে, শ্রাবণ, জঠর, ফ্যান, ১৩৫০, মন্বন্তর, নরক, লাল ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে সুকান্তর ভূমিকায় মূল্যবান কিছু প্রশ্ন ছিল কবিদের প্রতি —'বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা কি চিত্তে ও চিন্তায়, ধ্যানে ও জ্ঞানে, প্রকাশে ও প্রেরণায় জনসাধারণের অভাব অনাহার, পীড়া পীড়ন আর মৃত্যু মন্বন্তরকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন? তাঁরা কি নিজেদের মনে করেন দুর্গতজনের মুখপাত্র? তাদের অনুক্ত ভাষাকে কি করেন নিজের ভাষায় ভাবান্তরিত? এককথায় তাঁরা কি জনগণের কবি?'

এর উত্তর কবি কারোর তোয়াক্কা না করে নিজেই দিয়েছে 'আকালে' সংকলিত তার 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায়—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

মন্বন্তর কি পরিমাণ কাঁপিয়ে দিয়েছিল কবি সুকান্তর মন, তার প্রমাণ আছে সমকালে লেখা 'মনিপুর' কবিতায়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে অতর্কিতে শত্রু তার পদচিহ্ন রাখে
এখনো শত্রুকে ক্ষমা? শত্রু কি করেছে ক্ষমা
বিধ্বস্ত বাংলাকে?

দুর্ভিক্ষের কথায় সুকান্ত মুখর 'ঐতিহাসিক' কবিতাতেও। মন্বন্তর সুকান্তর লেখনীতে ক্রমশ প্রতীক হয়ে ওঠে।

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।

সুকান্তর ব্যঙ্গ করার রীতি অভিনব। যারা মুখ্যত তার ব্যঙ্গের লক্ষ্য, তাদের পিছনে রেখে যারা লক্ষ্য নয় তাদের উদ্দেশ্যে মূল কথাটি

বলে ব্যঙ্গকে ঘুরিয়ে এনে চাবুকের মত সশব্দে, কখনো বা সংগোপনে বসায় জনতার প্রবঞ্চকদের পিঠে।

মূর্খ তোমরা
লাইন দিলে : কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তক্ষয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার।

নারকেলডাঙার জুটমিলের শ্রমিকদের মধ্যে সুকান্ত কিছুকাল কাজ করে। সে সময়ে সে কমিউনিস্ট কর্মী হিসেবে প্রচুর পোস্টার লেখে ফ্যাসিবিরোধী বক্তব্যের। দেওয়ালে আঠা দিয়ে মারার কাজও সুকান্তর। কিন্তু পোস্টার থেকেও কবিতার পংক্তি শুনি সুকান্তর—

এ দেশ বিপন্ন আজ ; জানি আজ নিরন্ন জীবন—
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর ;
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।

'শত্রু এক' কবিতার এই অংশের পাশাপাশি মনে পড়ে 'উদ্বীক্ষণ' কবিতার কয়েকটি চরণ। এই কবিতাও কবি-কর্মী সাম্যবাদী পোস্টার-লেখক সুকান্তর প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্যে থেকেই জন্ম।

নগরে ও গ্রামে জমেছে ভিড়
ভগ্ন নীড় ;—
ক্ষুধিত জনতা আজ নিবিড়।

* * *

কখনো হিংস্র নিবিড় শোকে,
দাঁতে ও নখে—
জাগে প্রতিজ্ঞা অন্ধ চোখে।

কবি-অনুজ অশোক ভট্টাচার্যের ভাষায়—'সুকান্তর জীবনে যুদ্ধের চেয়েও প্রত্যক্ষ আর মর্মন্তুদ হয়ে দেখা দিয়েছিল তেরশ' পঞ্চাশের মন্বন্তর। কর্মী হিসাবে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে।...পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে মানবতার

অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখলেন সুকান্ত। বাংলাদেশের চাষী জনগণের যে অপমান সংগঠিত হল কলকাতায় উন্মুক্ত রাজপথে, তার সবটুকু বেদনাই যেন তাঁর সদ্যস্ফুট অন্তরকে দীর্ণ করে দিল।'

'ফসলের ডাক', 'কৃষকের গান', 'বিবৃতি, 'এই নবান্ন'—এরকম কবিতাও সুকান্ত লিখেছে মন্বন্তর-মহামারীর কথা ভেবে।

এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।

এমন কঠিন প্রত্যয়ে কবিতাটির চরণ রচনার পর কবি সচেতন হয়ে ওঠে একজন কমিউনিস্টের মতই, যে সঙ্গে সঙ্গে কবি প্রাণটিকেও সতর্ক রেখে বলে ওঠে—

আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি ?
(গোপনে একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন ফসল।

'কৃষকের গান' এই কবিতার পাশাপাশি সুকান্ত লিখেছে 'ফসলের ডাক : ১৩৫১'—

কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।
*　　　　*　　　　*
আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,

'বিবৃতি' কবিতা রচনাও যে মন্বন্তরকে প্রত্যক্ষ দেখে, স্মরণ করে এবং তার মানবতা-বিধ্বংসী বৈশিষ্ট্যের প্রতিবাদে, তা কবিতাটির প্রথম কয়েকটি স্তবকেই স্পষ্ট। মন্বন্তরের রূঢ় বাস্তব রূপ এর মৌল প্রেরণাস্থল।

আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল।

সুকান্তর চিত্র রচনার স্বাভাবিকত্ব, সহজত্ব ও সাবলীল ভঙ্গি লক্ষ্য করার মত নিশ্চয়ই—

দুয়ারে দুয়ারে ব্যগ্র উপবাসী প্রত্যাশীর দল,
নিষ্ফল প্রার্থনা-ক্লান্ত, তীব্র ক্ষুধা অস্তিম সম্বল;
রাজপথে মৃতদেহ উগ্র দিবালোকে,
বিস্ময় নিক্ষেপ করে অনভ্যস্ত চোখে॥

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ইতিহাস, তার কবি-উপলব্ধির স্বরূপ কি? সুকান্তর নিজের কথায়, 'সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙা, গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।'

ইতিহাসের যেখানে শেষ, কবিতার সেখানেই শুরু। মন্বন্তরের ইতিহাস শুধু ইতিহাস মাত্র। কবির রচনা ইতিহাসের অন্তস্থলে মহা-মানবিকতার বোধন। সুকান্তর উনিশ শ বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের কবিতা সেই বোধন-মন্ত্র, মহামন্ত্র। বুঝিবা কবির কবিপ্রাণের এক সন্ধিক্ষণের মহামন্ত্র!

তেতাল্লিশ সালে মন্বন্তর, ছেচল্লিশ সালে দাঙ্গা।

দুই মেরুতে দুই মানব্য-বিরোধী পিশাচের আস্ফালন!

তেতাল্লিশ সালের পরিণাম যুদ্ধের, ছেচল্লিশ সালের পরিণাম দেশের অবুঝ, বুদ্ধিহীন, স্বার্থপর মানুষের, রাজনীতিবিদদের অক্ষম আহাম্মক স্বভাবের।

দাঙ্গা যখন শুরু, তার আগে থেকেই সুকান্ত কিশোর বাহিনীর সংগঠক, 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কিশোর বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক, পত্রিকার রিপোর্টারও।

একদিকে পত্রিকায় খবর দেওয়ার দায়িত্ব, কিশোরদের সংযত করার অক্লান্ত শ্রম, আর একদিকে দাঙ্গার মুখোমুখি বসে কবি সুকান্তর লজ্জায় অধোমুখ অবস্থা।

'আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ'। এই আঠারো থেকে কুড়িতে সুকান্ত আর এক সন্ধিলগ্নে সমাসীন। চিরকালের মানবপ্রেমের বিশুদ্ধ তান্ত্রিক। কবিতায় তার আমন্ত্রণ স্বতঃস্ফূর্ত।

মন্বন্তর আর দাঙ্গায় মেলানো সুকান্তর কবিতা বুঝিবা এক কবির জটিল অভিজ্ঞতার ভূর্জপত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতা ও কবি সুকান্ত

'মানুষ হল পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে ব্যাসিলাস্।'

এক ক্ষুব্ধ নাৎসী দার্শনিকের কথাটা বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়।

ফরাসী লেখক অ্যালবেয়র কামুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, আমি মানবতাকে ভালবাসি, মানুষকে না!

এসবের বিপরীত প্রতিবাদী কথা তো প্রচুর আছেই, কিন্তু এরকম সব 'মানব্য' নিয়ে পণ্ডিতদের তর্কের জাল বিশ শতকে অনেক দূর গড়িয়ে যায়।

অথচ মানবতা, মানুষ ছাড়া সুস্থ জীবনবোধের জাগরণ সম্ভবই নয়। মহাভারতে যদুবংশ ধ্বংসের আগে একটা কালো ছায়া বার বার সারা দেশে ঘুরে বেড়াত। সে ছায়া সে বংশের নিয়তি। মানবতা বিরোধী বক্তব্যও তেমনি এক অশুভ ছায়া। কোন জাতি, কোন দেশ, কোন ধর্ম শিক্ষা সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে এমন 'মানব্য'-র অস্বীকার!

সারা পৃথিবীতে কালো চামড়া সাদা চামড়ার যে সংঘর্ষ সে-ও এক মানব্য-বিরোধী আগুন নিয়ে খেলা।

এমন আগুন নিয়ে খেলা হয়ে গেছে উনিশ শ ছেচল্লিশ সালের আগষ্ট, কলকাতা তথা সারা বাংলাদেশের বুকে! এমন কি সারা ভারতেও!

সেই অশুভ ছায়া কালপুরুষের ধীর স্থির উদ্ভব, ভ্রমণ ঘটেছিল সে সময়ে।

তার জন্ম দিয়েছিল কে? কারা এমন সর্বনাশের যজ্ঞের হোতা? কোন্ কোন্ রাজনীতিবিদের ভ্রষ্টাচার এমন পৃথিবী ধ্বংসকারী মারণ-যজ্ঞের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল কলকাতা বুকে?

সুকান্ত তাদের চিনেছিল। চেনার বয়স তখন সুকান্তর। কুড়ি বছরের তরুণ। তখন সে রিপোর্টার 'স্বাধীনতা'র, সে কিশোর বাহিনীর সংগঠক, সে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার 'কিশোর সভা' বিভাগের পরিচালক। সর্বদিকের সর্বসময়ের অক্লান্ত কর্মী সে।

এসবের উর্ধ্বে তার কবিতা। সেই কবিতায় সে প্রমাণ করে গেছে সে চেনে এইসব মানব্য-ধ্বংসী শক্তিকে।

তেতাল্লিশের মন্বন্তর একদিকে তাকে রাজ্যের ভিতরের অশুভ শক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণার প্রেরণা দিয়েছিল, আর একদিকে দিয়েছিল মানবতাকে প্রতিষ্ঠার শপথ।

তেতাল্লিশ সাল থেকে ছেচল্লিশে এসে সুকান্ত আর এক বড় আঘাত পায়, সে আঘাত তার মর্মের গভীরে বাজে।

অবিরল বিরোধ, বিপ্লব, বিদ্রোহের ঘটনায় সারা ভারত তখন উত্তাল। তারই সূত্রে কলকাতায় আসে ক্যাবিনেট মিশন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা আপোষ আলোচনায় ভীষণভাবে ব্যস্ত।

কিন্তু মাৎস্যন্যায়ের একমাত্র অস্ত্র বা দাবার ছক তখন শাসক বৃটিশদের হাতে। একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে মুসলিম লীগ। একদিকে দ্রুত ভারতের স্বাধীনতা দাবি, ইংরেজের ভারত ত্যাগের জন্য চাপসৃষ্টি, আর একদিকে স্বতন্ত্র সার্বভৌম একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই পাকিস্তানের দাবি। একদিকে হিন্দু, আর একদিকে মুসলমান।

মাঝখানে বৃটিশ শাসক। ভিতরে শাণিত ছুরি, বাইরে চোখে-মুখে মৃদু হাসি। এমন শয়তানের খেলা অতি চতুরভাবে ভারতের বুকে চলে অবাধে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লি ও অস্থায়ী সরকার গড়ার। কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষই এসব অস্বীকার করলেও মুক্ত এবং একতার সূত্রে আবদ্ধ গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান তৈরীর আশায় কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। জুনের শেষে ক্যাবিনেট মিশনের বিদায় গ্রহণ।

কলকাতার ছাত্র সমাজ তাতে নীরব নয়। ছেচল্লিশ সালের চব্বিশে

জুলাই বিধান পরিষদের ফটকে হাজার হাজার কণ্ঠ সোচ্চার হয়। কলকাতায় পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ কর্মীদের সমর্থনে উনত্রিশে জুলাই-এ দেখা দেয় বিরাট বিক্ষোভ। হিন্দু মুসলমান এ ধর্মঘটে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। নানারকম বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে যখন সারা দেশ উথগু, উদ্ধত, উত্তাল, তখনি সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিতে মুসলিম লীগ ঘোষণা করে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান'—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। তখন বাংলাদেশে মুসলিম লীগের শাসনকাল। শাসকদলের নির্দেশে এই দিনটি ছিল ছুটির দিন—সারা বাংলাদেশেই।

ষোলোই আগষ্ট, উনিশ শ ছেচল্লিশ। জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে দুঃস্বপ্নের দিন।

কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম? স্বভাবতই সর্বসাধারণের আশা—এ সংগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই!

কিন্তু রূঢ় বাস্তব এর বিপরীত।

বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তে লাল হয়ে গেল কলকাতা তথা সারা দেশের সবুজ মাটি।

মাটির কালো রক্ত, লজ্জায় অপমানে আরো কালো। ভ্রাতৃহত্যা, গৃহযুদ্ধ! কালো রক্ত যেন সেই মহাভারত-বর্ণিত কালপুরুষের স্পষ্ট পদচিহ্ন!

এমন আকস্মিক আন্দোলনে এবং তার গতিমুখ পরিবর্তনে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ থেকে অশিক্ষিত সাধারণ জনগণও স্তম্ভিত, বিহ্বল, বিমূঢ়, হতবাক, নিশ্চল!

এসবের দ্রষ্টা তিন গোষ্ঠী—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, বৃটিশ শাসক।

কংগ্রেসী নেতারা স্থির, নিশ্চল, সহায়হীন।

মুসলিম লীগের নেতারা সাম্প্রদায়িকতায় নিশ্চুপ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর হাত থেকে তখন বাঞ্ছিত দাবার ছক খেলার জয়ে উল্লসিত, মুখে তীব্র ব্যঙ্গের হাসি।

এমন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পটভূমিতে সুকান্তর এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন বোধের জাগরণ। সুকান্ত শৈশবে, বাল্যে, সদ্য-কৈশোরে

মৃত্যু দেখেছে পরিবারে। দেখেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী কলকাতায় তাঁর শ্মশান-যাত্রার রূপ, দেখেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড়, মন্বন্তর, মহামারীতে মৃত্যুর স্বরূপ, দেখেছে ছাত্র-বিপ্লবের, রসিদ দিবসের শহীদদের মৃত্যুবরণের রূপ।

কিন্তু দাঙ্গার মৃত্যু দৃশ্য! সে তো পৈশাচিক, বীভৎস। সমস্ত রকম সভ্যতা, সংস্কৃতির ওপর চিরকালের কালিমা লেপন করার দৃশ্য। যে মৃত্যুদৃশ্য বিপ্লবী চেতনাকে উদ্দীপিত করে, যে মৃত্যু নতুন শপথ গ্রহণে সহায়তা করে, যে মৃত্যু আরও বেশী করে বিপুল কর্মের ভার কাঁধে নিয়ে অনন্ত জনকোলাহলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকর্ষণ হয়ে ওঠে, দাঙ্গার মৃত্যু তো তা নয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মৃত্যু লজ্জায় অধোমুখ করে তোলে মানুষকে। হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। ভাই-ভাই সম্পর্কের মূলে চিরকালের কুঠারাঘাত বুঝি।

উনিশ শ ছেচল্লিশের মাঝামাঝি সময় থেকেই সুকান্তর আবার অসুস্থতা দেখা দেয়। শারীরিক অসুস্থতা। এমন অসুস্থতার গোড়ার দিকের কথা বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট—'…আমার খবর: শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির সময়।…আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার আকাশ।'

সুকান্তর পত্রে সমকালের পরিবেশ সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে। এই সময়েই ছাত্রনেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের চেষ্টায় কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্র 'রেড এড কিওর হোমে' সুকান্তকে ভর্তি করা হয়। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের দশ নম্বর রাউডন ষ্ট্রীটে এই হোম। সুকান্ত এখানে থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে অনেকাংশে।

কিন্তু কবির মনে নেই শান্তি, স্বস্তি। ভিতরে ভয়ংকর অস্থির সে। সাম্প্রদায়িক অশুভ দাঙ্গা তাকে বিমূঢ় করে তোলে। কায়েদে

আজম জিন্নার সেই ভয়-পাওয়ানো শ্লোগান—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান' তখন শহর কলকাতার আকাশে-বাতাসে মুখরিত। এমন ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে কলকাতার বুকে 'শুধু চলেছিলো নারকীয় তাণ্ডব, খুন-খারাবি হত্যা, ধ্বংস লুটপাট আর বহ্ন্যুৎসবের বিশাল আয়োজন।' 'দশদিন একটানা এই নারকীয় হিংসার প্রেতনৃত্য চলেছিল সারা কলকাতা জুড়ে।'

ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বর্ণনা দিয়েছেন সে সময়ের সুকান্ত মানসিকতার—'দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার দিন পনের বাদে সুকান্তের সঙ্গে আবার দেখা হল, আমি অবশ্য যাইনি। ওই এসেছিল আমাদের সন্ধানে। কারণ ওর আছে দুর্জয় সাহস, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় মন। তাছাড়া মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তাই বিপজ্জনক এলাকাগুলো পারাপার করতে ও ভয় পেত না।'

মনের দৃঢ়তা অভিনন্দনের যোগ্য বটে, কিন্তু কবিমনে আসে দিশাহারা ভাব। গৃহযুদ্ধে কবিমন দলিত, মথিত। হিন্দু-মুসলমান নিয়েই সাম্যবাদী সুকান্তর সমস্ত রকম কর্মতৎপরতা ছিল। কিন্তু দাঙ্গা? তার বিশ্বাসে দিল চরম আঘাত। অথচ তার বিশ্বাই তো সত্য! চিরন্তন সত্য! এই সত্য-উপলব্ধি থেকেই জন্ম নিল 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' নামের বিখ্যাত কবিতা। শারদীয় 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশের জন্য লিখিত এই কবিতা।

কলকাতায় শান্তি নেই।
রক্তের কলঙ্ক ডাকে মধ্যরাত্রে
প্রতিটি সন্ধ্যায়।

রক্ত তো বিশুদ্ধ, পবিত্র! মানুষের রক্ত তো তা-ই! এই রক্ত দিয়েই তো শহীদরা আঘাত হেনেছে বিদেশীদের বুকে। সুকান্তর এতাবৎকাল শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল তারই। অথচ আজ নতুন অভিজ্ঞতায় সেই সুকান্তকে বলতে হয়েছে 'রক্তের কলঙ্ক', ভ্রাতৃহত্যার মধ্যে যে রক্ত চোখের সামনে ভাসে সে তো নিঃসন্দেহে কলঙ্কিত রক্তই!

কই সেই জনতার স্রোত ?
সন্ধ্যার আলোর বন্যা
আজ আর তোলে নাকো
জনতরণীর পাল
শহরে পথে।

পীড়িত সুকান্তর কণ্ঠে কি হতাশার সুর শোনা যায়? সুকান্ত কি দুর্বল হয়ে পড়ে ভ্রাতৃহত্যার পৈশাচিক পরিবেশে ?

সারি সারি বাড়ি সব
মনে হয় কবরের মতো,
মৃত মানুষের স্তূপ বুকে নিয়ে পড়ে আছে
চুপ করে সভয়ে নির্জনে।

এমন নিপুণ, দুঃখজনক, বিষাদখিন্ন বর্ণনায়, চিত্ররচনায় সুকান্ত নিজের গভীর অনুভূতির আমেজ রেখে গেছে।

কলঙ্কিত কালো কালো রক্তের মতন
অন্ধকার হানা দেয় অতন্দ্র শহরে ;
হয়তো অনেক রাত্রে
পথচারী কুকুরের দল
মানুষের দেখাদেখি
স্বজাতিকে দেখে
আস্ফালন, আক্রমণ করে।

এমন প্রত্যক্ষ চিত্র অথচ অন্তঃশীল ব্যঙ্গটি কবির মানব্য বিষয়ের ধারণাকে গভীর করে তোলে। কবিও ঘৃণা করে অন্ধকারের দাঙ্গারত মানুষদের। প্রতিটি পংক্তির নিহিত উপমায় জলন্ত ক্রোধের দাবদাহ!

দাঙ্গার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই 'সেপ্টেম্বর ১৯৪৬' কবিতার জনক। সেই গভীর কালো রাতে সুকান্ত পথে পথে ভ্রাম্যমাণ এক পথিক।

সন্ধ্যা থেকে প্রত্যুষের দীর্ঘকাল
প্রহরে প্রহরে
সশব্দে জিজ্ঞাসা করে ঘড়ির ঘণ্টায়

ধৈর্যহীন শহরের প্রাণ :
এর চেয়ে ছুরি কি নিষ্ঠুর ?

*　　　　　　*

শহর মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

এমন চিত্রের আগে কলকাতা শহর কেমন ছিল, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবি সুকান্তর পক্ষে কি রকম ? সেই উনত্রিশে জুলাইয়ের প্রগতিবাদী ঐতিহাসিক আন্দোলনের শিক্ষা। প্রগতিবাদী, কারণ সেই ব্যাপক গণ আন্দোলনে সামিল ছিল সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, চিরকালের মানব্যের বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ হিন্দু-মুসলমান। ধর্মঘট ! ধর্মঘট ! এমন স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট এর আগে জাতির ইতিহাসে বুঝি কোন মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি কোনদিন !

সেই উনত্রিশে জুলাই আর তারই সতেরো দিন বাদে ষোলোই আগষ্ট। দুটি তারিখ কি করে এমন বিচ্ছিন্ন হতে পারে এত দ্রুত ? উনত্রিশে জুলাই তাই আবার কবির কবিতার শেষে এক প্রতীক-প্রতিম কবিহৃদয়-ব্যঞ্জনায় বেজে ওঠে—

জুলাই ! জুলাই ! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা ;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল—
এখনো পায়ের শব্দ যাচ্ছে শোনা।

সুকান্তর কবিতার জন্ম, তার পরিবেশ রচনা যে কবির বিলাসী মনের যন্ত্রণা থেকে নয়, পরিবেশে রক্তিম ছবির শিক্ষা থেকেই, এমন সব পংক্তি পাঠকদের তা ধরিয়ে দেয়।

অক্টোবরকে জুলাই হতেই হবে
আবার সবাই দাঁড়াব সবার পাশে,
আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মতো মুছে যাক ইতিহাসে।

ছবি ! আহ্বান-অভিনন্দন ! আবার সেই শপথ ! সেই প্রতীকী দ্যোতনায় সুকান্তর কবি-আত্মার আর্তি !

দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় লেখা আরও কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। আত্মঘাতী দাঙ্গার স্মৃতি থেকেই 'রেড এইড কিওর হোমে' থাকার সময় ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পাঠায় 'দেওয়ালী' অভিনন্দন। কিন্তু তা আনন্দের নয়, বিষাদের।

আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী ;
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা :
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা ;

সুকান্তর এই হার্দ্য, আত্মিক আত্মীয়তার যে বন্ধন তা বিপদময়, বেদনাময় ভারাক্রান্ত জলভরা মেঘের মত কালো। কিন্তু সুকান্ত বুঝেছিল সাম্রাজ্যবাদীদের অব্যর্থ শিকার এই দাঙ্গা।

কিন্তু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।

এই হল জাত-কবির আশঙ্কা। কবির সমস্ত মানব্যের বাণী এই কারণেই স্বতঃস্ফূর্ততায় রচিত হয়ে ওঠে।

দাঙ্গার কলঙ্কে লিপ্ত ষোলোই আগষ্টের আগের দিনগুলি বিপ্লবের সত্যে উজ্জ্বল, আলোড়িত। দাঙ্গা শেষের দিনে তার জন্যে সুকান্তর তীব্র আর্তি।

এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে ?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে ?
আমার ঐশ্বর্য নেই, নেই রঙ্ নেই রোশনাই—
শুধু মাত্র ছন্দ আছে, তাই দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠাই॥

সমকালে লেখা সামান্য চিঠিটিও দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায়, তার ভয়াল স্মৃতি-অনুষঙ্গে যে রচিত, ওপরের পত্রকাব্য চমৎকার তার প্রমাণ।

কবিরা সবসময়েই অনুভূতি-প্রাণ। যে কোন দুঃখকর ঘটনা বা আনন্দের দৃশ্য তার প্রাণে বেজে ওঠে। সে ধ্বনন ও রণন অনেকাংশে অদৃশ্য ইথারে শব্দে ভেসে যাওয়ার মত। দাঙ্গা যখন হয়, তখন সুকান্ত

অনেক অভিজ্ঞ। অনেক স্মৃতি, অনেক সত্য, অনেক কর্মশক্তির অন্তর্নিহিত দিক তার অধিগত। তাই দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় লেখা কবিতায় সুকান্তর কবি-আত্মার এক ঋদ্ধ দিক চিহ্নিত হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষ দাঙ্গার দৃশ্য সুকান্তর চোখ থেকে ক্রমশ সরে যায় দূরে। দৃশ্যের সত্য হয়ে ওঠে স্মৃতি, কবিতায় হয় প্রতীক। কবি তখন অসুস্থ, শরীরে বলহীন। যাই লেখে তার মধ্যে মনের বলের কমতি যায় না। ষোলোই আগষ্টের পর যেসব কবিতা লেখে, কোন না কোনভাবে দাঙ্গার স্মৃতি সে সবের মধ্যে ছবিচ্ছিন্ন আঠার মত লেগে যায়। 'একুশে নভেম্বর : ১৯৪৬' কবিতাতেও তেমন চরণ—

> পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল,
> ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম উত্তাল ;
> বার বার জিতে জানি অবশেষে একবার গেছি হেরে—
> বিদেশী ! তোদের যাদুদণ্ডকে এবার নেবই কেড়ে।

দাঙ্গা যে জাতির সমূহ লাঞ্ছনা, হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত ঐতিহাসিক কর্মপর্যায়ে এক বড় পরাজয়, অপমান—একথা সুকান্ত নানাভাবে উপলব্ধি করেছে তার কবিতায়। এখানে দাঙ্গার বিপরীতে দেশপ্রেম এবং তার সূত্রে শপথ উচ্চরেণই হয়েছে কাব্য-প্রেরণা। শেষ পংক্তিটি তেমনি ভাবনার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সুকান্তর একুশ বছরের জীবন উল্কার মত তড়িৎ গতি সম্পন্ন, 'দুর্জয় দুর্বার'। কিন্তু সামান্য এই কয়েকটি বছরের মধ্যে আট-নয় বছরের কাল থেকেই সুকান্তর মৃত্যুস্মৃতি সঞ্চিত হতে থাকে। সেই মৃত্যুস্মৃতির একটা বিকাশও বুঝি ছিল। রাণীদির মৃত্যুর অবোধ স্মৃতিতে যার শুরু, রবীন্দ্রনাথের বিশাল মৃত্যুতে বুঝিবা তার স্নানের পরবর্তী পবিত্র অভিজ্ঞতা! আবার প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মৃত্যুতে যার বিকট রূপ, মন্বন্তর, মহামারীতে তার বিকটতার ভয়াল চেহারা! পরবর্তী বিপ্লবে যে শহীদদের রক্ত ও মৃত্যুর ছবি, সেখানে সুকান্তর নতুন বিপ্লবী অভিজ্ঞতার জাগরণ, উত্তরকালে দাঙ্গার মৃত্যু বুঝিবা সমস্ত মৃত্যু-অভিজ্ঞতার চরম অধোমুখ অপমান।

এমন বিচিত্র মৃত্যু-অভিজ্ঞতা নিরাসক্ত কবিদৃষ্টিতে দেখতে দেখতেই সুকান্ত কুড়ি ছুঁয়ে একুশের দিকে এগোয়।

কিন্তু এই অগ্রসর বুঝিবা এক সরল কিশোর কবির চিরস্তব্ধ হওয়ার ভূমিকা মাত্র!

এমন অভিজ্ঞতার ভূমিকা তাকে আশ্রয় দেয় কঠিন জীবনভূমির, দেয় না আগামী দীর্ঘায়ু জীবনের প্রত্যাশা, প্রত্যয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

'আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ'

'আঠারো বছর বয়স কি দুঃসহ / স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি।'

এমনি এক আঠারো বছর এসেছিল সুকান্তর জীবনে। সমস্ত রকম ব্যক্তিত্ব, স্পর্ধা, দুঃসাহস ছিল সে সময়ে। নির্বাধ, ভয়ংকর ভয়হীনতা, নির্ভীক, দুর্বার পৌরুষ ছিল সেই আঠারোর ক্রান্তিরেখায়। দীপ্ত সুকান্ত সমস্ত রকম সংশয়ী দোলাচল সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে।

সুকান্তর কবি-আত্মা এক যাত্রী, এক রানার।

রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়

আঠারো বছর বয়সে 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য / সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'।

কি সে শপথ? কি তার শপথ-নির্ভর কর্মতৎপরতা?

'রানার! রানার!
জানা অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে;
*　　　*　　　*
রানার! গ্রামের রানার
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার;

উনিশ শ তেতাল্লিশের মন্বন্তরের চরম রূপ অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে। অব্যবহিত পরবর্তী চুয়াল্লিশ সাল। কিশোর কবি-রানার সুকান্ত তখন দুঃসহ আঠারো বছর বয়সে পা রেখে যেন বলে ওঠে—'এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে'।

চুয়াল্লিশ সাল থেকে সাতচল্লিশ সাল-এর মধ্যবর্তী কালে সুকান্ত

ভয়ংকর ব্যস্ত, প্রাণের প্রৈতিতে উত্তাল, উদ্দাম জীবনের রথের সে কঠিন সারথি।

সুকান্ত 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা বিক্রী করে বেড়ায়। পার্টি-কর্মী হিসেবে এ দায়িত্ব তার প্রাণের নির্দেশেই নেওয়া। তারই পরিচয় নিখুঁত করেছেন সুকান্তর থেকে দু'-তিন বছরের বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু, সঙ্গী মোহিত মোহন আইচ, তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ অতি-অন্তরঙ্গ সৎ স্মৃতিচারণে—'৪২-এর শীতের সকাল। সকাল ৮টাই হবে বোধ হয়। জনযুদ্ধ পত্রিকা বিক্রীর স্কোয়াড বেরিয়েছে। সুকান্তর হাতে এক বাণ্ডিল জনযুদ্ধ আর কিছু 'people's war' পত্রিকা। আমি সবে অনভ্যস্ত কণ্ঠ মেলাচ্ছিঃ পড়ুন—জনযুদ্ধ পড়ুন।...

'কিশোর বাহিনীর কাজের পরও পাড়াতে পত্রিকা বিক্রীর একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হতো আমাদের প্রত্যেককেই। জনযুদ্ধ পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া আবার তার দাম আদায় করে নেওয়ার কাজে সুকান্ত যে কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল, আজকের দিনে কোন নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী'র কাছেও তা আশা করা যায় না। কী অসীম ধৈর্য ছিল ওর!'

সুকান্ত আবার রিপোর্টার। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ থেকে তাকে সংবাদ যোগাড় করতে হয়, সংবাদ পাঠাতে হয় পত্রিকা অফিসে। এ বিষয়ে চিন্মোহন সেহানবীশের স্মৃতিকথা—'মনে পড়ে 'জনযুদ্ধের' পৃষ্ঠায় চট্টগ্রাম থেকে পাঠানো তার দুর্ভিক্ষ মহামারী ও সামাজিক অধঃপতনের জ্বলন্ত বিবরণ। রিপোর্টার হিসাবে তাকে সেবার পাঠানো হয়েছিল কয়েকটি জেলায়।' সুকান্তর প্রিয় কলকাতা তখন তার একমাত্র আবাস-স্থল নয়। সুকান্ত সারা গ্রাম-বাংলা চষে বেড়ায় পার্টি পত্রিকার ও পার্টির প্রয়োজনে।

একই সঙ্গে সুকান্ত 'কিশোর বাহিনী'র কর্মসচিব। উনিশ শ তেতাল্লিশ সালের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'কিশোরের স্বপ্ন' 'দরদী কিশোর' নামের গল্প, 'রাখাল ছেলে' গীতিকাহিনী, 'অভিযান'

গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখে সারা বাংলাদেশের কিশোরদের দায়িত্ব, কর্তব্য, চিন্তাধারাকে একটি কেন্দ্রে ধরার চেষ্টা করে।

একদিকে কিশোর সংগঠনের ভাবনা, কিশোরদের জন্য গল্প কবিতা লেখার প্রয়াস, আর একদিকে 'জনযুদ্ধে'র জন্য খবর সংগ্রহে কলকাতার বাইরে ভ্রমণ—এমনি কর্ম তৎপরতার মধ্যে সব্যসাচী সুকান্ত চুয়াল্লিশ সাল থেকে ছেচল্লিশ সালের শেষ পর্যন্ত ভীষণ ব্যস্ত থাকে।

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালেই সুকান্ত পায় পার্টি সদস্য পদ। মার্চের শেষের দিকে কলকাতায় গৃহবিবাদ ও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্যে এবং সর্বদল মিলিত থেকে এক মন্ত্রীত্ব স্থায়ী করায় জন্যে যে বিশাল ছাত্র সমাবেশ হয়, কিশোর বাহিনীর পক্ষ থেকে সুকান্তর 'অভিযান' গীতিনাট্যটি অভিনীত হয় সেখানে।

ওই সভার প্রথমেই কবি অমিয় চক্রবর্তীর বক্তব্য ছিল, 'ক্ষুধার অন্ন আমার ঘরে হয়তো নাই, কিন্তু রাজ ভাণ্ডারে অথবা বণিকের ঘরে তো আছে। তাই শুধু হতাশার সুর গাইলে চলবে না। ক্ষুধার অন্ন চাই, বাঁচতে চাই, এই আশা ও আত্মবিশ্বাসের বাণীও আজকের সাহিত্যে ফুটে ওঠা চাই।'

সুকান্তর গীতিনাট্য 'অভিযান'-এর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সেদিন অদ্ভুত-ভাবে এই কথারই প্রতিধ্বনি হয়ে বেজেছিল।

চুয়াল্লিশ সালে মন্বন্তরের ভয়াল রূপ কিছুটা হল স্তিমিত। শুরু হয় পুনর্বাসনের পালা। অর্থাৎ গ্রাম থেকে যারা শহরে এসেছিল ছিন্ন-মূল হয়ে, তারা আবার গ্রামমুখী। হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক আবার ফিরে চলে গ্রামে। কিন্তু শুধু ফিরে গেলেই কি ফেরার শেষ? তাদের নিঃস্ব, রিক্ত হাতে, উদরে, জীবনে সেই প্রাপ্তি কই—যা দিয়ে জীবন হবে মধুময়?

সুকান্ত সেই কৃষকদের চোখ দেখে, দেখে তাদের গ্রামে ফেরার, ঘরে ফেরার, মাটির মায়াকে আনন্দ-উজ্জ্বল চোখে কাজলের মত বুলিয়ে নেবার আর্তি। অগণন কৃষক চলেছে শহর থেকে গ্রামের পথে পথে। কমিউনিস্ট কর্মী—এইসব কৃষক যাতে গ্রামে গিয়ে নতুন ফসল ফলিয়ে

নতুন জীবন রচনা করে মাটি-মায়ের বুক আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে গভীর মমতায়, তারই জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। সুকান্তও কর্মী হিসেবে এই পরিশ্রমের সমব্যথী সমসাথী সমান অংশীদার!

এমনি এক মানসিকতায় রচিত হয় 'ফসলের ডাক : ১৩৫১'।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে।

সুকান্ত যে দেশের জন্যই বলিপ্রদত্ত এক কবিসত্তা, এমন সব পংক্তিতে তা কবি-হৃদয়ের অক্ষরে লেখা!

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে ;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু দাও কাস্তে আজ আমার এ হাতে।

শেষতম চরণে কবি হয়েছে কৃষক। সব্যসাচী সুকান্তর এমন স্বভাব ছিল জীবনে, জীবনের কথায়, কাজে!

কৃষকদের সেই ফিরে যাওয়া তো জীবনের দিকে মুখ ফেরানো! সুকান্ত প্রত্যক্ষ কর্মী হিসেবে, কৃষকদের মধ্যে প্রতিদিন আত্মার আত্মীয়তায় দিন অতিবাহিত করতে উপলব্ধি করে—

নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুব্রতী সংকেত :
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে,,

'কৃষকের গান' কবিতাও ঠিক একই মানসিকতা থেকে লেখা।

এ বন্ধ্যা মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন!

উনিশ শ বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সাল ছিল প্রাকৃতিক ঝড় ও মন্বন্তরের কাল। এ কাল অনুর্বর, শূন্যের, সমস্ত রকম জন্মহীনতার, বন্ধ্যাত্বের।

মানুষ, সমাজ, কাল—সবই বন্ধ্যা, বদ্ধ একএ কমুখ-গলি পথে।
তাই এবার—

এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে :
দুর্ভিক্ষের অন্তিম কবর।

'এ নবান্নে' কবিতাও সুকান্তর প্রত্যক্ষ কৃষক-জীবন ও গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। সুকান্ত তখন গ্রামে গ্রামে সংযোগ রাখে। দলের কাজ, খবর সংগ্রহ কৃষকদের সংগঠিত করা, গ্রামে তাদের যথাযথ পুনর্বাসন—এসব ছিল সুকান্তর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। এ সবের মধ্যেই তার আঠারো বছরের দুঃসাহস যা স্পর্ধায় মাথা তোলার পৌরুষ দেখায়। এই বিশেষ মানসিকতা থেকেই ঘোষিত হল 'এই নবান্নে' কবিতার সেই উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভিক তিনটি চরণ—

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।

কবিতার শেষে কবির নিজস্ব জিজ্ঞাসা, বুঝিবা আত্মজিজ্ঞাসা, আবার সঙ্গে সঙ্গে স্থির প্রত্যয়-চিহ্নিত সিদ্ধান্ত, বুঝিবা সাম্যবাদী কবিরই সিদ্ধান্ত—

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয় যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বচন—
এই হেমন্ত ফসলেরা বলে : কোথায় আপনজন ?

এখানেও কবি প্রতারিতদের পক্ষে। তাদের এমন নবান্নে ফসলের নিমন্ত্রণে সামিল করার দায়িত্বে পূর্ণ দায়িত্ববান কবি।

তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করেছে উচ্চারণ ?
এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ ?

যুদ্ধের মধ্যেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নানান অপবাদ, ঘৃণা, তথাকথিত দেশদ্রোহিতার কথা শুনতে হয়। সুকান্ত তখন পার্টি সভ্য। পার্টিই তার সারাদিনের ধ্যান-জ্ঞান, রক্ত, মাংস, মজ্জা, প্রাণ। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালেও পার্টির বিরুদ্ধে একশ্রেণীর মানুষের প্রবল বিষোদ্গার ছিল, ছিল পার্টিকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে অপমানিত অবহেলিত, একঘরে করার প্রবল প্রয়াস। অথচ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সে সময়ে দেশের মাটিতে জনগণের জন্য অবদান অতুলনীয়, লোমহর্ষক। সাধারণ মানুষ তখন গুজবে, প্রচারে কিছুটা বিভ্রান্তও।

পার্টি কর্মী হিসেবে কবি সুকান্তর মানস প্রতিক্রিয়া কিরকম?

তার সে সময়ের কবিতাই তার সে প্রতিক্রিয়ার একমাত্র দর্শন, বুঝিবা কবিধ্যানের আন্তরিক তর্পণ। পার্টিকে আঘাত, অপমান যে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট কবিরই নিজস্ব অপমান, অস্বীকার, অবহেলা, সুকান্ত ঠিক এই প্রতিক্রিয়ায় কবিতাটি লিখে যেনবা তাৎক্ষণিক বিক্ষুব্ধ মনের জ্বালাকে চিরন্তনী পোষাক পরিয়ে গেছে।

দৃঢ় সত্যের দিতে হবে খাঁটি দাম,
হে স্বদেশ, ফের সেই কথা জানালাম।
জানে না তো কেউ পৃথিবী উঠেছে কেঁপে
ধরেছে মিথ্যা সত্যের টুঁটি চেপে,

কবির ঘৃণা তো নির্মম, ক্ষমাহীন। কবি স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা, সত্যের প্রচারক। কবিদের থাকে নিজ নিজ বিশ্বাসমত সর্বমানবের উপযোগী 'ইউটোপিয়া'! সুকান্তর 'ইউটোপিয়া' আসবে মিথ্যাচারীর প্রতি কামান দাগানোর মত প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠের উতরোলেই—

যারা আজ এত মিথ্যার দায়ভাগী,
আজকে তাদের ঘৃণার কামান দাগি।
ইতিহাস, জানি নীরব সাক্ষী তুমি,
আমরা চেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি,

সুকান্ত আশাবাদী, আজকের ভয়ংকর প্রাণশক্তিতে জয়লাভেই তার প্রাণের স্থৈর্য, শান্তি।

কুয়াশা কাটছে, কাটবে আজ কি কাল,
ধুয়ে ধুয়ে যাবে কুৎসার জঞ্জাল,
ততোদিন প্রাণ দেব শত্রুর হাতে,
মুক্তির ফুল ফুটবে সে সংঘাতে।
ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।

সুকান্ত ছিল রিপোর্টার। নানা খবর তাকে যেমন পত্রিকা অফিসে বসেই অনুবাদ করতে হ'ত গভীর রাতে, তেমনি অনেক খবর গ্রামে-গঞ্জে, মিছিলে-সভায়, কোন দূর অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশানের অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত থেকে সংগ্রহ করতে হত। এসব তার কবিতায় হয়েছে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, কখনো বা প্রেরণাও। সুকান্তর অন্তরের গভীর তলে সব সময়েই ছিল কবিমনের সক্রিয়তা। কোন জটিল কাজ, কোন দুরূহ দায়িত্ব, কোন শ্রমের অসহনীয় ক্লান্তি, কোন রূঢ় বাস্তব-জীবনের জ্বালা তার এই কবিত্বকে সরাতে পারে নি, আহত করতে পারেনি, কখনো কোনো তাৎক্ষণিক অনুভবকে একেবারে নিশ্চিহ্নও করতে পারেনি।

এখানেই সুকান্তর কবিসত্তার অমোঘ জয়। কবি সুকান্ত স্বয়ং যে জন্ম-রানার, তার কবি-প্রাণের এমন অমোঘ বিপ্লবী চলাই প্রমাণ দেয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'খবর' কবিতা রচনায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে সর্বকালের সাংবাদিকদের এমন সার্থক চরিত্র, তাদের সংবাদ রচনার এমন কৌশলী অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হত না।

সংবাদ গ্রহণের কালেও, সংবাদ ভাষান্তরের কালেও সুকান্তর কবি-সত্তা প্রখর, প্রতপ্ত সচেতনায়, অনুভবে রক্তিম।

খবর আসে!
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্‌বাহিনী খবর;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঙ্কৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায়;

কবি এখানে এমন সব শব্দ নির্বাচন করেছে, থমথমে পরিবেশ রচনা করার উপযোগী ধীর লয়ে তার চেতন জগতকে গতিপ্রাণ করেছে, যাতে মনে হয়, স্বভাবী পাঠকও এই অংশ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় সেই খবরের কাগজের অফিসে।

> অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে ;
> অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
> ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
> দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
> কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;
> বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

কবি চেতনার ক্রম-প্রসারণ বিশ্বজনীন প্রতীকে স্পষ্ট হতে থাকে ক্রমশ। কোন কৃত্রিম দর্শন নয়, গভীর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ব্যাপক কাব্যিক চিত্রায়ণ এই অংশের শব্দ, শব্দ চিত্রে, দীর্ঘচরণের ধ্বনি গাম্ভীর্যে থাকায় সুকান্তর অভিজ্ঞতা গভীর প্রোথিত হতে দেখি।

> তোমরা খবর পাও,
> শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।
> ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতায়
> কোনো ফাঁকে ?

এ হল খবরের কাগজে কর্মরত কর্মী, সাংবাদিক সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিপার্শ্বের ছবি ও চরিত্রচিত্র। এই জীবন্ত চিত্রই তার প্রেরণার মূল।

কিন্তু কবি সুকান্তর কবিতা তো সমকালের নামাবলী !

কবি সুকান্তর কবিতায় সমকালই যেনবা তার কবিতার সহ-জ ললাট লিখন।

সাংবাদিক সুকান্তর যে প্রতিক্রিয়া, যে মানস-অবস্থা থেকে 'খবর' কবিতার জন্ম, যার প্রেরণায় কবিসত্তা 'খবর' নামের কবিতা রচনায় আকুল, উদ্বেলিত, সেই বিশেষ মানসক্রিয়া বিশেষ খবরকে অবলম্বন করে, কিন্তু তা ভারতের খবরে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্ব পরিক্রমায় সে খবর রাজার বেশ নেয়।

পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
এই আগষ্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে ?
জলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ?
দুঃসংবাদকে মনে হয় নাকি
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ?

সংবাদ, সাংবাদিক, সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের সমস্ত কর্মী, পরিবেশ কবি সুকান্তর কলমে পায় চিরকালের প্রতীক-প্রতিম ব্যঞ্জনা।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি :
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমদের তন্দ্রার অগোচরেও।

'খবর' কবিতা যেনবা সুকান্তর কর্মজগতের প্রতি মুহূর্তের রোজ-নামচা। তার কবিসত্তার প্রতিদিনের উপলব্ধির সঙ্গে কর্মের জগত তুচ্ছ হয়ে একপাশে পড়ে থাকে নি। সুকান্তর কবিতা তার জীবন, আর জীবনও কবিতাই। এমন কবিতা, এমন জীবন বিলাসের নয়, প্রয়োজনের। ওপরের প্রতীক প্রতিম পংক্তিগুলি তারই প্রমাণ।

কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে।

সাংবাদিক হিসেবে, সংবাদ-পত্রের কর্মী হিসেবে সুকান্ত এই কবিতায় যে ছবি উপহার দিয়েছে তা যেন সংবাদ-পত্রের অফিসে বসা এক রোমান্টিক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আত্মলীন অন্তরের প্রতিবিম্ব। সেই আশাবাদ। সেই শপথ। সুকান্ত কোনদিন যে ভেঙে পড়েনি, দুর্বল হয়নি, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত শপথের সত্যে দীপ্ত থেকেছে, 'খবর' কবিতার শেষতম এই চার চরণে তারই প্রকাশ।

বিখ্যাত 'চিল' কবিতার জন্মের পিছনেও সুকান্তর তুই জীবনের অভিজ্ঞতা জড়িত। বালক বয়সে সুকান্ত একবার কিছু খাবার কিনতে পথে বেরোয়। অবোধ বালক। কলকাতার ফুটপাথে সচেতন, সতর্ক হতে শেখেনি তখনো। হাতে শালপাতার ঠোঙায় খাবার। বুঝিবা অন্যমনস্কও, সে অন্যমনস্কতা বালক মনের সরল অবুঝ বিস্ময়ের সংগে জড়িয়েই!

হঠাৎ ওপর থেকে নেমে এল চিল। অতি আকস্মিক অপ্রত্যাশিত তার নেমে আসা! ছোঁ মেরে সুকান্তর হাত থেকে খাবারের ঠোঙা নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনা সামান্য। কিন্তু বালক মনে তখনকার সেই অসহায় অবুঝ সরল বিস্ময়ের মধ্যেই তা এক চিহ্ন দিয়ে রাখে।

এমন ঘটনা মনের দৈনন্দিন চলার পথে একটি অভিজ্ঞতার 'মাইল-ষ্টোনে'র মত। বিশেষ করে কবির পক্ষে! অন্য সব বালক সহজেই বিস্মৃত হয়ে যায় এসব ঘটনা, কিন্তু সুকান্তর কবিমনে তা ঘটনা নয়, তা গোপন অনুভূতি জনিত অভিজ্ঞতা।

বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত। সুকান্ত কিশোর বয়সের অভিজ্ঞতায় বয়স্ক। কবি-আত্মা তখন শরীরী এবং সচল। এই মানস পরিবেশে সুকান্ত একদিন সেইরকম এক ফুটপাথে অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে এক মরা চিলকে।

চকিতে মনে ভেসে ওঠে অস্পষ্ট স্মৃতির বুকে আর এক চিলের ছবি! তার দীপ্ত চোখে, ক্ষুধিত চোখে, লোলুপ ঠোঁটে ছিল অন্যায়ভাবে অপহরণকারীর লোভ, কাতরতা, হিংস্রতা!

সেই চিলই কি এমন অসহায় আজ? সেদিনের সেই চিলই কি এই ফুটপাতের জনতার কলরোল চলমানতার পাশে এমন পরিত্যক্ত, ঘৃণ্য, উপেক্ষার, তাচ্ছিল্যের বা সর্বহারা শোষকের তুরন্ত প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়?

এর সঙ্গে যুক্ত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন একটি উল্লেখযোগ্য

পটপরিবর্ত্তনের বীভৎস ঘটনা। এই 'চিল' কবিতা এক কমিউনিস্ট-কর্মী ও কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত কাব্য রূপ।

বিশ্বযুদ্ধের পটে যুদ্ধের দুর্মদ রথচক্রের ঘর্ষণের মধ্যে খবর আসে উনিশ শ তেতাল্লিশের পঁচিশে জুলাই চরম ফ্যাসীবাদের সংজ্ঞা-নির্ণায়ক, ব্যাখ্যাকার, প্রয়োগকর্তা ইতালির মুসোলিনীর পদচ্যুতি ও গ্রেপ্তারের। যে দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসোলিনী দ্বিতীয় ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের অন্যতম নায়ক, যে মুসোলিনী আজীবন রক্তপাতের হোতা, যে মুসোলিনীর অঙ্গুলি-হেলনে শাসন ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল, অসংখ্য লোককে গুলি করে মারা হয়েছিল তারই নির্দেশে, সেই মুসোলিনী প্রথমে নিঃশব্দে মঞ্চ থেকে অপসারিত হল বটে, কিন্তু তার মৃত্যুও যে বীভৎস, ঘৃণ্য। সে সময়ে ইতালির মহারাজার নিজ হাতে সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং আবিসিনিয়ায় যুদ্ধের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি মার্শাল বাদোগ্লিওর স্বাক্ষরিত হুকুমনামায় শুধুমাত্র মুসোলিনীর অন্তরীণ জীবন যাপন পোঞ্জা দ্বীপেই অবসিত হয়নি, তা শেষ হয় উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের আঠাশে এপ্রিল পার্টিজানদের হাতে মুসোলিনী ও তার প্রণয়িনী তথা উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চির ধৃত ও গুলিতে নিহত হওয়ার মধ্যে!

মিলানে পার্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হয় মুসোলিনীকে মিলানে ফিরিয়ে আনার, কিন্তু ইতালিয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তির গোপন হুকুম নামায় থাকে সোজাসুজি মুসোলিনী ও তার রক্ষিতাকে মৃত্যুদণ্ড দান ও হননের নির্দেশ। সেই স্পেনের গৃহযুদ্ধের বীর যোদ্ধা ও নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট ভ্যালেরিও উনিশ শ পঁয়তাল্লিশের আঠাশে এপ্রিল ভোরবেলা পনেরো জন সশস্ত্র পার্টিজান সৈন্য নিয়ে বেলিনির সদর দপ্তর এলাকায় মারিয়া নামের এক কৃষক দম্পতির গ্রাম্যগৃহে—যেখানে মুসোলিনী ও রক্ষিতা বন্দী—সেখানে আসে। আর মেজেগ্রা গ্রামের প্রান্তে ফ্যাসিজমের প্রবক্তা ও তার রক্ষিতার মৃত্যু ঘটে ভ্যালেরিওর গুলিতেই।

লক্ষণীয়, এর দু'দিন বাদেই আর এক ফ্যাসীবাদের মুখোশ-পরা নাৎসীবাদের প্রবক্তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলনায়ক হিটলার ও তার

প্রেমিকা ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে বার্লিনের ভূগর্ভের আশ্রয়ে। আর সেদিনই বার্লিন শহরের রাইখস্ট্যাগের ওপর লালফৌজের জয়পতাকা উত্তোলিত হয়।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের প্রথম প্রবক্তা মুসোলিনী ও তার উপপত্নীর মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা বর্ণনায় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যে তথ্যচিত্র ভাষায় উপহার দিয়েছেন তা মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মানের ঘটনা যেমন, তেমনি মানুষের ঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত উন্মত্ত প্রকাশের নমুনাও—'কসাইয়ের দোকানের মাংস ঝুলাইবার হুক দিয়া মুসোলিনী ও ক্লারার মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখা হইল—তাঁদের মাথা নীচের দিকে ও পা দুইটি উপরের দিকে ঝুলিয়া রহিল, ক্লারার স্কার্ট নীচ থেকে মাথার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। একজন মহিলা সেটা তুলিয়া ধরিয়া বেল্ট দিয়া দুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা ইতালির 'সর্বময় প্রভুর' মৃতদেহের উপরে থু থু নিক্ষেপ করিতে, জুতা দিয়া লাথি মারিতে ও অন্যান্য ভাবে অপমান করিতে লাগিল। আর একজন মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মুসোলিনীর মৃতদেহের উপর পাঁচবার গুলি নিক্ষেপ করিলেন তাঁর পাঁচটি পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল মুসোলিনীর মৃতদেহের—ভাষায় তাহার বর্ণনা দেওয়া কঠিন।'

আমাদের দেশে তখন যশোদাদুলাল মণ্ডলের সেই ব্যঙ্গ-কৌতুকের গান—'মুসোলিনী বলে হিটু দাদা / ওঠো না আমি আছি পিছনে/চার্চিল বলে সে এসো রুজভেল্ট, / লড়ব মোরা দুজনে। / হায়, উল্টে গেল হাল উল্টে গেল, / চার্চিল চুরুটে টান দিল।...'

কবি সুকান্তর ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা। ইতালির উন্মত্ত অত্যাচারিত, ক্রুদ্ধ মানুষগুলির ঘৃণা এক ভারতীয় কমিউনিস্ট-কবির কাব্য-ভাষায় পেলো প্রচণ্ড প্রতিবাদের ভব্য, ভদ্র প্রতীকী রূপ। মুসোলিনীর পতনে জন্ম নিল 'চিল' কবিতা:

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম:
ফুটপাথে মরা এক চিল!

চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ ;
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁমারার দস্যু প্রবৃত্তি
তাকে দেখলাম, ফুটপাথে মুখ গুঁজে প'ড়ে।

গল্প বলার রীতিতে কবিতার শুরু। কবির অভিজ্ঞতা, কাব্য বিষয় ও রীতি একসঙ্গে মিশ্রিত।

তার এমন চমৎকার প্রতীকের আবেগে 'চিল'-এর বর্ণনা করতে করতে কবি সুকান্ত জনতার মাঝখানে—যারা আজ এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শোষিত, সর্বহারা, অসহায়—হাতের দুই শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার মত যাদের আর কিছুই নেই—

অনেকে আজ নিরাপদ ;
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ কারণ আজ সে মৃত।

* * *

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সযত্নে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে এল নির্ভয়ে ;
নিষ্ঠুর বিদ্রুপের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচ্যুত এক উদ্ধত চিলকে।

রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ লিখেছিলেন 'দি ড্যাফোডিল্‌স্‌' কবিতা প্রত্যক্ষভাবে 'ড্যাফোডিল' ফুলের পুষ্পিত ঝোপ দেখার এক বছর বাদে। এক বছরে সেই প্রত্যক্ষ দেখার স্মৃতি প্রতীক হয়ে আসে 'দি ড্যাফোডিল্‌স্‌' কবিতায় সর্ব মানুষের স্বভাবী পাঠকদের জন্যে। তাঁর 'লুসি পোয়েম্‌স্‌'-এর জন্মও তেমনি অরণ্যে বাস করে এমন একটি মেয়ের স্মৃতি সূত্রেই। সুকান্তর 'চিল' কবিতার জন্ম এমনি প্রত্যক্ষ ঘটনার স্মৃতির গভীর তল থেকে। মুসোলিনীর পতনের স্মৃতিসূত্রে লেখা 'চিল' কবিতায় সুকান্ত অসাধারণ এক বস্তুতান্ত্রিক কবি। এই

'চিল' কবিতাই সর্বহারা মানুষকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় জয়ী পার্টি-জানদের পাশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল লড়াইয়ে সামিল হতে।

সুকান্ত 'ডাক' কবিতায় চীৎকার করে বলে ওঠে—

দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—
সন্ধিপত্র মাড়াও, দুপায়ে মাড়াও।
তিন পতাকার মিনতি : দেবেনা সাড়াও ?
অজস্র জ্বালা কোটি কোটি ক্রুদ্ধের।

সে কালে সুকান্তর সামনে কি কি লড়াই ছিল ? এক, জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই, দুই, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই ; তিন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। সমগ্র বিশ্বের মানুষের পাশে এমন ত্রিস্তর লড়াই-এ সুকান্ত ছিল এক দীক্ষিত ব্রাত্য। জালিয়ানওয়ালাবাগ, জালালাবাদের পাহাড় আর কলকাতার শহীদের রক্তে লাল ধর্মতলার মোড়—এই তিন যে একই সূত্রে গ্রথিত। সে সময়ে কাশ্মীরে যে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল ছিল যুদ্ধ, তা একাকার হয়ে যায় সুকান্তর ভারতবর্ষের সামগ্রিক সর্বাবয়ব স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণের জন্য এক বিশাল একাতবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে !

কিন্তু হায়, সেই তিন পতাকা আর মিলল কোথায় ? 'চিল' কবিতার সূত্রে যে প্রবল বিদ্রোহের প্রার্থনা, 'ডাক' কবিতায় যে 'ওঁ' শব্দোচ্চারণের মত বিদ্রোহের আহ্বান, তা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে উনিশ শ ছেচল্লিশ সালের বিদ্রোহ থেকে ফেরানো মুখ দগ্ধ কলঙ্কিত হয় সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়। সুকান্তর জীবন-মন-এর অভিজ্ঞতায় সে আর এক মোড় ফেরানো অধ্যায় !

তাঁর কবিতার বস্তুতান্ত্রিকতা উজ্জ্বল হয়ে আছে 'একটি মোরগের কাহিনী' নামের বিখ্যাত কবিতার মধ্যে।

এখানেও আমরা ভুলতে পারিনা সাংবাদিক সুকান্তকে। গভীর রাত পর্যন্ত সংবাদ ভাষান্তরের কাজ সেরে বা কোথাও সংবাদ সংগ্রহ করে ভোরে ফেরার পথে নিশ্চয়ই মোরগের ডাক শুনেছিল সুকান্ত। একবার নয় বহুবার ! একদিন নয়, বহুদিন ! মোরগের অস্তিত্ব সারা

দিনে-রাতে ভোরেই সত্য হয়ে ঘোষিত হয়। মোরগের সে সময়ের পালন কর্তা ছিল প্রধানত মুসলমান সম্প্রদায়। সুকান্ত তখন থাকত বেলেঘাটায় হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়িতে। তারই সামান্য দূরে মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে বাস করার আস্তানা। মোরগের ডাক কি তার কানে যায়নি? অত্যন্ত অবহেলায়, দারিদ্র্যের মধ্যে ব্যবসার কারণেই মোরগগুলি বেড়ে ওঠে বেলেঘাটার সেই মুসলমান পল্লীর মধ্যে।

এ কেবল স্মৃতি।

মোরগেরা—স্নেহে, যত্নে বড় হয় গরীবদের ঘরে, শেষ হয় ধনীদের খাবারের টেবিলে। এমন 'ইন্টারপ্রিটেশান্' আদি, অকৃত্রিম এবং অনবদ্য।

মোরগ—যাকে কিশোর সুকান্ত চেতনার সামান্যতম জাগরণের কাল থেকেই দেখে আসছে, সেই মোরগ কবি সুকান্তর কাছে হয়ে ওঠে চমৎকার এক প্রতীক—শোষকদের শোষণযন্ত্রের রসদ, লক্ষ্য।

সুকান্ত লেখে গীতি-নাট্য, লেখে গল্প। উপন্যাস লেখারও ঝোঁক কম নয়। এসব প্রয়াস উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালের পর থেকে আরও বেশী প্রকট সুকান্তর সাহিত্য-কর্মে।

'একটি মোরগের কাহিনী' জন্ম নিল ছোট গল্পের ব্যঞ্জনায় একটি সার্থক গীতিকাব্যে। মোরগের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার শেষতম পরিণতি যেমন করুণ অমোঘ নিয়তি-নির্দেশক, তেমনি অসামান্য ব্যঙ্গাত্মক হয়ে ওঠে কবি সুকান্তর কলমে।

> তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
> একেবারে সোজা চলে এল
> ধপ্‌ধপে দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে;
> অবশ্য খাবার খেতে নয়।
> খাবার হিসেবে।

সুকান্ত খবরের কাগজের চাকরী নিয়ে খবরের জন্যে বহুবার গেছে গ্রামে। আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সের সুকান্ত অত্যন্ত ব্যস্ত, পরিণত তখন। অভিজ্ঞতার ঝুড়ি শুধু কলকাতায় নয়, শহরতলী থেকে,

মফঃস্বল শহর, একেবারে গণ্ডগ্রামেও সে খুঁজে খুঁজে ফেরে। ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার মত! তুলে আনে। এক সময়ে সে সবই মুক্ত হয়ে ওঠে মনের মণিকোঠায়।

এমন অভিজ্ঞতা পরম ও চরম রূপ পায় 'রানার' কবিতায়। এমন এক অনবদ্য কবিতা—যা শম্ভু ভট্টাচার্যের বুকের পাঁজর কাঁপানো, বোধ হয় 'গলানো' বলাই ভাল, নৃত্যছন্দে সমস্ত জাতীয় জীবনকে উত্তেজিত, আকুল করেছিল এই কিছুকাল আগেও—তা রচিত হয়েছে গ্রামে দেখা রানারকে নির্ভর করেই।

সে সময়ের ডাক ব্যবস্থায় রানারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। সে সময়ের স্মৃতিতে কার না মনে পড়ে এক তরুণ বা প্রৌঢ় ক্লান্ত রানার বাঁ হাতে ধরা কাঁধে ভারী চিঠির বোঝা, ডান হাতে বর্শামুখ, বর্শার গলায় ঘুঙুরের মালা-পরানো লাঠি নিয়ে গ্রামের ছোট ছোট পুকুরের, বাড়ির, ক্ষেত খামারের পাশ দিয়ে দৌড়নোর ছবি! সেই ঘুঙুরের শব্দ! সেই চারপাশের খোড়ো চালের ঘর, দালান. উঠান থেকে উৎসুক বালক-বালিকা, সমস্ত স্তরের মানুষের বিস্ময় চকিত দৃষ্টি! সাংবাদিক সুকান্ত, কমিউনিস্ট কর্মী সুকান্ত গ্রামে গ্রামে খবর সংগ্রহের, সংগঠনের কাজ করার সময় দিনের পর দিন এই রানারকেই প্রত্যক্ষ করেছে।

> কত গ্রাম, কত পথ যায় সরে সরে
> শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে ;
> হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্‌। জোনাকিরা দেয় আলো।
> মাভৈঃ, রানার! এখনো রাতের কালো।
>
> *　　　　*　　　　*
>
> অনেক দুঃখে, বহু বেদনায়, অভিমানে, অনুরাগে,
> ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।

এ এক জীবন্ত চিত্র। এ চিত্রের সঙ্গে কবির সহমর্মিতা অপূর্ব! কবিতায় রানারের প্রতীকত্ব কোন্ সুদূরের ব্যঞ্জনা-মুগ্ধ করে দেয় আমাদের!

> রানার! রানার! কি হবে এ বোঝা বয়ে?
> কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?

এমন সব জিজ্ঞাসা তৈরী হয়েছে সুকান্তর মনে। রানারকে দেখার পর কবির প্রতীকে তার শপথের, উদ্যমের উদ্দামতার কথা কবিতার সিদ্ধান্তে সুদূরের ব্যাপ্তি ও মুক্তির অর্থ পেয়েছে।

এই কবিতাটি কবির কণ্ঠে শোনার অভিজ্ঞতায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর আঠারোই মে, উনিশ সাতচল্লিশের 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় চমৎকার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের এক জায়গায় লিখছেন,—'সে আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলো তার 'রানার' কবিতাটি। সে সুর এখনো আমার মনে বাজে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিলো কবি সুকান্ত রানারের দুঃখ ও ডাকের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তার সঙ্গে চলেছে অন্ধকার ঝড়ের রাতে প্রান্তর নদী অরণ্য পথে—'

জীবনের দৈনানুদৈনিক প্রতিটি মুহূর্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই কবি সুকান্তর কবিতার প্রেরণা, প্রতিক্রিয়া, মূলধন।

'সিঁড়ি, 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি'—এরাও হয়েছে সুকান্তর কাব্যবিষয়, কাব্যের প্রেরণার কেন্দ্র। এগুলি সাংসারিক মানুষের প্রতিদিনের চর্যার সঙ্গে ওতপ্রোত।

সুকান্ত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে কলকাতায় হঠাৎ-হঠাৎ জাপানী বোমাবর্ষণের ঘটনা থেকে। গ্রাম, মফঃস্বল-শহর ঘুরত সুকান্ত পার্টি-সংগঠনের কাজের রিপোর্ট সংগ্রহের তাগিদে। তখনকার মফঃস্বল শহরও ছিল মিত্র-সৈন্যের সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদির টহল দেওয়ার, রসদ যোগান দেওয়ার ঘাঁটি। কলকাতা, তার উপকণ্ঠ বাংলাদেশের মফঃস্বল শহর সর্বত্র মিলিটারি কনভয় দেখেছে সুকান্ত। এ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর্দায় ফেলা আলোর উপকরণ। এই কনভয়গুলিকে ভেবেই কবিতা লেখে সুকান্ত 'কনভয়'।

> হঠাৎ ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল
> যুদ্ধফেরত এক কনভয় :
> ক্ষেপে-ওঠা পঙ্গপালের মতো
> রাজপথ সচকিত ক'রে।

যুগ যুগান্তের ইতিহাসে 'কনভয়' হয়ে গেল এক প্রতীক—কবি

সুকান্তর হাতে। সুকান্ত হিংস্র যুদ্ধের চিত্রকে নিয়ে আসে। জনযুদ্ধের জোয়ার, চিরকালের জনতা,' কর্ষণজীবী মানুষ তাদের প্রাচীন গ্রামীণ মমতা, মমত্ববোধ তথা মানবিকতা সুকান্তর 'কনভয়' কবিতায় কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

সামনে ধূমউদগীরণরত কামান,
গেছেন খাদ্যশস্য আঁকড়ে-ধরা জনতা—
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে দেখলাম,
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক
মমতা।

এই 'কনভয়' কবিতা সুকান্ত পাঠায় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে।

'ঠিক কাব্যের সুর লাগাতে পারেনি—'এই হল সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য এবং কবিতাটির দপ্তর থেকে কবির হাতে ফিরে আসার ঘটনা।

সুকান্তর জেদী কবিমনে নিশ্চয়ই আঘাত লাগে। এ আঘাত ভেঙে পড়ার নয়? ভেঙে গড়ার।

রচনা করল 'ব্যর্থতা' নামে একটা কবিতা—যার, পরে সুকান্ত নাম বদলায় 'মীমাংসা'য়। 'কনভয়ে' ছিল সর্বজনের কথা, 'ব্যর্থতা'য় ব্যক্তি মনের ঈষৎ প্রেমের আমেজ। 'ব্যর্থতা' কবিতার প্রথম খসড়া 'মীমাংসা' কবিতায় কবি লিখছেন:

মত্ত যেথানে দৈত্যে দৈত্যে বিবাদ ভারি:
হানাহানি নিয়ে সুন্দরী এক রাজকুমারী।
(রাজকন্যার লোভ নেই,—লোভ অলংকারে,
দৈত্যেরা শুধু বিবস্ত্রা ক'রে চায় তাহারে।)

আমি একজন লুপ্তগর্ব রাজার তনয়
এত অন্যায় সহ্য করব কোনোমতে নয়—

তাই আমি যেতে চাই সেখানেই যেখানে পীড়ন,
যেখানে ঝল্‌সে উঠবে আমার অসির কিরণ।

সুকান্তর একটা চিঠিতে লেখা—'প্রেমে পড়ে কবিতা লেখা আমার কাছে হাস্যকারজনক।' 'ব্যর্থতা' অর্থাৎ 'মীমাংসা' কবিতার জন্ম বস্তুত এই রকম ব্যক্তিক মেজাজে তৈরী-করা এক কাল্পনিক এবং উদাসীন প্রেম ভাব থেকেই।

'মীমাংসা' কবিতাটি তখন আষাঢ় তেরশ তিপ্পান্ন-র 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয় 'ব্যর্থতা' নামেই। সম্পাদকের চাহিদায় সুকান্ত নিশ্চয়ই নিজেকে বিকিয়ে দেয়নি, কিন্তু চাহিদায় নতুন কবিতা লেখার জন্যে তৈরী হয়েছে—এই মানসিকতা বা প্রতিক্রিয়া থেকেই সুকান্তর কোন কোন কবিতার জন্ম।

আবার সুকান্তর ছিল সচেতন, অতি-সতর্ক ছন্দের কান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এমন ছন্দের কানেই শুধু কিছু কৃত্রিম কবিতা লিখে গেছেন।

সুকান্ত বুঝিবা ছন্দের মেজাজেই একদিন লিখে ফেলে 'স্মারক' কবিতাটি। ব্যক্তি-জীবনের বিচিত্র বর্ণের অভিজ্ঞতা, কঠোর বাস্তব রক্তাক্ত বহু উপলব্ধির যোগ এ কবিতায় নেই। ব্যক্তি জীবনের কল্পনাময়, উচ্ছ্বাসময় প্রেম-ভাবনা? সে তো 'হাস্যকারজনক'! যদি তাই ভেবে কবিতা লিখতে হয়, তা হলে 'স্মারক' কবিতা কেন, কি করে অন্য কবিতাও লেখা হয়ে যায় সুকান্তর সচেতন কলমে?

তার মূলে আছে ছন্দের 'রিদ্‌ম্‌'-এর প্রভাব। হঠাৎ একটা ছন্দের তাল, ঢঙ, যতি, ছেদ, সুর, ধ্বনিপ্রবাহ সুকান্তকে বিভোর করে ফেলে। বিষয়? এহ বাহ্য! একটা ছন্দের ঘোরেই যেন মুগ্ধ, বিস্মিত কবিমন বলে ওঠে—

আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
তবুও পড়িবে মনে।
চঞ্চল হাওয়া যদি ফেরে কভু হৃদয়ের আঙিনায়
রজনীগন্ধা বনে।
তবুও পড়িবে মনে।

কবিতাটির শেষেও সেই একই ঝোঁক, একই ঘোর, ছন্দের পাখায় ভর-করা একই প্রতিক্রিয়া—

বিরহিণী তারা আঁধারের বুকে সূর্যেরে কভু হায়
দেখিনিকো কোনো ক্ষণে।
আজ রাতে যদি শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ ফিরিয়া যায়
হয়তো পড়িবে মনে,
রজনীগন্ধা বনে॥

সুকান্তর প্রেমধারণা সম্পর্কে বন্ধু অরুণাচল বসুর কথা—'প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে তার বিরাগের কারণ কবিতার নামে সে সময়কার আমাদের মধ্যবিত্ত কবিদের অত্যধিক মেয়েলি আত্মমর্ষণ। নচেৎ বিপ্লবী জীবনের সার্থক প্রেমকে সে অশ্রদ্ধা করতো না।'

এককথায় সুকান্তর কবিতা ছিল তার জীবন, জীবনই তার কবিতা; এবং সে কবিতা বানানো নয়, নকল নয়, পূর্ব-সূরীর প্রভাবে তার অনুস্মৃতি নয়, তা জীবন, মানুষ, জনতা, সমাজ—এই চতুর্ভূজে বাঁধা। নামে 'প্রিয়তমাসু' কবিতা, কিন্তু কবির মনের অতল গভীরে যে প্রতিক্রিয়া—যা থেকে এই কবিতার জন্ম, তার রূপ আলাদা!

সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি
স্বদেশের সীমানায়।

সেই কালচেতনা! অর্থাৎ নামেই 'প্রিয়তমাসু', অথচ এসবের উর্ধ্বে কালই: কবির সত্য, কবিতা-জন্মের প্রেরণা, প্রতিক্রিয়া!

তবু লিখছি তোমাকে আজ; লিখছি আত্মস্তর আশায়
ঘরে ফেরার সময় এসে গেছে।

*　　　　*　　　　*

যুদ্ধ চাই না আর, যুদ্ধ তো থেমে গেছে:

*　　　　*　　　　*

পরের জন্যে যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।

এই 'তুমি' কে? কার জন্যে কবির এত মাথা ব্যথা? কবির 'আমি'ই বা কি রকম? কবির রচনার প্রতিক্রিয়া ব্যাপ্তি ঘটায়, সর্বমানবের জীবন-অভিজ্ঞতা তথা মানবতাকে আবৃত করে।

আমি যেন সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে
অথচ নিজের ঘরে নেই যার বাতি জ্বালার সামর্থ্য,
নিজের ঘরেই জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার॥

কবি সুকান্তর কাছে জনতা, মিছিল, পার্টি, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ —সব মিলিয়ে কেমন ছিল? বিদ্যাপতির রাধার কাছে কৃষ্ণ যেমন 'শীতের ওঢ়নী', 'গিরিষের বা', 'বরিষার ছত্র', 'দরিয়ার না'। এমন জনতার সঙ্গে মিশে থাকত বলেই সুকান্তর রাজনীতি আর কবিতা একাত্ম।

সুকান্তর রাজনীতি সুকান্তর ফুসফুস। সুকান্তর কবিতা সুকান্তর হৃদয়-নিষিক্ত রক্তে রক্তিম প্রাণচঞ্চল শিরা-উপশিরা—এসবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাল। জীবন্ত অস্তিত্বের এমন দুই মেরুর যোগেই কবি সুকান্তর কাব্যের জন্ম, জন্মের প্রেরণা সত্য, সুন্দর। তার লেখা শ্লোগানও তাই কবিতা। এ এক আশ্চর্য প্রতিভার স্বীকৃতি, বিকাশ। রাজনীতিই কবিতা হয়ে-ওঠা! পৃথিবীর কোন্ কবির এমন কবিতা আছে? মায়কভ্স্কির? কবিদের এমন মিল, এমন নাড়ীর যোগ জন্মে-প্রজন্মে অচ্ছেদ্য!

সুকান্ত শ্লোগান লেখার প্রতিক্রিয়ায় কবিতা লিখেছে! এসব ঘটনা। এই মানসভঙ্গি বা ক্রিয়া বাংলা কাব্যে সম্ভবত প্রথম। এমনভাবে কবিতার জন্ম হওয়া অভিনব, রোমাঞ্চকর।

সুকান্তর কবিতার জন্মের মূলে এমন মানস প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে সুকান্ত-অন্তরঙ্গ অবন্তী সান্যালের কিছু মন্তব্য নিশ্চয়ই উল্লেখ্য :

'সুকান্তর কবিতায় শ্লোগান আছে, তার কারণ কিশোর সুকান্ত দেওয়ালে দেওয়ালে শ্লোগান লিখতো, মিছিলে মিছিলে শ্লোগান দিতো। কিন্তু সুকান্তর কলমেই সর্বপ্রথম খাঁটি শ্লোগান খাঁটি কবিতা হয়ে উঠে-

ছিল। একমাত্র সুকান্তর কবিতা থেকে এমন প্রচুর শ্লোগান জড়ো করা যায় যা দিয়ে একটা পুরো মিছিলকে সাজানো চলে, আর সে শ্লোগান-গুলির বেশির ভাগ অব্যর্থ বলেই কবিতা, অথবা কবিতা বলেই অব্যর্থ। শ্লোগান লিখতে গিয়েই সুকান্ত লিখেছে এমন আশ্চর্য লাইনটি :

'রক্তে আনো লাল।

রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।' (বিবৃতি)

সুকান্তর মানসিকতায় রাজনীতি ও কবিতায় কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। সমকালের রাজনীতির ছোট বড় সকল কিছুই তার প্রেরণার বিষয় ছিল।'

শ্লোগানের প্রেরণায়, শব্দে, উত্তেজনায়, সমবেত কলশব্দে কবিতার জন্ম। সুকান্তর এমন কবিতা বাংলা কবিতার অগ্রগমনের পথে নতুন ধারার 'মাইলস্টোন'।

মনে পড়ে যায় রাশিয়ান কথাকার বিশ্ববিখ্যাত আন্তন চেখভের একটি কথা—'আমি একটি এ্যাশ্‌ট্রেকে নিয়েও গল্প লিখতে পারি।'

সব স্রষ্টার, শিল্পীর মানোভঙ্গি এই রকম। সুকান্ত জগতের সমস্ত বড় শিল্পীর সমতুল্য, সমকক্ষ, সমান আসনে বসার উপযুক্ত। 'সিঁড়ি', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি' সুকান্তর হাতে হয়েছে নিপীড়িত শোষিত মানুষের প্রতীক। এমন কবিতার প্রেরণা তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার জগতেই, সৃজন তার মনের গোপন প্রদেশে, যেখানে সুকান্তর নিজস্ব জগত—বাসনালোক।

আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সের কবি কবিতায় এক পরম পরিণতির দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু সেই অগ্রসরমানতা এমনি দ্রুত, বিচিত্র এবং জটিল কর্ম ও মর্মের যোগে সম্ভব হচ্ছিল—যার সঙ্গে সমান্তরাল চলছিল না তার শরীর। দৈহিক অসুস্থতা ছিল সুকান্তর ভাগ্য, নিয়তি। তার সমস্ত কর্মপ্রয়াস, মর্মের কবিতা-সম্ভার, তার সৃষ্টি—যা মানসিক বলকেই একমাত্র সত্য করে তুলছিল, তা ছিল তার সমস্ত ভাগ্য ও নিয়তিকে স্পর্ধায় অস্বীকার করার মত একমাত্র অবলম্বন।

সুকান্ত কবিতায়, কর্মে, সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনায় পেয়েছিল চরম-পাওয়া, মুক্তি, আর একই সঙ্গে শ্রেয় ও প্রেয়ের অর্জিত অধিকার, কিন্তু শরীরে নিয়েছিল বন্ধন,—অসুস্থতার, দুর্বলতার, অসহায়তার।

সুকান্তর দেহ-মন আর আত্মা দুই মেরুগামী।

অনেকটা রথে উপবিষ্ট যুদ্ধরত কর্ণের মত। রথের সারথি কৃষ্ণ তার কবি-আত্মা, রথ এবং রথের চাকা তার অসুস্থ অসহায় শরীর, ভূপৃষ্ঠ তার নিয়তি যে তার বাসনাকে অকালেই গ্রাস করে।

কৃষ্ণ নিতে চায় অসীম সুকান্তকে।

শুধু অসহায় সুকান্ত একুশ বছর বয়সেই শেষ পর্বে ভূপৃষ্ঠের গ্রাস-করা চাকা তুলতেই ব্যস্ত। সে অসহায়, সে বিষণ্ণ, সে নিঃসঙ্গ।

চতুর্দশ অধ্যায়

অসুস্থতা-সুস্থতার ক্রান্তিরেখায় কবি সুকান্ত

'কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন। শরীর ভাল করতে দরকার অর্থের, ঋণমুক্ত হতে দরকার অর্থের; একখানাও জামা নেই, সে জন্যেও যে বস্তুর প্রয়োজন তা হচ্ছে অর্থ। সুতরাং অভাবে কেবলই নিরর্থক মনে হচ্ছে জীবনটা।'

এই উক্তিটি সুকান্তর—তার লেখা একটি চিঠির অংশ। সুকান্ত তখন হাসপাতালে নয়, কুড়ি নম্বর নারকেলডাঙা মেন রোডের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী।

এমন চিঠি মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে লেখা—তেরশ তিপ্পান্নর আঠাশে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে। চিঠির মাথায় কোন ঈশ্বর-স্মরণের ভক্তিরসাপ্লুত শাব্দিক সিম্বল নেই, আছে একটি রবীন্দ্রনাথের পংক্তি-উদ্ধৃতি—'তোমার হ'ল শুরু, আমার হল সারা'। চিঠিটা লেখা বন্ধু অরুণাচল বসুকে।

সুকান্ত কি মর্মে মর্মে মনের অবচেতন লোকে উপলব্ধি করেছিল. সে এবার পৃথিবী থেকে চলে যাবে? নাকি, সে-ই চেয়েছিল কোন গভীর গোপন অভিমানে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে?

ওপরের চিঠির অংশটুকু বার বার কেন যেন বিষণ্ণ করে তোলে! বুঝিবা অবিরাম তাড়া করে ফেরে সর্বস্তরের পাঠকদের।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ চিন্তাও।

ভাবতেই পারা যায় না, মৃত্যুর এক বছর আগেও সুকান্তর অর্থের জন্য এমন আর্ত কণ্ঠ। অথচ আজ বাংলা দেশে সুকান্তর গ্রন্থের বিক্রী কি বিপুল! যার সৃষ্টি তাকে বিপুল অর্থ, সম্মান দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত, সে-ই আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে নিদারুণ অর্থাভাবে একুশ বছরের জীবনের শেষতম শ্বাসটুকু বিষম ক্লান্তিতে, গভীরতম অভিমানে, অসহনীয় বিষণ্ণতায় এই পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে।

বন্ধু অরুণাচলকে লেখা চিঠিটা তো জ্যৈষ্ঠের নিঃসঙ্গ দুপুরে লেখা এক অভিমানী কবির নির্জন আর্ত দীর্ঘশ্বাস।

সুকান্ত-স্বভাব সম্পর্কে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি চমৎকার স্মৃতিনির্ভর বিশ্লেষণ—'কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোন দ্বিধা ছিল না।

'কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত যেভাবে লিখেছিল—বেঁচে থাকলে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও সেই একই ভাবে লিখে যেত। সুকান্তকে আমি ছোট থেকে বড় হতে দেখেছি বলেই জানি, এক জায়গায় থেকে যাওয়া সুকান্তর পক্ষে অসম্ভব ছিল।......

'তা ছাড়া কবিতা ছেড়ে সুকান্ত পরের জীবনে উপন্যাসে চলে যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে?'

এই অগ্রজ কবির এখনকার শেষতম প্রশ্নটি নিশ্চয় ভাবায়।

আজকের পরিবেশে যেসব তরুণ সুপ্রতিষ্ঠিত কবি কবিতা লিখে রীতিমত হাত এবং জীবন-অভিজ্ঞতাকে পাকিয়েছেন একই সঙ্গে, তাঁদের কবিতাকে পাশে রেখে একই সঙ্গে গদ্য রচনায় ডুবে যাওয়ার বিষয়টি ভয়ংকরভাবে মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। না, কোন প্রবন্ধ বা রস-রচনায় এমন সব কবি তাঁদের গদ্যভাবনাকে সীমিত রাখেন নি, চলে এসেছেন কথাসাহিত্যিক হিসেবে—গল্প-উপন্যাস রচনায়। গল্প-উপন্যাস সহজেই এবং সবসময়েই কিছু না কিছু, কম-বেশী অর্থপ্রাপ্তি ঘটায়।

শুধু এখনকার তরুণ কবি কেন, অনেক প্রবীণ কবিও এমন বয়স ও জীবন-অভিজ্ঞতার উপান্তে এসে গণসাহিত্য রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাস রচনায় নিবিষ্ট হয়েছেন!

সুকান্ত প্রসঙ্গে এমন সব অনুচিন্তা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শেষতম বক্তব্য-সূত্রে মনে ভেসে ওঠে।

কবি সুকান্ত মৃত্যুর পূর্ব বৎসর থেকেই অর্থের জন্য আর্ত হয়েছিল। তাই এমন একটা প্রশ্ন-সূত্র ধরে দেয়—কবি সুকান্ত 'পরের জীবনে উপন্যাসে চলে যেত কিনা তাই বা কে বলতে পারে?'

এই দুই চিন্তায় কোথাও বুঝি যোগসূত্র থেকে যেত যদি সুকান্ত বেঁচে থাকত আজও—এই আটষট্টি বছর বয়স এরও পর পর্যন্ত।

কথাটা বার বার মনের মধ্যে বাজে, কারণ সুকান্ত নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্ষমতাবান কবি, কিন্তু এসবের মধ্যেও সে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে রচনা করে গেছে গীতিনাট্য, রূপক নাট্য, গল্প, উপন্যাস। অবশ্যই তার উপন্যাস লেখার সংবাদটুকুই পড়ে আছে, সৃষ্টির প্রত্যক্ষ রূপ পাওয়া যায়নি।

সুকান্ত চারজন মিলে একটি উপন্যাস রচনার জন্যে গড়েছিল 'চতুর্ভূজ বৈঠক' নামে এক চক্র। চৌঠা ডিসেম্বর, উনিশ শ'ছেচল্লিশ সালের ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠিতে লিখছে—'ডাক্তারের নির্দেশে সম্পূর্ণ শয্যাগত আছি। কাজেই আগামী 'চতুর্ভূজ বৈঠক'—আমার বাড়িতে বসবে, অরুণের বাড়িতে নয়। আমি সেইমতো ব্যবস্থা করেছি। তুই শনিবার সোজা আমার বাড়িতেই আসবি।'

এই চিঠির ওপর ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ—'সুকান্তর এত অসুস্থতার মধ্যেও কিন্তু উপন্যাসের ব্যাপারে ওর উৎসাহ তখনও যথেষ্ট রয়েছে। শুধু ওর অসুখের জন্য, বাইরে যাবার অক্ষমতায় আসর ওর বাড়িতে বসবে। গত এক বছর ধরে নানা অসুখে বার বার যখন ও বিছানা নিচ্ছে, তখন এই ধরণের উৎসাহ সম্ভবত কমে যাবার কথা। কিন্তু ওর চরিত্র ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। ও ছিল এমনি প্রাণচঞ্চল, এমনি অধ্যবসায়ী।......

......'ওর এতখানি অসুস্থতার মধ্যেই চলেছে সাহিত্য সাধনা। ছেলেবেলায় ও বহু বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ পড়ে ফেলেছিল।......আমাদের উপন্যাসের শেষ বৈঠক এখানেই হয়েছিল।......

'শুরু হল সুকান্তকে যাদবপুর টি. বি হাসপাতালে পাঠানোর তোড়জোড় আর চেষ্টা। সুকান্ত শুনল তার রোগের কথা। কিন্তু ব্যাপারটাকে ও খুব সহজ ভাবেই গ্রহণ করলো।

'আমাদের উপন্যাসখানা নাড়াচাড়া করে একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ দেখিয়ে বললো—"উপন্যাসটা ইচ্ছে করলে এখানেই শেষ করা যায়।'

ও বললো যদি আমরা চাই তো তখনই ও সেটা কোন পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারে। আমি তখন বললাম যে, 'ব্যস্ত হবার কি আছে ?' তখন ও একটু চিন্তা করে বললো, 'আচ্ছা, তবে থাক ; সুস্থ হয়ে ফিরে এসে যা হয় করা যাবে। তখন ঘষে মেজে কোন পত্রিকাতে দিলেই হবে।'

কুড়ি বছর বয়স সুকান্তর। কিশোরের তারুণ্য তখন কবিতা ছাড়াও গল্প-উপন্যাসে প্রবল বেগে আন্দোলিত হতে ব্যাকুল। সুকান্ত যে কত গভীরভাবে উপন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করত, ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এই স্মৃতিচারণের অংশটুকু তা প্রমাণ করে।

সুকান্তর এমন কথাসাহিত্য-প্রীতি, কথাসাহিত্য রচনা করার মানসিকতা ও প্রবণতা এসেছিল তার প্রথম সাম্যবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সময় থেকেই। এ ব্যাপারে তখনকার ছাত্রনেতা, ছাত্র ফেডারেশানের সম্পাদক অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের সুকান্ত-সঙ্গ দান ও সুকান্তকে সহযোগিতার ব্যাপারটি নিশ্চয়ই উল্লেখ্য।

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের স্মৃতি-আলেখ্যর মধ্যে সুকান্তর গল্প-উপন্যাস-রূপক কাহিনী রচনার উপযোগী মানসিকতা গঠনের একটি চমৎকার প্রতিচিত্রণ লক্ষ্য করি।

'......তখনকার ছাত্র-আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। মার্কস্‌বাদের প্রচার ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসাবে একদিকে বিতর্ক, আলোচনা, নকল পার্লামেণ্ট ও অপরদিকে গান, নাটক ও কবিতা-পাঠের আয়োজন ছিল প্রায় নিয়মিত। প্রগতিশীল গান, নাটক ইত্যাদি রচনা ও মঞ্চস্থ করার দিকে ছাত্র ফেডারেশানের গণনাট্য আন্দোলন গণনাট্য সংঘেরও পূর্বসূরী।...... কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন সুর ও ছন্দের কবিতা তখনকার আন্দোলনে প্রভূত উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগায়। এ পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতী মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নূতন

সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে।'

এমন অবস্থায় কবি সুকান্তর পাশাপাশি তার অমোঘ ছায়ার মত কথাকার সুকান্তর প্রতিবিম্বন।

তেমন প্রতিচিত্রণ তার রচনায়, তার কয়েকটি গল্পে ও অসমাপ্ত উপন্যাস ভাবনায়!

আজ কে বলতে পারে, সেই অর্থাভাবের আর্তিতেই সুকান্ত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে কেবল অর্থের জন্যেই উপন্যাস-গল্পে হাত দিত না? কবিতা রচনা হত নিশ্চয়ই, সেই সঙ্গে তার কিছু সময়ও নিশ্চয়ই কথাসাহিত্যে চলে যেত!

সুকান্তর বেশ কিছু কবিতায় আছে গল্পের আমেজ, ব্যঞ্জনা, কথাকারের কলমে আঁকা চরিত্র, পরিণতি-ভাবনা।

এমন ভাবনা কোন দৈব আকস্মিকতায় বা অ-লৌকিক চেতনার ভ্রূণ থেকে আসেনি সুকান্তর মধ্যে, পরিণত রূপও পায়নি সেভাবে। উনিশ-কুড়ি-একুশ বছরের এমন মানসিকতার উৎস অন্বেষণে ফিরে যেতে হয় সেই দশ-এগারো বছরের সুকান্তর জীবনে!

'সুকান্তর তখনকার মানসিক অবস্থার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে 'রাখাল ছেলে' নামক একটি রূপক গীতিচিত্রে। এটি কোন এক রাখাল বালকের কাহিনী,অতি সরল আর তাৎপর্যপূর্ণ এর আখ্যানভাগ।' কথাটি বলেছেন সুকান্ত-অগ্রজ অশোক ভট্টাচার্য।

ছোটবেলায় প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র তখন সুকান্ত। ক্লাশ ফোরে পড়তে পড়তেই 'সঞ্চয়' নামে হাতে লেখা পত্রিকা বের করে। তাতে হাসির গল্প লেখে সুকান্ত। তাছাড়া বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির জীবনী লিখে গদ্যে হাত সহজ করে। নাটকের প্রতি তার ছিল আজন্ম আকর্ষণ! 'ধ্রুব' নাটিকায় সুকান্তর নিজেরই নাম ভূমিকায় অবতরণ তার কথাকার মানসিকতার প্রাক-ভূমি!

এই সমস্ত সংবাদ অতি অল্প বয়সের। 'রাখাল ছেলে'র মধ্যে যে কাহিনী, যে শিশু হরিণীর মৃত্যুভাবনা, রাখাল ছেলের দুঃখ—এসবই

কবি সুকান্তর পাশাপাশি কথাকার সুকান্তর ছায়ার মত লেগে থাকার ফল।

কিন্তু সুকান্তর জীবন একটা প্রবল ঝড়ের মত। তার অবস্থান ক্ষণস্থায়ী, বেগ প্রচণ্ড। ক্ষণ সময়ের অবস্থানেই সে জানিয়ে যায় তার চিরকালীন অস্তিত্বের সবল বার্তা।

তাই কবিতায় সে প্রাণবেগ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ার মুখে, কিন্তু নিঃশেষ না হয়ে স্বতন্ত্র ধারাপথে তার আংশিক প্রকাশ গল্পে, রূপকথা রচনায়, উপন্যাস ভাবনায়। কবি সুকান্ত কবিতাতেই অনেক বড়। নাটক, রূপক, উপন্যাসে তার সেই বৃহতত্ত্ব বহুত্বের বিচিত্র স্বাদ আর এক সুকান্ত-মানসের দর্পণে-বিম্বিত মুখের মায়ায় পাঠকদের সামনে আনে।

'লাইফ ইজ দি বেষ্ট ষ্টোরি টেলার।'

কথাটা কোন্ এক বিদেশী সমালোচকের। কার, কোথায় যেন পড়েছি, নাম মনে পড়ে না! কিন্তু কথাটা মনে লেগে থাকে! জীবনই গল্প বলে, বানায়! সব চেয়ে বড় কথাকার হল মানুষের জীবনই!

সুকান্ত এমন জীবন, এমন জনতার সংস্পর্শে আসে একচল্লিশ সালেই। একচল্লিশ থেকে আ-মৃত্যু সুকান্ত জনজীবনের কান্না, ঘাম রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল। জীবনের বলা গল্প বোধ হয় সুকান্তই সবচেয়ে বেশী, সবচেয়ে আন্তরিভাবে শুনতে পেয়েছিল! তাই সুকান্তর পক্ষেই নাটক, গল্প, উপন্যাস লেখার অধিকার অনেক বেশী।

এ. আই. এস. এফ-এর সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকা, নাটক পরিচালনা করা, বহু বিচিত্র লোকের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ঘটনাবলীই সুকান্তর কথাসাহিত্য রচনার নিশ্চিত প্রেরণা। ফরাসী লেখক আঁরি বেইলে ব্যারন স্তাঁধাল যে জীবন-চর্যা থেকে উপন্যাস লেখেন, দস্তয়ভ্স্কি যে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় ফেলে একাধিক উপন্যাসের জন্ম দেন, হেমিংওয়ের জীবন ও উপন্যাস যে একই অভিজ্ঞতার আয়নায় প্রতিফলন —সুকান্তর তা ছিল।

কিন্তু বয়সের ছোট মাপ—যা তার ভাগ্য তাকে মেপে দিয়ে গেছে

—যা বনবাসকালে সীতার চারপাশে গণ্ডী দেওয়ার মত নির্দিষ্ট, অমোঘ, —তারই জন্যে সুকান্ত কবিতার পথ থেকে বেশী সময় দিয়ে কথা-সাহিত্যে সরে আসার সুযোগ পায় নি।

সময় নেই, ছিল না সুকান্তর। কারণ পার্টির কাজ, কিশোর বাহিনী পরিচালনা, 'স্বাধীনতা'র খবর সংগ্রহের দায়িত্ব, সভা মিছিল, পোষ্টার লেখা, জনসেবা—এসবের মধ্যে রাতের সামান্য নিঃসঙ্গতায় কবিতা লেখা চলে, পোষ্টারে শ্লোগানের ভাষাতেও কবিতার প্রাণকে জীইয়ে রাখা যায়! কিন্তু কথাসাহিত্য রচনায় মন দিতে পারেনি সুকান্ত।

সুকান্তর হাতে নাটক, গান তখন 'আউট অব শিয়ার নেসেসিটি' রচিত হতে থাকে। এসব কাজের মধ্যেই হয়ে-যাওয়া—প্রয়োজনে, নিছক প্রয়োজনেই। অবশ্যই ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে উত্তরিত হয়ে আত্মিক প্রয়োজনেই কবিতার জন্মযন্ত্রণা ছিল তার মধ্যে।

কিন্তু উপন্যাস রচনার সেই ব্যাপক জীবন-চিন্তাকে কেন্দ্রে নিয়ে আসার বুঝি সময় ছিল না সুকান্তর। 'নাই, নাই, নাই যে সময়'! তবু, কবি-অনুজ অশোক ভট্টাচার্যের সুকান্ত স্মৃতিচিত্রে জানা যায়—'অরুণাচল, ভূপেন ও ছোট মামা বিমলকে নিয়ে একটা বারোয়ারী উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন সুকান্ত। প্রত্যেক শনিবার যে বার যাঁর রচিত অংশ পাঠ করার কথা, তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন বাকি তিনজন। তারপর অতিথি আপ্যায়ন সাঙ্গ হলে শোনা হতো উপন্যাসের নবতম অধ্যায়টি। কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় যে যার ইচ্ছামতো কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে চলতেন; একজন হয়তো ফেলেই দিয়েছেন ডোবায়, অন্যজন তাকে উদ্ধার করেছেন সেখান থেকে। কিন্তু দাঙ্গার দরুণ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই নিহত হয়েছিল উপন্যাসটি।

'এঁরা চারজনেই ছিলেন সাহিত্যের প্রতি উৎসাহী, তাই তাঁদের বন্ধুত্বও ছিল নিবিড়। অরুণাচলের কথা বাদ দিলেও, সুকান্তকে দিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন ভূপেন।'

ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সুকান্ত-স্মৃতিকথায় জানা যায়, 'উপন্যাসের

ব্যাপারে এরকম স্থির হয়েছিল যে, লেখার ব্যাপারে সবার থাকবে অবাধ স্বাধীনতা—কি নতুন চরিত্র সৃষ্টিতে, কি ঘটনার চমক সৃষ্টিতে। তবে একটা কথা, বিনা প্রয়োজনে যেন সমস্যার সৃষ্টি না করা হয়। সমসাময়িক ঘটনাগুলো উপন্যাসে আনা আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে।'

সেই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হারিয়ে-যাওয়া অর্ধলিখিত উপন্যাসটির আরম্ভ সুকান্তর হাতে। সুকান্তর দেওয়া প্রথম বর্ষের কলেজ-পড়া নায়কের নাম সনাতন, নায়িকা অল্প শিক্ষিতা ললিতা, খল নায়ক বিজয়। তাদের বস্তিতে বাস। বাবা কারখানার কর্মী, মদ্যপ। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে।

উপন্যাসটির শুরু উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ সালে। লেখার চিরস্তব্ধ অবস্থা আসে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশে, শেষে সুকান্তর অসহায় অসুস্থতার কবলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

লক্ষ্য করার বিষয় হল, উপন্যাস লেখার ও মানসিকতার শুরু সুকান্তর উনিশ বছর বয়সে। তখন সুকান্তর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিবিধ বিচিত্র রসদে পূর্ণ! বিখ্যাত কয়েকটি কবিতার জনক সে! উপন্যাসের বিষয় বস্তিবাসীদের নিয়ে। এসব থেকে বোঝা যায়, কথাকার সুকান্ত উপন্যাস রচনার পরিবেশ, পটভূমি, বিষয় যথার্থই চিনেছিল—অন্তত সেই ভয়ংকর উদ্‌ভ্রান্তির কালে!

সুকান্ত ধর্মঘট নিয়ে গল্প লিখেছে 'হরতাল', নাটিকা লিখেছে 'দেবতাদের ভয়'। একজন জাত-কবির পক্ষে কথাসাহিত্যের শাখায় অল্প সময়ের জন্যে হলেও ভ্রমণ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ!

নিশ্চয়ই অর্থচিন্তা এসবের উৎস নয় সে সময়ে, সেই সুকান্ত-মানসিকতায়। তখন সুকান্ত ভীষণতম কর্মব্যস্ত—চারদিকে তার কাজের সূত্রেই রচনার চাহিদা। রবীন্দ্র-প্রভাবিত থেকে গান লিখে চলেছে একদিকে, শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি মঞ্চে, নানান সভায় নাটিকার অভিনয়ের কারণে নাট্যচিন্তাও তার সাহিত্য-ভাবনায় ওতপ্রোত থেকেছে।

এসবের মধ্যে দল বেঁধে উপন্যাস রচনা। আবার তার মূল উদ্যোক্তা, নিরলস উপদেষ্টা, মুখ্য প্রস্তাবক এবং প্রথম লেখক সুকান্ত

স্বয়ং। শুধু তাই নয়, এসবের জন্যে যেনবা রুটিনমাফিক চিন্তা, কর্মতৎপরতাও সুকান্তর অসাধারণ।

এমন মানসক্রিয়া নিশ্চয়ই কবির অন্তর-নিহিত ছিল। বালক-কালে 'রাখাল ছেলে'র মধ্যে যার হাতেখড়ি, উত্তপ্ত শেষ কৈশোরে রক্তের উষ্ণতায় তাকে নতুন শপথে, নতুন অঙ্গীকারে গ্রহণ।

কোন সার্থক স্রষ্টার পক্ষে কবিতার মত গল্প উপন্যাস রচনার পরিণতির মধ্যেও থাকে গভীর সনিষ্ঠ অনুশীলনী বৃত্তি। সুকান্তর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। যখন সে পরিণত হবার মত অঙ্গীকার জানিয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত, তখনি সেই নির্মম ঘাতক মৃত্যু তার সামনে হাজির।

অসম্ভব প্রাণশক্তি ছিল সুকান্তর। যাদুকরের যাদুদণ্ড তার হাতের মুঠোয়। অথবা, সেই জ্যোতিষী যে সকলের ভাগ্য বলে, ধরতে পারে, কিন্তু নিজের ভাগ্যগণনায় নিজেকে ধরতে গিয়ে কোথায় যেন ভুলটি করে ফেলে? সুকান্ত সকলের জীবনকে বুঝতে পারত, ধরতে পারত বলেই তার কবিতা ছিল এমন স্পষ্ট, পরিষ্কার—অপরকে বোঝানোর পক্ষে অব্যর্থ।

কিন্তু নিজের জীবনকে জীবন দিয়ে নিজের মত করে বোঝা? তা সুকান্ত বুঝি জানত না। জানত না বলেই সমস্ত শারীরিক অসুস্থতাকে অস্বীকার করেই সে প্রবল প্রাণশক্তির যাদুদণ্ডে এগিয়ে যেত।

> এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছু ফেলে,
> পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌছে দিয়েছে 'মেলে'।

অদম্য প্রাণশক্তির কারণেই সুকান্ত সচল জীবনের বুকে সবল শহীদ! জীবনের শক্তি জীবনের সৃষ্টিশক্তির কাছে যে হেরে যাবেই!

সুকান্তর মধ্যে ছিল জীবনেরই সৃষ্টিশক্তি। জীবনের শক্তি তাই তার কাছে তুচ্ছ। জীবনের সৃষ্টি শক্তির কাছে জীবনের শক্তির এমন শহীদ হওয়ার অর্থই হল অনন্তকালের প্রবলতম অ-দৃশ্য প্রাণশক্তির ধর্ম।

সুকান্ত একুশ বছরে অসুস্থ থেকেছে শরীরে! মনের শক্তিতে সে

কিন্তু সপ্রাণ, সুস্থ, হাস্যময়। তার চিঠি, তার আচরণ কতাবার্তায় তার স্বাক্ষর। এ বিষয়ে মোহিতমোহন আইচ্-এর একটি মূল্যবান স্মৃতিচারণ:

'বিপরীত এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুকান্তকে দেখেছি রোগশয্যায়। সেখানে দেখেছি লড়িয়ে সুকান্তর অন্তগামী বর্ণাঢ্য। Boris Polevoi-এর সেই যুগান্তকারী উপন্যাস 'The Story of a Real Man'-এর সেই Commissar-এর মতই মনে হয়েছে ওকে। যিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হতেন না এতটুকুও। কারণ কাতরতা প্রকাশ তার কাছে মনে হতো আত্ম-অবমাননা। যথাসময়ে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়ানো, পরিপাটি অঙ্গসজ্জায় ব্যস্ত সেই পৌরুষ শেষদিন পর্যন্ত মৃত্যুকে অস্বীকার করে গেছে।'

একবার প্রাণতোষ ঘটকের কাছে সুকান্ত সাংবাদিক সুকুমার মিত্র, কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের খবর নেয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের ঘটনা। প্রাণতোষ ঘটক সেই স্মৃতিসূত্রে লিখছেন, 'হ্যাঁ, সবাই ভাল আছেন। শুধু তুমিই ভাল নেই।' আবার সেই নিঃশব্দ হাসি। হাসতে হাসতে বলে: 'মাঝে মাঝে ভাল থাকি।' এই সেই সুকান্ত যার উদাস রূপ এবং স্বরূপ ছিল স্বভাবে, কথায়! মাঝে মাঝে ভাল থাকতেই যেন তার সম্পূর্ণ বেঁচে থাকা! তা না হলে সেই 'নিঃশব্দ হাসি'-টি মুখে অবলীলায় ছড়িয়ে থাকে কি করে?

শরীরকে স্বীকার, না অস্বীকার? কোথায়, কোন্ সূত্রে মনের ভিতরের শক্তির এমন জয় ঘোষণা?

হাসপাতালে শায়িত সুকান্ত সরল, নিষ্পাপ। ভাবনায় এখনো সে অজ্ঞ!

চিরকালের রোমান্টিক প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত জীবন-স্বভাবের ধর্মই এই!

পঞ্চদশ অধ্যায়

গোধুলির ম্লান আলোয় কবি সুকান্ত

সারা পৃথিবীতে অল্প বয়সে কোন কোন কবির মৃত্যু এক চিরকালের বিস্ময় আর আকর্ষণীয় সংবাদ হিসেবেই স্বীকৃত।

কবি সুকান্ত এক নতুন ঝড়, পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত বেগবান এক বন্যা—যা সৃষ্টির প্রথমে প্লাবিত ছিল। কবি সুকান্ত রাবণের চিতার অনন্ত বহ্নির মত ঊর্ধ্বমুখী দীপ্ত আলো। সুকান্তর জীবন আর কবিতা একসূত্রে মাতা-সন্তানের নাড়ীর যোগের শক্তিতে এক প্রজন্মের অধিকার। এমন ব্যক্তিজীবন আর তার সৃষ্টির যোগ পৃথিবীতে কোন্ কবির আছে—যার জীবৎকাল মাত্র একুশ বছর? ছিল ঔপন্যাসিক দস্তয়েভ্‌স্কি এবং আরো অনেক কথাকারের। সুকান্তর জীবন, কবিতা, মৃত্যু এক অনন্ত বিস্ময়! এই তিন রূপ যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃজন, পালন, সংহার!

দেবতার মত সৌম্যদর্শন শেলীর মৃত্যু হয় তিরিশ বছর বয়সে, বন্ধু উইলিয়াম্‌সের সঙ্গে নৌকায় সমুদ্রে ভ্রমণকালে, আকস্মিক ঝড়ের দুর্ঘটনায়। কবি কীটসের মৃত্যু আরও কম বয়সে—মাত্র ছাব্বিশ বছরে! অসুখ ছিল ক্ষয়রোগ। রোমে চিকিৎসার সময় গোপনে প্রচুর আফিঙ খেতে খেতে দ্রুত মৃত্যুর কাছে যাবার জন্যেই কীট্‌স শেষ হয়ে যান।

ইংরেজি সাহিত্যের 'ওয়ার পোয়েট' রিউপার্ট ব্রুক মারা যান মাত্র আঠাশ বছর বয়সে। যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু! ইনি ছিলেন উনিশ শ চোদ্দ থেকে আঠারো সালে সংঘটিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবি। একই সময়ের কবি হলেন চার্লস্ সোর্লে এবং উইল্‌ফ্রেড ওয়েন। এই দুজন সম্পর্কে আর্থার কম্পটন রিকেটের বক্তব্য—'ট্রু, কিল্‌ড্ হোয়েন লিট্‌ল্ মোর ছান্ বয়েজ, ভয়্যার প্রোব্যাব্‌লি দি গ্রেটেস্ট লস্ ছাট্ ইংলিশ পোয়েট্রি

সাফার্ড ইন দি ওয়ার'। সোর্লে এবং ওয়েন মারা যান যখন তাঁদের বয়স আঠারো-উনিশও অতিক্রম করে নি!

আমাদের দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাধর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কথাকারের মৃত্যু দেখি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে! আর দেখি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রতিভাবান একালের কথাকারের অপরিণত বয়সের মৃত্যু সেই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই। ইনিও একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট-কথাকার যিনি কোনদিন কোন আপোষে যান নি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাষট্টি সালে ভাঙার পরেও না! সুকান্তর বয়স এঁদের অর্ধেকেরও কম!

সুকান্ত একাধিক ইংরেজ কবিদের থেকে দু-তিন বছরের অগ্রজ। কবিসাহিত্যিকদের বয়সের কাল-ঠিকুজিতে এই তফাৎ তেমন কোন দূরত্বের ছাপ রাখে না। কিন্তু সুকান্ত সম্পর্কে কম্পটন রিকেটের কথাটা ঈষৎ বদলে যদি বলি —'প্রোব্যাব্‌লি দি গ্রেটেস্ট লস্‌ দ্যাট্‌ বেঙ্গলি পোয়েট্রি সাফার্ড ইন দি ওয়ার!'

নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু বোধ হয় কবি সুকান্তর কাব্যের সীমা কিছু সীমিত হয়ে পড়ে এতটুকু ভাষণে। সম্পূর্ণ সুকান্তকে বুঝি ছোঁয়া যায় না এতে!

সুকান্ত যুদ্ধের কবি নয়, যুদ্ধ-প্রতিক্রিয়ার কবি!

সেই যুদ্ধ, যা ছিল জনমনে অন্তঃশীল, কর্কট রোগের মত সমকালের সমাজে ও জীবনে অন্তরীণ ব্যাধি—তারই কবি। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ তথা কলকাতায় যুদ্ধ হয় নি, কয়েকদিন মাত্র ঝড়ের বেগে জাপানী বোমাবর্ষণে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ প্রত্যক্ষ হয়েই চলে যায়। ছড়িয়ে যায় ভয়াল ব্যাধির বীজাণু—মজুতদার, মুনাফাখোর, কালোবাজারি; দিয়ে যায় বিকৃত বীভৎস ব্যাধির মত মন্বন্তর! পাশাপাশি আসে যেনবা রোগমুক্তির দাওয়াই—দেশের ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন, গণবিক্ষোভ, সাম্যবাদী রাজনীতি-জড়ানো দল, সংগঠন, মিছিল, জনতা, শ্লোগান—দেশের জাতীয় জীবনে সর্বাবয়ব সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ,

উপনিবেশবাদবিরোধী জটিলতা, এবং সর্বশেষ এই সমস্ত কিছুর তলানি আর এক নতুন রোগের উপসর্গ চিরকালের মানবতা-ধ্বংসকারী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা !

সুকান্ত এই সমস্ত কিছুর তীব্রতম প্রতিক্রিয়ার কবি !

এমন অল্প বয়সে মৃত্যু বরণ করেও শেলী কীট্‌স্ শুধু নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন যুদ্ধবিষয়কে কবি রিউপার্ট ব্রুক, চাল্‌স সোর্লে এবং উইলফ্রেড ওয়েনের থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন কবি, সুকান্তর অভিজ্ঞতা আরও বিস্তৃত, ব্যাপক, পরস্পর-বিরোধী আলোর চড়া রঙে হতবুদ্ধিকর।

শেলী, কীট্‌স, ব্রুক, সোর্লে, ওয়েনদের এত অল্প বয়সে মৃত্যু ! ঘটনা, না দুর্ঘটনা ? সম্ভবত দুইই। আজকের বিশ্ব অবাক হয়ে এই সংবাদ শোনে, মনে রাখে গভীরতম বেদনার সঙ্গে।

কিন্তু বাঙালী কবি সুকান্তর মৃত্যু মাত্র একুশ বছর বয়সে ! বয়সের মাপে কিছুটা সোর্লে, ওয়েনের কাঁধে কাঁধ মেলানো। কিন্তু সুকান্তর মৃত্যুর দুঃখ যা সমস্ত বাঙালী বোধ করে হৃদয়ের গভীরে, তার স্বরূপ ? সুকান্ত-অন্তরঙ্গ অগ্রজ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য মনে পড়ে যায়, 'পৃথিবীর আর কে কোথায় দেখেছে একটি কিশোরকে হারিয়ে সারা দেশ কাঁদছে।'

সুকান্তর মৃত্যুও ঘটনা, এবং দুর্ঘটনা। আন্ত্রিক ক্ষয়রোগ ছিল সুকান্তর কাল ব্যাধি।

শেলী তার মৃত্যুর জন্যে তৈরী ছিলেন না। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত জানার পর কীট্‌স চেয়েছিলেন মৃত্যু। ব্রুক, সোর্লে, ওয়েনও যুদ্ধ সামনে রেখে মৃত্যু দিয়ে জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সুকান্ত চায়নি, একবারও চায়নি এই মৃত্যু।

তবু মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। সুকান্ত যে চায়নি সে কথা নানাভাবে সে জানায় চিঠিপত্রে, কবিতায়। কিন্তু মৃত্যু তাকে চেয়েছিল। মৃত্যু যে আসন্ন, একথা বুঝেই কি এমন কবিতা রচনা ?

আমার মৃত্যুর পর থেমে যাবে কথার গুঞ্জন,
বুকের স্পন্দনটুকু মূর্ত হবে ঝিল্লীর ঝংকারে
জীবনের পথপ্রান্তে ভুলে যাব মৃত্যুর শংকারে,
উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন।

এমন চরণগুলিতে কবির দুঃখার্তি কে অস্বীকার করতে পারে? পয়ারে লেখা ধীর গতির ছন্দে কবিমনের বিষণ্ণতা যেন ম্লান ছায়ায় ভাসতে থাকে।

পরিচয়ভারে ন্যুব্জ অনেকের শোকগ্রস্ত মন,
বিস্ময়ের জাগরণে ছদ্মবেশ নেবে বিলাপের
মুহূর্তে বিস্মৃত হবে সব চিহ্ন আমার পাপের :
কিছুকাল সন্তর্পণে ব্যক্ত হবে সবার স্মরণ।

চোখে'জল আনে এমন সব পংক্তি। মৃত্যুর চিন্তায় সুকান্ত নিজের পাপের কথা ভেবেছে! কার পাপ? কবি সুকান্তর, না ব্যক্তি সুকান্তর? সকলের কাছে এক মুমূর্ষু কবির এ কি ধরণের 'এলিজি'?

আমার মৃত্যুর পর, জীবনে যত অনাদর
লাঞ্ছনার বেদনায়, স্পষ্ট হবে প্রত্যেক অন্তর।

এক একুশ বছর বয়সের কবির মনে এমন মৃত্যু-চিন্তা আসে কি করে? রাণীদির মৃত্যু, পারিবারিক একাধিক মৃত্যুদৃশ্য ও স্মৃতির মধ্যে মায়ের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় সে কেবল শ্রোতা ও দ্রষ্টা মাত্র।

দেখেছে মন্বন্তরে মৃত্যুর মিছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, ভয়াল যুদ্ধের বোমাবর্ষণে মৃত্যু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যে মৃত্যুর কালোরূপ দেখেছে সুকান্ত, তা-ও কবি হিসেবে বিচ্ছিন্ন থেকে দেখা, নিরাসক্ত চিত্তে দেখা। বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে শহীদদের মৃত্যু দেখা বা তার খবর শোনার মধ্যেও সেই প্রত্যক্ষ সহমর্মিতা, কিন্তু কবির নিরাসক্তিও!

আর 'আমার মৃত্যুর পর' কবিতায় কবির এমন সচেতন মৃত্যু-ভাবনা কেন? এখানে যেন সুকান্ত স্বয়ং মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে ক্লান্ত! সেই বার্গম্যানের চলচ্চিত্রের নায়কের সঙ্গে মৃত্যুর দাবা খেলার মত।

সুকান্ত নিজের মৃত্যু-ভাবনার কবিতাতেও সেই নিরাসক্তি রেখে গেছে।

তবু এসবের পরেও কথা থেকে যায়। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ?'

সুকান্ত শরীরে যে অসহায় হয়ে পড়ছিল, নিজেও বুঝি জানতো।

সরলা বসুর স্মৃতিচারণ—'সাড়ে তিন বছর ধরে সুকান্ত নানা রোগে ভুগছিল। একটু যত্ন করবার কেউ ছিল না। ভাইগুলোকে উপদেশ দিতাম ওর খাবারটার 'পরে নজর করবে। যখন অরুণের মুখে শুনলাম ওর টি. বি. হতে পারে, ডাক্তারেরা শঙ্কিত হয়েছেন তখনি জেনেছিলাম ও আর বাঁচবে না।'

উনিশ শ চুয়াল্লিশ সালে সুকান্ত অক্টোবর মাসে বেনারসে যায় কদিনের জন্যে বেড়াতে। সেখানেই ওর প্রথম বড় অসুখ ধরে—ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া। সেরে উঠে আবার জ্বরে পড়ে। আগে থেকেই নানা কাজে অমানুষিক পরিশ্রম করত সুকান্ত। তার ওপর খাওয়া-দাওয়ার নিত্য অনিয়ম। শরীরের ভিতরে শক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হওয়ার দিকে। এরই ওপর প্রথম অসুখের প্রবল আঘাত।

অরুণাচল বসুকে লেখা সুকান্তর চিঠি, '···যে ম্যালেরিয়া তোকে প্রায় নির্জীব করে তুলেছে, আমি এখানে আসার পঞ্চম দিনে তারই কবলে পড়ে সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করার পথে···ভাল লাগছে না; অনেকদিন পরে ফিরে পাওয়া তামার পয়সার মত ম্লান লাগছে। আর শরীর এখন খুবই দুর্বল। কারণ এ কদিন সাংঘাতিক কষ্ট গেছে। তোকে রীতিমত কষ্ট করেই লিখতে হচ্ছে। আর লিখতে পারছি না।'

দ্বিতীয় অসুখের সময় সুকান্তর চিঠি,—'আমি আবার অসুখে পড়েছি।···কিন্তু বেলেঘাটায় ফিরে যেতে আশঙ্কা হচ্ছে।···আমি ম্যালেরিয়ার রোগী হয়ে কি সেখানে প্রবেশ করতে পারি ? বিশেষত আমি যখন ম্যালেরিয়া-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে আর রাজী নই। ···এখন আবার জ্বর আসছে।'

পঁয়তাল্লিশ সালে সুকান্ত আবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরেই

টাইফয়েডে আক্রান্ত! কলকাতায় তখন গণ আন্দোলনের জোয়ার। সাম্যবাদী কবির বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব কি করে? বাইরে তখন জীবনের জোয়ার। ভয়ংকর মানসিক শক্তি আর আত্মবিশ্বাসে সুকান্তর অসুস্থতা একটু কমলে বিশ্রামের বদলে বিরামহীন মিছিল-যাত্রায় সামিল হয়ে পড়ে ও।

এর মধ্যেও কবিতা রচনা বন্ধ হয়নি সুকান্তর। মনে দীপ্ত, শরীরে ক্লান্ত। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে সুকান্ত শরীরে। যে দাঙ্গার সূচনা যোলই আগষ্ট ছেচল্লিশ সালে, সাতচল্লিশ সালেও তার স্রোত বয়ে চলে কলকাতায়!

একটা বিষাক্ত ঘা শরীরের এক স্থান থেকে একাধিক জায়গায় ছড়ায়। কলকাতার শরীরে তখন একাধিক দুষ্ট ক্ষত! তা আর নিরাময়ের পথ পায় না। কলকাতা যেনবা একটা বন্ধ গলি! সমস্ত মানবতার, মিছিলের ধ্বনি যেনবা বন্ধ গলির শেষ অন্ধকার দেয়ালে কেবল আছড়ে পড়ে নিদারুণ নিষ্ফলতায়?

সুকান্ত কি এসবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল?

হতেও পারে! আত্মার অধিত্যকায় বুঝিবা পরম ও চরম আঘাত সুকান্তকে ভিতর থেকে বার বার কোমর-ভাঙা মানুষের মতন হতবল করে তুলছিল। না হলে, সাতচল্লিশ সালের প্রথম কয়েক মাসে দাঙ্গার পরে সুকান্ত যেমন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়, তেমনি কবিভাবনায় বুঝিবা ক্লান্ত হয়ে পড়ে!

কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব 'রেড এড কিওর হোমে' সুকান্ত ভর্তি হয়। সেখানেও রোগ ধরা পড়ে না।

বার বার রোগভোগ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী হয়েও পার্টি কর্তৃপক্ষ থেকে কিছু বুঝি প্রাপ্ত-প্রবঞ্চনা তাকে ভয়ংকর হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। সেই সঙ্গে দাঙ্গার কালো নোংরা হাত আগামী উজ্জ্বল দিনের শপথে দীপ্ত করলেও মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ম্রিয়মাণ করে তাকে তার অবচেতন লোকে।

সব মিলিয়ে এক বিষাদ-করুণ মন সুকান্তর। প্রমাণ—তার এ

সময়ে লেখা বহু চিঠি। জেম্‌স্‌ হাওয়েলের ভাষায়—"এ্যাজ কিজ ভু ওপ্‌ন্‌ চেষ্ট্‌স্‌ / সো লেটার্স ওপ্‌ন্‌ ব্রেষ্ট্‌স্‌'। সুকান্তর চিঠিই তার নিজস্ব অস্তিত্বের অন্যতম দলিল।

তার আর একটি চিঠির বক্তব্য,—'আমার খবর : শরীর মন দুই-ই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে। হয়তো এইটাই মহত্তর সৃষ্টির সময়···আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ।···'

সে সময়ের পার্টি-কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে সুকান্তর ভাবনা,—'অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে···কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্যে পাঁচটি টাকা। আর পেলুম চারদিনের জন্যে পার্টি হাসপাতালের 'ওষুধপথ্য বিহীন' কোমল শয্যা। এত বড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হইনি। আমার লেখক সত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মীসত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে। দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কর্মীসত্তাই জয়ী হতে চলেছে, কিন্তু কি করে ভুলি, দেহে আর মনে আমি দুর্বল : একান্ত অসহায় আমি?···কেবলই অনুভব করছি টাকার প্রয়োজন।'

সুকান্ত 'রেড এড কিওর হোমে' প্রথমবার কদিন থাকার পর চলে আসে, আবার যায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশে তার চিকিৎসা, পারিবারিক ও ডাক্তারি দেখা-শোনা ব্যাহত হয় নানাভাবে। রোগও তখন ধরা পড়েনি।

শেষে যখন আন্ত্রিক রোগ ধরা পড়ে, তখন অনেকটা সময় অতিবাহিত। সুকান্ত তার জীবনকে আসন্ন সাতচল্লিশের বারোই মে তারিখে গচ্ছিত রাখার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে শরীরে! মনেও কি?

এল. এম. এইচ. ব্লকের এক নম্বর বেডে থাকার সময়েই সুকান্তর অসুখের খবর সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ তটস্থ, উদ্বিগ্ন। পার্টির নেতারা ব্যস্ত হলেন। ব্যস্ত সুভাষ

মুখোপাধ্যায় তখনকার বিখ্যাত গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় অর্থ সংগ্রহ করলেন। কবি বিষ্ণু দে-র উক্তি থেকে জানা যায় শিল্পী যামিনী রায়ের মন্তব্য—'ওর মতো ছেলেরা সব বাংলাদেশে মরে যাবে, তবে যদি দেশের লোকের যন্ত্রণা কাব্যে পরিণত হয়। আমদের উচিত ওকে বাঁচানো। কিন্তু ওরা সব মরে গিয়ে যদি দেশকে বাঁচায়।...'

'স্বাধীনতা' পত্রিকায় কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠিন শপথ—

আমরা চাঁদা তুলে মারবো সব কীট;
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?
বসন্তে কোকিল কেশে কেশে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত?

এ সময়ে কবি সুকান্তর মানসিকতা কি? সুকান্ত একদিন অসাধারণ কাব্যিক উপলব্ধিতে বলেছিল,—'বিপ্লবস্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।' বলেছিল,—

এ দুর্যোগ কেটে যাবে, রাত আর কতক্ষণ থাকে?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ডাকে।

সেই সবাকার সঙ্গে মিলিত হওয়ার মন সুকান্তর আমৃত্যু ছিল কি?

মৃত্যুর মাস দুয়েক আগেই বুঝি লেখা 'অসহ্য দিন'; নামের ছোট্ট একটি কবিতা।

অসহ্য দিন! স্নায়ু উদ্বেল! শ্লথ পায়ে ঘুরি ইতস্তত
অনেক দুঃখে রক্ত আমার অসংযত!
মাঝে মাঝে যেন জ্বালা ধরে এক বিরাট ক্ষত
হৃদয়গত।

'অনেক দুঃখ' কি! এমন শব্দচয়ন কবির দুঃখের গোপন কোন্

কোণটিকে স্পষ্ট করে দেয়। 'জ্বালা', 'বিরাট ক্ষত হৃদয়গত' এমন সব শব্দ, প্রতীক কোন্ কবির ? যেন এক নতুন সুকান্তর !

> ব্যর্থতা বুকে, অক্ষম দেহ, বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে
> দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দয় হাতে চাবুক মারে।
> এখানে ওখানে, পথ চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত,
> মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।

এমন মনে হওয়া কি সুকান্তর জীবন ও যুগের পক্ষে স্বাভাবিক ?

এই কবিতা সম্পর্কে অন্যতম সুকান্ত-অন্তরঙ্গ অবন্তী কুমার সান্যালের একটি স্মৃতিচারণ অতি মূল্যবান। এমন কবিতা লেখার মানস-প্রতিক্রিয়া, প্রেরণা কি, তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

…'শেষের দিকে সুকান্তর কবিতার ভাব ও ভঙ্গিতে রং পাল্টাচ্ছিল, অর্থাৎ সুকান্তর বয়স বাড়ছিল, কিশোর যুবক হচ্ছিল। …তেমন একটি কবিতা 'অসহ্য দিন'… ..

'যাদবপুরের হাসপাতালে যাবার মাত্র কয়েকদিন আগে শ্যামপুকুরে রাখালবাবুর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে বালিশের নীচে লুকোনো একটি চিরকুটে লেখা কবিতাটি আমিই টেনে বার করেছিলাম। পড়তে গেলে সুকান্ত বাধা দিতে চেয়েছিল! যার আকাঙ্ক্ষা ইতিহাস হবার, যে অনুভব করেছে 'আমিই লেনিন', সেই লিখছে : 'আজ মনে হয় জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।' সুতরাং তার কুণ্ঠা স্বাভাবিক ছিল বই কি!…আমার সন্দেহ আছে 'অসহ্য দিন'-এর পর সুকান্ত আর কোন কবিতা লিখেছিল কিনা।'

এমনি জটিল মানসিকতায়, বুঝিবা জীবনের প্রতি কোন গোপন অভিমানেই সুকান্ত সকলের অজ্ঞাতে, একেবারে একা নিঃসঙ্গ, আত্মমগ্ন থেকে চলে গেছে আর এক জীবনে!

তেরশ চুয়ান্ন সালের উনত্রিশে বৈশাখ!

ভোরবেলায় যাদবপুরের স্যানাটোরিয়ামে যখন সুকান্তর বেডের কাছে হাসপাতালের লোক এসে দাঁড়ায় তখন সব শেষ। ভোরের কোন্ পাখিটি সুকান্তর নিঃসঙ্গ মৃত্যুর দ্রষ্টা ছিল, তার খোঁজ কেউ জানে

না আজও। তবে যে পাখি কীট্‌সের সেই 'ইটারন্যাল বার্ড'—সে সুকান্তর আত্মার সঙ্গে চলমান।

কিন্তু সুকান্তর এমন মৃত্যু। এ বড় গভীর অভিমান। সবার অলক্ষ্যে কারোর চোখের জল প্রত্যক্ষ না করে বিদায় নেওয়া। সুকান্তর মৃত্যু সুকান্তর জীবনে, চলার পথে ঘটে-যাওয়া অনেক ঘটনার, ভাগ্যের নির্যাস বুঝিবা।

সুকান্তর পরিবারের অনেকেই ছিলেন স্বল্পজীবনের অধিকারী। রাণীদির মৃত্যু কিশোরী অবস্থায়। এক দাদার মৃত্যু মাত্র তিরিশ বছর বয়সে। তার দুই জ্যাঠতুতো বোনেরাও এইরকম অতি অল্প বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি পাতায়। সুকান্ত তার ব্যতিক্রম নয়।

সুকান্ত নামেও বুঝিবা তার একুশ বছরের জীবনসীমা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। 'সুকান্ত' এমন নাম দিয়েছিলেন সুকান্তর প্রিয় রাণীদি। তখন মণীন্দ্রলাল বসুর একটি উপন্যাসের নায়কের নাম ছিল 'সুকান্ত'। উপন্যাসটি ভাল লেগেছিল স্বভাবী পাঠিকা রাণীদির, সেই সঙ্গে নায়কের নামটিও। সেই নায়কের নামেই সুকান্তর নাম দেন তিনি।

আর ভাগ্যের বিস্ময় বুঝি এমনি। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসও তাই? মণীন্দ্রলাল বসুর নায়কের মৃত্যু ঘটে ক্ষয়রোগে। কবি কিশোর সুকান্তর মৃত্যুর কারণও সেই রোগ।

সুকান্ত নামেই বুঝিবা তার জীবন-সীমা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আরও বিস্ময়ের—ঔপন্যাসিকের কলমে যে নায়ক সুকান্তর ক্ষয়রোগে মৃত্যু, তা-ও অল্প বয়সে।

সুকান্তর ভাগ্যের দুই রূপ, দুই-নির্দেশ। এক রূপ, সুকান্তকে মৃত্যুর কোলে এনে বসিয়েছে একুশ বছর বয়সে। আর এক রূপ, আর এক নির্দেশ সুকান্তকে বসিয়েছে অনন্তকালের বয়সের ভেলায়।

এক সুকান্ত রক্ত-মাংসের মানুষ, আর এক সুকান্ত অ-লৌকিক সত্তার অধিকারী কমিউনিস্ট কবি। একজনের কাছে বিভ্রান্ত, আর একজনের কাছে স্থিতধী। এক রূপে সুকান্ত দুঃখী, আর এক রূপে সুকান্ত অনন্ত আগুনের শিখায় বহ্নিমান।

মৃত্যুর দিন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে কারফিউ-এর পরিবেশ। থমথমে চারপাশ।

সেই শোভাযাত্রা নয় যা শবদেহকে মানুষের কাঁধে নয়, যন্ত্রচালিত যানে নয়, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে জনতার মিছিলের নীরব নিস্তব্ধ শোক-গানে, নিঃশব্দ বিপুল মানুষের অশ্রুপতনে।

এ সমস্তই ঘটনা এবং দুর্ঘটনা—দুই-ই।

সুকান্তর জ্যাঠতুতো দাদা, সুকান্তর থেকে ষোল বছরের বড় রাখাল ভট্টাচার্য 'সুকান্তর শেষ জীবন'-এর গভীর আত্মগত স্মৃতিচারণায় সুকান্তর মৃত্যু সম্পর্কে যে অতি মূল্যবান তথ্য ও চিত্র দিয়েছেন, তা যেমন দুঃখ-জনক, করুণ, তেমনি বেদনাদায়ক, তেমনি আমাদের কিছু মানুষের ব্যবস্থার পক্ষে লজ্জাকর। কি অসহায়তায় মৃত্যু সুকান্তর। হাসপাতালের কি তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা, অসহযোগ, অবজ্ঞা, অমানবিক ব্যবহার ছিল সুকান্তর প্রতি। রাখাল ভট্টাচার্যের আঁকা এমন জীবন্ত চিত্রে, তথ্যে আমাদের নিস্ফল আক্রোশই কেবল ব্যক্ত হয়।

কবি সুকান্তর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় হাসপাতালের সে ব্যবহার না হয় যদি না হয়েও থাকে, তবু একজন মানুষ, অসুস্থ অসহায় রোগীর প্রতি এ জাতীয় ব্যবহার এমন অমানবিক, তা একটা জাতির লজ্জাকেই স্পষ্ট করে। সে মৃত্যু দৃশ্যে শুধু চোখে জল আসে না, জ্বালা, ক্রোধ, ঘৃণা পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

শ্রদ্ধেয় রাখাল ভট্টাচার্যের যে সুকান্ত-মৃত্যু-বর্ণনা, তা প্রত্যক্ষদর্শী এক রক্তের আত্মীয়তায় আত্মীয় ভাইয়ের বর্ণনা। তাঁর রচনার সবটাই উদ্ধৃতিযোগ্য। এখানে সামান্য অংশই আপাতত যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়:

'১১ই মে (২৮-এ বৈশাখ) যথারীতি গিয়েছি সুকান্তকে দেখতে। নির্জীব শুয়ে আছে। মুখ চোখ ভীষণ বিপর্যস্ত। সব কথা ও বলতে পারলো না। ওর কাছ থেকে ও অন্য ঘরের কথঞ্চিৎ সুস্থ রোগীদের কাছ থেকে বিবরণ পেলাম।

'......জমাদারকে ডেকে তার হাতে একটি টাকা গুঁজে দিলাম।

সযত্নে ওকে সাফ-সুত্‌রো করেছে বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। এবং প্রভূত আবেগ দিয়ে মানবতার নামে আবেদন করলাম, সে যেন সুকান্তর ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই বারান্দায় ঘুমোয়। জমাদার রাজীও হল। খুব মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এলাম।......

'পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ প্রতিবেশী কাটু বোস (প্রখ্যাত কমিউনিস্ট কর্মী) টেলিফোনে প্রাপ্ত সুকান্তর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলেন আমার বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে গাড়ি ছিল। পথে ডেকার্স লেন (তখন স্বাধীনতা পত্রিকা ও কমিউনিস্ট পার্টির অফিস) থেকে মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদকেও সঙ্গে নেওয়া হল।

'হাসপাতালের শয্যা, সুকান্তর মৃতদেহ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই জমাদার। বললে, রাতে খাবে বলে আমাকে দিয়ে দই আনিয়ে ছিল বাবু।—চেয়ে দেখি মীট-সেফে সালপাতা ঢাকা ছোট এক ভাঁড় দই, যেমনকে তেমন পড়ে আছে।

'কখন কি অবস্থায়, কিভাবে সুকান্তর প্রাণ বেরিয়ে গেল তা কেউ জানলো না। আর মৃত্যুর মুহূর্তে বাইরের দিকে চেয়ে নিশুতি রাত্রে সুকান্ত কি ভেবেছিল, তা কবি কল্পনাই রয়ে গেল।'

আমাদের এক আত্মার আত্মীয় কবি—যে, বয়সে কিশোর, যার কাছে ঘাতক মৃত্যুর আগমন অকালে অসময়ে নিষ্ঠুরতম মুখভঙ্গিতে—তার এমন মৃত্যুর কৈফিয়ৎ জাতির পক্ষে কে দেবে? কার কাছে এর ক্ষমাহীন প্রতিকার ভিক্ষা থাকবে চিরকাল?

এমন প্রতিকারহীন প্রশ্নই কান্না হয়ে বেজে যাবে অনন্তকাল আমাদের হৃদয়ে। জাতি সেদিনও কেঁদেছে, আজও কাঁদছে, ভবিষ্যতেও কাঁদবে!

এমন নিরবধিকাল কান্নাই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত। আমাদের দেশের, জাতির, আমাদের সমস্ত কবিকুলের, বুদ্ধিজীবীর, সাধারণ মানুষের সর্বহারা শ্রেণীরও!

নিঃসঙ্গতায় যার চলে যাওয়া, তার অবশ্যই সমস্ত বাধার মধ্যেও শবযাত্রায় জুটেছিল সঙ্গী—জনতার!

নিঃসঙ্গ মৃত্যু সবেগে সজোরে আঘাত হানলো অবিরাম মানব তরঙ্গের স্রোতে। সুকান্তর মৃত্যুর পূর্বে জীবন, মৃত্যুর পরেও আর এক জীবন! মৃত্যু কবি-রানারের কাছে এক ক্লাইম্যাক্স। এ পৃথিবীর জনগণের সঙ্গে যে সুকান্তর জীবন অতিবাহন, তা তার এক রূপ! মৃত্যুর পর স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রায় যে জীবন-স্বাদ-গ্রহণ, তার আর এক রূপ!

তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ।

মৃত্যুর আগে সুকান্ত ঘ্রাণ নিয়েছে জীবনের জনতার মাঝখানে থেকে, মৃত্যুর পর ঘ্রাণ, সঙ্গ দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে এই পৃথিবীর অনন্ত-কালের জনতা! এ যেন সেই প্রবহমান নদীর সমতলভূমিতে কিছুকাল দুই তীরের বসতি সবুজ, দিগন্ত-ছোঁয়া আকাশের সুখ, আরাম, প্রীতি, অন্তরঙ্গতা, আদর উপভোগ করতে করতে বড় হয়ে যাওয়া, প্রসারিত হওয়া, আরও বেগে—বুঝিবা মহাজীবন গ্রহণের বেগে অবলীলায় সামনে ছুটে যাওয়া! সুকান্তর মৃত্যু-পূর্ব জীবন ছিল তেমনি,—চতুষ্পার্শ্বের সর্বস্তরের জনতার আত্মীয়তায় কাটাতে এগিয়ে যাওয়া, কবিতায় কবি-প্রাণকে মুখর করে তোলা, প্রাণপ্রেতিতে দীপিত, সুন্দর হয়ে ওঠা!

নদী মেশে সমুদ্রে। অজস্র সমুদ্রের শব্দে নদীর বড়-জীবন লাভ! সুকান্ত মৃত্যুর পর আর এক আত্মার অধিকারে নিজের অলক্ষ্যে পেয়ে যায় অগণন মানুষের সঙ্গ। সুকান্তর মৃত্যু অলক্ষ্যে, কিন্তু একুশ বছরের এক কবির মৃত্যু-ঘটনা লক্ষ্যহীন হয় না। 'ওর মতো ছেলেরা সব বাংলাদেশে মরে যাবে, তবে যদি দেশের লোকের যন্ত্রণা কাজে পরিণত হয়।' সুকান্তর মৃত্যু জনতার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে দেয়! যন্ত্রণার রূপান্তর ঘটে কর্মে।

সুকান্তর কবিতা কর্মের, জীবনের উদ্দীপনার সচল প্রতীক মাত্র। সেই মৃত্যুর দিনে আড়ষ্ট পরিবেশে যে সব মানুষের গভীর হার্দ্য সঙ্গ পেতে পেতে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর কোলে শায়িত সুকান্ত শ্মশানে এসেছিল, সেইসব মানুষই তাকে অগণন মানব-জনতায় অন্তর্জলী ঘটিয়ে দিয়ে গেছে।

আজ জনতা সুকান্ত, সুকান্তই জনতা। সমস্ত কিছু মিলে একাকার, এককণ্ঠ। সমবেত কণ্ঠের একটিই শপথ। সমবেত ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত হাতে একটিই মশাল।

কবি সুকান্তর দায়িত্ব ছিল মানুষের কাছে মানবতার নতুন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার। মানবপ্রাণের নতুন পত্রের পাঠ শুনিয়ে যাওয়ার। সে দায়িত্ব রূপ নেয় জীবনের আগুনে লেখা শপথের। বাংলাদেশের বিপ্লবী মানুষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এসেছে সেই শপথের বাণী। বুঝিবা একালের, নিরবধি আগামী কালের সমস্ত সচেতন স্বভাব-বিপ্লবী মানবপ্রাণ এমন একুশ বছরের এক রানারের জন্মদিন মৃত্যুদিনের কথা ভেবেই গভীর রক্তাক্ত হৃদয়ে সুকান্ত তর্পণে সোচ্চার কণ্ঠ হবে—

ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার॥

ষোড়শ অধ্যায়

সুকান্ত আজ বিশ্বনাগরিক কবি

'একদিন দেখা যায়, সেই কবি-কিশোর সারা দেশের হৃদয় জয় করে ফেলেছে।

'লোকের মুখে মুখে ফিরছে তার কবিতা।

'পৃথিবীর আর কে কোথায় দেখেছে—একটি কিশোরকে হারিয়ে আজও সারা দেশ কাঁদছে।'

এমন তিনটি অসাধারণ বাক্য রচনা করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কিছু সময়ের সুকান্ত-স্মৃতিচারণের শেষ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

তিনটি বাক্যই উচ্চারিত কোন সময়ে?

উনিশ শ সত্তর সালে। স্বর্গত সুকান্তর বয়স তখন চুয়াল্লিশ বছর।

সুকান্তকে হারিয়ে দেশ তখন থেকে তেইশটা বছর শুধু কান্নাকুল থেকেছে অবিরাম! এবং আজও!

সুকান্ত নেই। কোন মানুষই তো থাকে না চিরকাল! সুকান্ত নেই তাতে এত কান্না কেন?

কারণ—সুকান্তর কবিতা, বেশ কিছু গান, আর সুকান্তর অন্তরঙ্গ ডায়েরীর মত মূল্যবান চিঠি!

সাতচল্লিশের স্বাধীনতা দিবস থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় তথা সারা ভারতে নানান জটিল স্নায়ুযুদ্ধের বায়ুপ্রবাহ! রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে অবিরল মিলন-বিচ্ছেদের খেলায় উত্থান-পতনের গহ্বর রচনা করে যাওয়া! গত তিরিশ বছরের ইতিহাস তাই। মানুষ রুদ্ধশ্বাস। মানবতা নানাভাবে রুদ্ধ-কণ্ঠ থেকেছে ভিয়েৎনামে, কম্বোডিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়। মানবতা ভারতে, বাংলাদেশেও নানান জটিল স্রোতে বাধা পেতে পেতে জটিলতর রূপ পেয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুকান্তর কবিতা যেনবা আমাদের মন্ত্রগুপ্তি, নাকি আশার বাণী?

'শোন্ রে মালিক, শোন্‌রে মজুতদার!'

এমন তর্জনী তুলে শাসানোর কণ্ঠ অমরলোক থেকে বুঝি সুকান্তর অনন্তকালের ঘোষণা! যীশুর নির্দেশের মত?

ভারতে যে সেই তর্জনী-শাসন, সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের আঘাত আজও প্রয়োজন।

সুকান্তর কবিতা একটি মুহূর্তের জন্যও ভোলার নয়।

তাই সুকান্তকে ভুলতে পারছি না। সুকান্তর মৃত্যু সেই কারণেই চোখে জল আনে।

বাংলাদেশে, বাংলা কাব্যে সুকান্তর আবির্ভাব মহান সম্রাটের মত। মাথায় তার রাজমুকুট—কবিতা, হাতে রাজদণ্ড—মানবতা। তার রাজ্যের প্রজা—সর্বকালের অগণন সর্বহারা মানুষ। রাজপোষাক? সমকালের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ঘটনাস্রোত, রাজনীতির জটিল প্রবাহ। রাজার সৃষ্টি। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বে আন্তর্জাতিক মেঘের মত সর্বপ্লাবী এবং অবিরল ভাসমান।

এমন অন্তর্দৃষ্টিক্ষেপেই তার রাজ্যজয়। বিশ্বপরিক্রমণ!

সম্রাট সুকান্তর কিশোর বয়সে মৃত্যু দিয়েছে তার সর্ব-বিশ্বজয়ের প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। মৃত্যু জীবনের শেষ, কিন্তু বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বমানব-হৃদয় জয়ের শুরু। তাই সুকান্তর মৃত্যু নয়, মৃত্যুর কান্না একমাত্র সত্য নয়, মৃত্যু তাকে চিরকালের 'রানার' করে গেছে। কবি-আত্মা জন্ম-বাউল, জন্ম বোহেমিয়ান। 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে!' এ তো দার্শনিকের উক্তি নয়, কবির কথা! বড় কবির কথা দিয়ে অনুজ কবির তর্পণ-মন্ত্র বুঝি এমন কথাও।

সুকান্ত সমস্ত দেশের মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। এটা তার প্রথম রাজ্য জয়!

দ্বিতীয় রাজ্য জয় জনগণের স্মৃতি। স্মৃতিতে সুকান্তর কবিতা প্রাচীন প্রত্নলিপির মত উৎকীর্ণ। অন্ধকার গুহাচিত্রে প্রাচীন সভ্যতার অমোঘ নিদর্শনের মত সুকান্তর কবিতা সর্ব মানবের স্মৃতির মালায় নির্দিষ্ট,

অবধারিত থাকায় দ্বিতীয় রাজ্যজয় সম্ভব হয়েছে। সুকান্ত তাই স্বরাজ্যে স্ব-রাট্!

সুকান্তর তৃতীয় রাজ্য জয়! মৃত্যু দিয়ে অমরত্বের রাজ্য লুঠ করে নেওয়া! এমন লুঠ করার মত ক্ষমতা কজন কবির আছে! কান্নায়, দুঃখে যা পাওয়া, তাই তো এ্যাসিডে গলানো সোনার মত! আমাদেরই ভুলে আমরা হারিয়েছি সুকান্তকে অকালে! আজ আমরা বুঝি আমাদের ভুল! আমাদের অনুশোচনা, সেই মৃত্যুর পরমুহূর্ত থেকেই সুকান্ত তার মৃত্যু দিয়ে আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে গেছে!

শোধরাবার অবসর নেই। শুধু কান্নাই, বা কান্নার শিক্ষাই দেয় সুকান্তর মৃত্যু? আজ সারা দেশ যে কান্নায় আপ্লুত, সে কান্না সুকান্ত মৃত্যু দিয়ে লিখে রেখে গেছে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে!

কান্নার জলে লেখা মৃত্যু, কবিতায় হয়ে উঠেছে আনন্দের প্রতিরূপ। আমাদের কান্না আমাদের বড় জীবন, সুস্থ, সৎ, মানবিক জীবন গড়ার প্রেরণা!

সুকান্তর কবিতায় সেই প্রেরণা। তাই কান্না আর অপ্রয়োজনের নয়, বিলাসের নয়, নিছক ভেঙে-পড়া, কেবল-মার-খাওয়া মানুষের অক্ষম আক্ষেপোক্তিও নয়, কান্না আমাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ। কান্না আমাদের অনুশোচনা, দুঃখবরণ, শপথ। কান্না আমাদের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানবসমাজ-সেবা, মানব্য!

কবি সুকান্তর সময়ে 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে এবং সুকান্তর জ্যেষ্ঠ কবি হিসেবে বর্তমান ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। কিন্তু নজরুলের জীবন ও কাব্যের থেকে সুকান্তর জীবন ও কাব্যের ব্যবধান দুস্তর! দুজনের কাব্যপ্রেরণা ও বিদ্রোহিতা জীবনের উৎসে থাকলেও দুই স্বতন্ত্র সত্তা তাঁদের দুজনকে অন্য স্বাদে, পুলকে, অভিজ্ঞতায় পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়।

সারা পৃথিবীর কবিতার কথা আসে মনে! পৃথিবীর কবিদের পাশে সুকান্তর কবিতা!

শেলী মারা গেছেন তিরিশ বছর বয়সে, কীট্‌স ছাব্বিশ-সাতাশ,

বছরে। দুজনেই ইংলণ্ডের রোমান্টিক আন্দোলনের কবি-শ্রেষ্ঠ। শেলীর জীবন ছিল আত্যন্ত বেদনার্ত। এই বেদনার্তি তাঁর বেশীর ভাগ লিরিকেই ওতপ্রোত। কীট্‌সের সৌন্দর্য-পূজা, শেলীর স্বাধীনতা ও প্রেম-বন্দনা তাঁদের আত্মিক সংকটে ঘনসন্নদ্ধ। সুইনবার্ণের ভাষায় শেলী হলেন 'দি পারফেক্‌ট সিংগিং গড!' শেলীর 'প্রমেথিউস আনবাউণ্ড', কীট্‌সের 'এণ্ডিমিয়ন' কাব্যদ্বু'টির মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা তথা সৌন্দর্য-দর্শনের মধ্য দিয়ে যে বিশ্ব মানব্যের মুক্তির কথা ঘোষিত, সত্য শিব সুন্দরের কথা ব্যক্ত—তা কবি-আত্মার স্বগতোক্তি থেকেই উৎসারিত।

অল্প বয়সে এমন পরিণত বোধ-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনার পরিচয় ইংলণ্ডের কজন কবির আছে? যুদ্ধের কবি রুপার্ট ব্রুক, চার্লস্‌ সোর্লে, ওয়েনের কথা মনে আসে: শেলী-কীট্‌স্‌ থেকে এঁদের মধ্যে আরও অনেক কম বয়সে শেষ দুজন মারা যান। ব্রুক মারা যান আঠাশ বছর বয়সে! ওয়েন, সোর্লে 'টিন্‌ এজার' হয়েই!

শেলী, কীট্‌স্‌ ছিলেন আত্মমুখী কবি। যন্ত্রণার জগত তাঁদের একান্ত ভাবে নিজেদেরই অভিজ্ঞতার জগত! ওয়েনের জগত নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতার জগত—কিন্তু তা আত্ম-সর্বস্বতায় নিমজ্জিত নয়, বাইরের প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ স্বভাবে দীপিত। ব্রুক নিজেই প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক। সোর্লে এবং ওয়েনও! ওয়েন যুদ্ধের বীভৎসতাকে এঁকেছেন 'ফটোগ্রাফিক ফাইডেলিটি' দিয়ে।

প্রথম যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র সাতদিন আগে ওয়েনের মৃত্যু হয় যুদ্ধে। যুদ্ধের কদর্যতা, নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা কবিতায় স্পষ্ট। প্রথম দিকে কীট্‌সের প্রভাবে প্রভাবিত কবি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর কঠোর বাস্তবতায় এসে নিজেকে নির্জন দর্পণে দেখেন। লেখেন নিজের আত্মাকে নিজের মত করেই।

'আমি কবিতা সম্বন্ধে উৎসাহী নই। আমার বিষয় হল যুদ্ধ এবং যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা। আমার কবিতায় আছে অনুকম্পা আর বেদনার সুর।'

এ হল ওয়েনের কাব্যসংগ্রহের কথামুখে কবির নিজের কথা।

ওয়েনের বন্ধু এবং প্রায়-গুরু যুদ্ধের কবি সিগ্‌ফ্রিড স্যাসুনের কবিতায় যেখানে আছে উষ্মা, ওয়েনে আছে গভীর অনুকম্পা।

একই বিষয়ের কবি সোর্লে আর ব্রুক। ব্রুক প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সামনে থেকেছেন রোমান্টিক আদর্শবাদ নিয়ে।

এমন অল্প বয়সে স্বর্গত বলিষ্ঠ কবিদের ভিড়ে সুকান্ত।

সুকান্তর মূল্যায়ণ কি রকম?

বিরাট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। সেই দুরন্ত, পার্থক্য গভীর বিষাদখিন্ন শ্রদ্ধা রচনা করে দেয় সহৃদয় পাঠকদের মনে।

সুকান্ত প্রণম্য কবি, কারণ বাস্তবতার মধ্যে কোন খাদ রেখে যায় নি। সুকান্ত শ্রদ্ধেয়, কারণ তার বাস্তব-জীবন-ঘোষণায় কোন 'কম্প্রমাইজ' নেই। সুকান্ত সর্বসময়ের হৃদয়ের শব্দের সঙ্গে সর্বকালিক সম্পর্ক সূত্রে জড়িত, কারণ তার মানবতা আত্মকেন্দ্রিকতার উৎস মুখে উৎসারিত নয়।

কীট্‌স্‌-শেলীর মত সুকান্ত আদৌ আত্মকেন্দ্রিক নয়। ওয়েন, ব্রুক সোর্লের মত কেবল-যুদ্ধই কাব্যের বিষয়ে চিহ্নিত করে রাখে নি!

রাখার কথা নয়। কারণ কলকাতার নাগরিক কবি সুকান্ত কদিন মাত্র যুদ্ধের প্রত্যক্ষ রূপ দেখেছে? তার দেখা—কলকাতায় বসে সারা বাংলাদেশ দেখা! যুদ্ধ দূরে, যুদ্ধের অগ্নিজ্বালার ঝলকানিতে কলকাতা দগ্ধ হয়েছে, পুড়েছে শহরতলী, মফঃস্বল শহর, কেঁপে গেছে প্রবল ভূমিকম্পের মত গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশ!

সুকান্ত এই সমস্ত কিছুর কবি! তার কবিতায় যুদ্ধ আছে, সেই সঙ্গে আছে মন্বন্তর, মহামারী, দাঙ্গা, মিছিল, জনতার বিপ্লব-বিদ্রোহ, রাজনীতি, মৃত্যু, বীভৎসভাবে মানবতা হত্যাকারী ষড়যন্ত্রের চিত্র। শেলী, কীট্‌স্‌ থেকে এখানেই সুকান্তর তফাৎ। তফাৎ ব্রুক, ওয়েন, সোর্লে, স্যাসুন ইত্যাদি থেকেও।

কিন্তু কবি-ক্ষমতায় এদের প্রত্যেকের সমতুল কবি সুকান্ত। বিশ্বের রত্নখচিত রাজ-আসনের অনেকগুলির মধ্যে একটি সুকান্তর নামে চিহ্নিত।

কারোর ক্ষমতা নেই সেই আসন বর্তমানে শুধু নয়, নিরবধি ভবিষ্যতেও দখল করে।

এমন কবিকে হারানোর বেদনা তো আবহমান কাল থাকারই কথা। মৃত্যুর এমন পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও সুকান্ত-মূল্যায়নে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এ স্বীকৃতিই সত্য।

সুকান্ত রাজনৈতিক বিশ্বাসে যে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল আমৃত্যু, সেই বিশ্বাস গত পঁয়ত্রিশ বছরে নানাখানা হয়ে নানা রূপ পেয়েছে। তত্ত্ব আর প্রয়োগের বুদ্ধিনির্ভর ব্যাখ্যায় ও মতপার্থক্যে সেই রাজনৈতিক দল নানান রূপে স্নায়ুযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত।

হওয়াই স্বাভাবিক। সময় বদলায়, বুদ্ধিবাদী মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার পরিশীলন ঘটে। ইতিহাস, কাল, মানুষ, সমাজ, সভ্যতা সেই অন্তঃশীল পরিশীলনে অংশ গ্রহণ করে। তা-ই স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তা-ই গতিশীল জীবনের, বুদ্ধির লক্ষণ।

এমন অবস্থায় সুকান্তর স্থান?

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

বিশ্বকবির এই কথাটুকুই সুকান্তর মৃত্যুর পরের কথা। মৃত্যুর পর সুকান্ত রাজা। সে কবি! মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিল সে রাজা, প্রজা —দুইই! মৃত্যুর বেগ দিয়েছে রাজার বেশ! তার বিশ্বাসের, তার রক্ত মাংস মজ্জা প্রাণ আত্মার মত বিশেষ রাজনৈতিক দল তো তাকে ধরে রাখতে পারবে না! সে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। কিশোর কালে, মাত্র একুশ বছরের মৃত্যুর যে অভিঘাত, তার অন্তিম শপথ তো এইটাই! কবি সুকান্ত সকলের, সর্বকালের, সর্বমানবের।

সেই মানব্য যা সুকান্তর রাজদণ্ড, তা-ই তার শক্তি, সাহস, তার কবিতার স্নায়ুতন্ত্র, প্রধান মেরুদণ্ড।

মানবতাকে লেখনীর একমাত্র শক্তি করার শিক্ষা সে পায় নানান আত্মীয়, বন্ধুর সাহচর্যে। পটভূমিকা তাকে দিয়েছে মানবতা পরীক্ষার রসদ!

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণে লিখছেন,—'এই পটভূমিকাতে এল সুকান্ত। একের পর এক গণসংগ্রাম তখন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ লাভ করছে। সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনতা বিশেষভাবে মেহনতী মানুষ এক মহাজাগরণের মুখে। এই অবস্থায় নিত্য নূতন সংগ্রাম ও নিত্য নব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম তখন পাশাপাশি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। সংগ্রামের জোয়ারের সাথে সাথে সুকান্তর কবিতা রচনাও দানা বাঁধতে থাকে।'

কবিতার জন্মমুহূর্তে জনতার আন্দোলিত হাত আর সরব কণ্ঠের যোগ! সে কবির মানবতার শিক্ষা এমন খাঁটি না হয়ে যায় না।

শুধু কি তাই? মানুষকে কাছে আনার আর এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ছিল সুকান্তর। অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখনী সে সংবাদও দেয়,—'কলকাতার আকাশে তখন ঘন ঘন জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনা। দিনের কলকাতাও জনশূন্য। রাতে নিষ্প্রদীপ। ভয়ে সব শব্দহীন। মাঝে মাঝে মিলিটারি গাড়ি বা যুদ্ধের শব্দ। বহু রাতের অন্ধকারে আমি ও সুকান্ত পথে বেরিয়েছি কলকাতার এই প্রেতরূপ দেখার জন্য।'

সুকান্তর সঞ্চয় ছিল এমনি—অমোঘ এবং খাঁটি।

সুকান্তর উৎকেন্দ্রিক জীবনই ছিল সুকান্তর সমস্ত কবিতার লালনকর্তা, রক্ষাকর্তাও। তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের দল ছিল তার সমস্ত দিনের কাঁধে-ঝোলানো ঝুলিতে ভরাবার সংগ্রহশালা।

এমন একই সঙ্গে দল নিয়ে যুদ্ধ—জীবনযুদ্ধ, আবার কবিতার গভীরে স্নায়ুযুদ্ধ—কোন্ কবি কবে কোথায় করে গেছে?

'কাক-ডাকা ভোরে সুকান্ত বেরিয়ে যায় পার্টির কাজে, কি যে কাজ আমি তা আজও জানি না, আর এত ব্যস্ততা যে বাড়ি এসে খেয়ে যাবার সময়টুকু নেই।'

এমন মন্তব্য সুকান্ত-র জ্যাঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্যের।

এর পরেও সুকান্তর মলিন বেশ, অভুক্ত অস্নাত চেহারা, শীর্ণ দুঃখী রূপ স্মৃতিতে এনে যাঁরা তার ভয়ংকর দারিদ্র্যের কথা বলেন, তাঁরা যে

কি পরিমাণ মিথ্যাভাষণ করেছেন, তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যের অপলাপ, অসম্মান করলেন তাঁরা। সুকান্ত সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও আত্মপ্রচারই তাঁদের লক্ষ্য, মুনাফা। জাতির গৌরব, দেশের সর্বকালের গৌরব এক মুক্তপ্রাণ কবির পক্ষে তাঁরা যে 'বিজাতীয়', দায়িত্বজ্ঞানহীন তথ্য ও মন্তব্য করে গেছেন, তা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত।

সুকান্তর কবিসত্তা কি সচেতন ছিল পরিচিতদের মধ্যে তার কবিতা নিয়ে আলোচনার সময়? তার পরিচয় অনেকের স্মৃতিচারণে মেলে। কিশোর কবি! কিন্তু মনে-প্রাণে একজন নিজের কবিতার বিদগ্ধ সমালোচকও! সে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও সমালোচনা চাইত, চাইত তার পারিবারিক পরিবেশে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ভাইদের কাছেও।

সুকান্তর বড় জ্যাঠতুতো দাদা মনোজ ভট্টাচার্য লিখছেন,—'যখনই কোন কবিতা লিখেছে—আমাদের বাড়িতেই হোক, বা বেলেঘাটায় ওদের বাড়িতেই—প্রায় সব সময়ই তার প্রথম পাঠক আমি এবং পড়েই উচ্ছ্বাস। সুকান্তর এটা কিন্তু পছন্দ হত না। কেন আমি Critical হই না, এই ছিল ওর অভিযোগ।'

এমন আত্ম-সতর্ক কিশোর-কবি আজও একালের কবিকুলে এক সার্থক শিক্ষারই উদাহরণ।

সুকান্ত কবি, কিন্তু সুকান্তর নিজের জীবন এক সার্থক জীবননিষ্ঠ উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মত। সে তুর্গেনিভ, টলস্টয়, দস্তয়েভ্‌স্কি গোর্কি—এঁদের উপন্যাসের নায়ক হতে পারত! তার কারণ সুকান্তর কাব্য জীবন, মানুষ, প্রত্যক্ষ পরিবেশ, তার পরিবার, পারিবারিক প্রীতির সম্পর্ক-সূত্র—এসব থেকে কোনমতেই বিবিক্ত নয়।

সুকান্তর কথা শেষ করতে বসেও বার বার ধুয়ার মত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই বাক্যটি মনে বেজে ওঠে,—

'পৃথিবীর আর কে কোথায় দেখেছে—একটি কিশোরকে হারিয়ে আজও সারা দেশ কাঁদছে!'

সুকান্তর মৃত্যুতে আমাদের কান্না আমাদের বিষাদখিন্ন শ্রদ্ধাই!

সুকান্তকে অকালে হারিয়ে আমাদের শোক আমাদের শপথ।

কিশোর কবির এমন মৃত্যু-অভিমান আমাদের অগ্রগামী জীবন ও সভ্যতার পথে এক সবল অভিযান।

আমাদের কান্না আমাদের একান্ত নিজস্ব, কিন্তু তা-ই আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব।

কান্না তো অশ্রুসিক্ত দুর্বলতা নয়, এ কান্না আমাদের অভিমান—আত্ম-অভিমান, জাত্যাভিমান!

এই অভিমান আমাদের কবিকুলেরও। এখনকার সুকান্ত সমস্ত কবির কাছে 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি'! সমস্ত কবিদলের কাছে তার বুঝিবা নির্দেশ—'এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'।

সুকান্ত নেই, সুকান্তর কবিতা আছে।

সুকান্ত নেই, সুকান্তর সেইসব চিঠি আছে।

তাই, সুকান্ত আছে কবিতা, চিঠির অন্তরঙ্গতার সূত্রে আমাদের হৃদয়ের গভীরে,—সেই সূত্রে সর্বকালের সর্বদেশের কবিহৃদয়, সমাজ-হৃদয়ের কঠিন-কোমল বনিয়াদে ধ্রুবতারার মত স্থির হয়ে।

সুকান্তকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়েই বাংলা কবিতার সূত্রে বিশ্ব-কবিতাকে শ্রদ্ধার্ঘ দেওয়া।

সুকান্ত আজ বিশ্বনাগরিক কবি!

মৃত্যুর পর থেকে বিগত পঁয়তাল্লিশ বছরে সুকান্ত-তর্পণে স্বতন্ত্র কোন মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন নেই। সুকান্ত নিজের আত্মার দাবি নিজেই রেখে গেছে কবিতায়। তার কবিতার সমস্ত প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা তার কেবল কবি-আত্মার প্রশ্ন নয়, সর্বাবয়ব জীবন-জিজ্ঞাসাও, যার সঙ্গে মানবতার আর্তিগুলি হীরকদ্যুতি নিয়ে মালার মতো সাজানো।

আজও তাই স্মরণীয়—

> লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে,
> কী হবে আর কুকুরের মত বেঁচে থাকায়?
> কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
> অপরের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে?

এই সুকান্ত কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে? ওই সব পৃথিবীব্যাপী বিশাল প্রাসাদের একেবারে নীচের তলায় চারপাশে সুবিশাল ভূমির ওপর অগণন দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে উত্তাল সমুদ্রের মত স্তনিত জনতার মধ্যে কঠিন পৌরুষে দাঁড়িয়ে থেকে সুকান্ত এমন শাসানো, তর্জনী-তোলা প্রতিবাদ শুনিয়েছে।

শুধু আজ নয়, এই স্বর থেকে যাবে আবহমান কাল। যে কাল অমানবিক শাসন ও শোষণে সীমাটানা। যে কাল সীতার মত—যার চারপাশে রামচন্দ্রের অতন্দ্র সতর্কতার গণ্ডী টানা। সুকান্ত সর্বহারাদের শৃঙ্খল সরিয়ে শাসন-শোষণে সীমাবদ্ধ সীতা-রূপ কালকে মুক্ত করার জন্যেই যেন বলে গেছে—

> তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার করো,
> অস্বীকার করো বশ্যতাকে।
> চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
> সন্ধান করি তাজা রক্তের,
> তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
> শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
> সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।

চিরকালের সর্বহারাদের শিকল ছাড়া আর হারাবার কিছু নেই—এই ঘোষণার সঙ্গে এটাও যুক্ত হোক—সর্বহারাদের শিকলের দাগের ওপর শিকলগুলোই সিংহের কেশর হয়ে উঠুক।

কবি সুকান্তর, মানুষ সুকান্তর, মানবতাবাদী সুকান্তর এটাই কাম্য আজও, নিরবধি ভবিষ্যতেও।

এমন কান্নাকুল থেকে প্রতিটি সুকান্তর জন্মদিনে সুকান্তর কণ্ঠে, বিশ্বাসে, শক্তিতে একাত্ম হয়ে যেন শপথ উচ্চারণ করি এমন ভাবেই! আজকের এবং চিরকালের সুকান্ত-শ্রদ্ধার্ঘের স্বরূপ তো এইটাই!

পরিশিষ্ট

ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গ, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার নির্ঘণ্ট

কেবলমাত্র বিশেষ গ্রন্থনামগুলিকেই উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। ভারতীয় এবং বিদেশী প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে বর্ণানুক্রমিক সাজানো হল। কোন কোন বিশেষ প্রবন্ধ-নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে আলাদাভাবে 'প্রবন্ধ' উল্লেখ করতে হয়েছে।